লেখকের দেওয়া কারেকশন করা হলো।

কোটেশন চেক করতে হবে। কোটেশন শুরু এবং শেষ নিশ্চিত করতে হবে, কিছু জায়গায় আমি ভুল পেয়েছি, ঠিক নেই। মিজু। ১২ ০১ ২০২৩

রুদেবিশ শেকাবের

ব্যতিক্রমী জীবন

রুদেবিশ শেকাবের ব্যতিক্রমী জীবন

হারুন আল রশিদ

সৃজন

রুদেবিশ শেকাবের ব্যতিক্রমী জীবন

প্রকাশক

www.srijonbd.com
srijoneditor@gmail.com
+৮৮০ ১৯১৪ ৬৯৬৬৫৮
বাড়ি : ৪৯৫, রোড : ৮, এভিনিউ : ৩
মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬

স্বত্ব ©
হারুন আল রশিদ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৯, জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ
দেওয়ান আতিকুর রহমান

বুক ডিজাইন
শেখ মাহমুদ ইসলাম মিজু

পরিবেশক
মাত্রা প্রকাশ, ৩০ নর্থ হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
এস আর এল প্রিন্টিং প্রেস, ২৫/এফ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা

মূল্য
৪৫০ টাকা

Rudebish Shekaber Batikromi Jibon
A Novel
By Harun Al Rashid

Price : 450.00 USD : 20.00
ISBN : 978-984-96008-3-1

উৎসর্গ

বর্ণিল

—মেয়ে আমার, তাকাও। এখন, এখানে।

রুদেবিশ শেকাবের
ব্যতিক্রমী জীবন

প্রথম খণ্ড

১

আমি সুখী হতে পারতাম।

আমি মানুষের সুখ দেখে বেড়াতাম আর দ্রুত নিজে সুখ পেতে চাইতাম। ভ্যানিলা আইসক্রিম, শীতল পানি বা পাকা আমের মতো। আমি তাকে লাটিমের মতো ঘুরাতে চাইতাম। রাজ্যের মতো জয় আর শত্রুর মতো পরাজিত করতে চাইতাম।

শুরুতে আমি তা সাধারণভাবে চাই; না পেয়ে সাধনা করি; না পেয়ে আমি তা মনের জোরে পেতে চাই; না পেয়ে আমি তা কিনতে চাই। কিন্তু আমার পুঁজি ছিল অল্প। ফলে আমি ভবিষ্যৎ থেকে ধার করি। কিন্তু তার মূল্য ছিল আরও বেশি। শেষ পর্যন্ত আমি তা কিনতে ব্যর্থ হই।

আমার ব্যর্থতার উপর অনেকের অনেক মত ছিল। কেউ বলত, কিছু মানুষ সারা জীবন অসুখী থাকে। কেউ বলত, আমি সুখ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতাম। তারা বলত, সুখের আশা করার সাথে সাথে মানুষের দুঃখ শুরু হয়। তারা আমাকে দুঃখবাদী, চরমবাদী আর বাতিকগ্রস্ত বলত।

তারা বলত আমি খারাপ মানুষ ছিলাম। তারা শুধু এটা একটা ধারণা হিসাবে প্রচার করত। তারা বলতে পারত না, আমার মধ্যে খারাপ কী ছিল। কিন্তু আমি জানতাম আমার মধ্যে খারাপ কী ছিল। আমি অন্যের বিছানা অগোছালো রেখে দিতাম। অন্যের টয়লেট নোংরা করে বের হয়ে যেতাম। দুর্বলকে নিয়ে রসিকতা করতাম। আর সুশীল ও নাগরিক দায়িত্ব পালনের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনও আহ্বানে সাড়া দিতাম না। তারপরও আমি দাবি করি, আমার রক্ত পবিত্র ছিল। কী ভাবে? আমি তা যথা সময়ে বর্ণনা করব।

সুখ নিয়ে হাহুতাশ করতে গিয়ে আমি জীবনে প্রথম লজ্জার শিকার হই। সেই অপমানের কথা আমি কখনও ভুলতে পারিনি। নদীর পাড়ে শরতের

বিকালে বট গাছের নিচে আমি আর সেই ছদ্মবেশী শত্রু খোলা মনে আলাপ করছিলাম। আমরা সেই দীর্ঘ ও বস্তুঘন আলোচনার প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, এমন সময় কিছু পরিচিত বালক আমাদের মাঝে উদয় হয়। খেয়াল করে দেখি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে ওরা বটের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। ওদের পেয়ে আমার শত্রু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। এক লাফে সে তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। তাদের চুলে বৃষ্টির ভাপ, গায়ে ঘামের গন্ধ। তবুও শত্রুর বাহু ওদের কয়েকজনের বাহুতে ঘষা খায়। আর এতে আমি বুঝতে পারি, আমার সাথে কথা বলে শত্রু কত বিরক্ত হয়েছে। শত্রু আমার দিকে তাকিয়ে ডান হাত আর ডান তর্জনি তাক করে :

"রু মায়ের দুধের মতো সুখ পান করতে চায়, অথচ সে জানে না, সুখ কী জিনিস। তার প্রতি আমাদের করুণা।"

আমার কাছ থেকে শেখা বাণী দিয়ে শত্রু আমাকে ঘায়েল করে। আমি বালকগুলোর কাছে আমার ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করি। তারা আমার কথা শেষ হতে দেয় না। তার আগেই তারা হাসাহাসি শুরু করে। শরতের বৃষ্টি এই আসে এই যায়। সহসা রোদ উঠে। ওরা আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যায়।

সে-দিন লজ্জা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরি। সারা দিন আমার লজ্জায় কাটে। রাতে আমি কাঁদি। সেই প্রথম—এবং পরে আরও বহুবার—আমি দেখেছি, মানুষ এক নিষ্ঠুর প্রাণি। সে আমার ত্রুটি খুঁজবে, আর অনেক দিন তা মনে রাখবে। দুঃসময়ে সে আমাকে অপমান করবে। সুসময়ে সে আমার শান্তি নষ্ট করবে। সে-রাতে আমি প্রতিজ্ঞা করি, আমি কম কথা বলব, আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব।

আমি আমার কথা রাখতে পারিনি। আমি রাস্তায় চিৎকার করে লোক জড়ো করেছি। আমার শরীরে ছত্রাক বাসা বেঁধেছে।

মানুষ আমাকে কখনও বুঝতে পারেনি। এর জন্য আমার দোষও কম ছিল না। আমি সব কিছু জটিলভাবে তুলে ধরতাম। তাদের সাথে না মিশে, দূর থেকে আমি তাদের সহানুভূতি চাইতাম। আমি তাদের বলতাম, যদি তাদের একই দুঃখ থেকেও থাকে, আমার দুঃখ গভীরতর, কারণ আমি তা গভীরতরভাবে অনুভব করি। আর কোনও কারণে না হোক, শুধু আমার অনভূতির জন্যই আমার দুঃখ গভীরতম। আমার কথা যত বেশি তাদের বুঝাতে চাইতাম, তত বেশি তারা আমাকে নিয়ে হাসিতামাসা করত।

জীবনের বাস্তব বিষয়গুলো—জমিজমা-টাকাকড়ির হিসাব, কাপড়চোপড় ধোয়া, বন্ধুদের খোঁজখবর রাখা, প্রার্থনার সময় হাসি এলেও তা চেপে রাখা—আমি কখনও শিখিনি। ছোটখাট জিনিস অনেক কষ্ট করে শিখেছি। একশ বার ধাক্কা না খেয়ে কোনও অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করতে পারিনি। অথচ আমার বাসনার সাফল্য ঘরে তোলার জন্য আমি এক দিনও ধৈর্য ধরতে চাইনি। আমি ব্যর্থ হয়েছি। তবে হার মানিনি। আমি আমার সমস্যার যত গভীরে গিয়েছি, তত গভীরে যাওয়া আর কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঈশ্বর আমার অধ্যবসায় গ্রহণ করেছেন, ফলে পরিশেষে তিনি তাঁর প্রাচুর্য থেকে আমাকে পুরস্কৃত করেছেন। আমার অভিজ্ঞতা বাস্তবে যত বিষাদ, স্মৃতিতে তত মধুর।

স্মৃতিবিধুরতা : যত বেশি আমি আমার অতীতে ফিরে যাই, তত জীবনকে নষ্ট করার অর্থ খুঁজে পাই, যদিও একদা আমি এ নিয়ে অনেক দুঃখ করেছি।

"জীবনে সুখী হওয়ার একটাই উপায় : সোজা পথে চলা," অনেক বছর পর জ্যোতিষী ধ্রোন বলেছিলেন। "সুখী হতে চাইলে জিব কামড়ে ধরে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করো। যদি তা না পারো, গ্রামে চলে যাও, ভূমি চাষ করো। যদি জমি না থাকে, গ্রামের স্কুলের শিক্ষক হও। যদি তা-ও না পারো, উপাসনালয়ে যোগ দাও। প্রতিবেশিরা তোমার জন্য খাদ্য নিয়ে আসবে, খাটে তোমার বিছানা পেতে দিবে। তুমি সুখী হবে।"

ধ্রোনের মতে, নিরর্থক আশা বুকে নিয়ে রোদের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে উপাসনালয়ের শীতল মেঝেতে বসে উপাসকদের পবিত্রগ্রন্থ পড়ে শোনানোয় জীবনের সার্থকতা অনেক বেশি।

নিঃসন্দেহে এ ছিল এক উত্তম উপদেশ। কিন্তু তা এসেছিল আমার কাছে অনেক পরে। তার আগেই কামনা আমাকে কিনে ফেলে। ফলে আমি যত বেশি উপদেশের সম্মুখীন হই, তত আমার কামনা বাড়ে। আর উপদেশদানকারীরা আমাকে ভর্ৎসনা করে। তাদের কথা না শুনে আমি এগিয়ে যাই, দিশেহারা হয়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়াই, অতীতকে ভুলে থাকার জন্য একের পর এক দুঃসাহসিক কাজ করি, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য বার বার চেষ্টা করি, ব্যর্থ হয়ে মৃত্যু কামনা করি, আর ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আশায় বুক বাঁধি।

মরীচিকার অতল গহ্বরে আমার পতন নীল সমুদ্রে এসে প্রথম বাধাগ্রস্ত হয়।

২

হে আমার শ্রোতাগণ, আপনারা এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, আমি আর আপনাদের জগতের অংশ নই। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করি, কান খাড়া করে আমার কথা শুনুন। আমি যা জানি তা আপনারা জানেন না। আমি যে জগতে বাস করি, সে জগত সম্পর্কে আপনাদের কোনও ধারণা নাই। আপনার যে জগতে বাস করেন, আমি তার সব জানি। আমার জগতে মানুষ কলুষতামুক্ত। মৃত্যু এক ছাঁকনি, যা দিয়ে ছেঁকে জীবনের কলুষতা পৃথিবীতে রেখে দেয়া হয়। এখানে সবাই খালি হাতে আসে। নিয়ে আসে শুধু হৃদয়ের অনুভূতি। পরকালের সামগ্রিক সত্তা অনুভূতি দিয়ে তৈরী। আমি এখানে সুখী, কারণ ইহকাল থেকে ভালবাসা নিয়ে আমি পরকালে প্রবেশ করেছি। কিন্তু ভালবাসা এখানে ভিন্ন জিনিস। এখানে ভালবাসা আমার অধীন, আমি ভালবাসার অধীন নই। আমার হৃদয় এখানে আমার কর্তৃত্ব মানে। ইহকালে সে আমার কর্তৃত্ব মানেনি।

সে-কথা ভাবলে এখন হাসি পায়। কারণ প্রেম বা নারী নয়, মৃত্যুভয় ছিল আমার জীবনের প্রথম সমস্যা। আমরা শিশুরা ইহকালের কোনও কথা শোনার আগে পরকালের কথা শুনতাম। আমাদের সমাজ শুধু পরকালের শিক্ষা দিত, আর ধরে নিত, অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ইহকালের শিক্ষা পাব।

ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা বা ভূমিকম্প হওয়ার পর আমাদের পাদ্রিরা স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থের আলোকে, একশ-কি-সর্বোচ্চ দু'শ বছরের মাথায় পৃথিবী ধ্বংস হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। পবিত্র গ্রন্থগুলোর মতে, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে অরাজক সময় হবে পৃথিবীর শেষ দিনগুলো। মানুষ তখন মিথ্যাকে বিশ্বাস আর সত্যকে অবিশ্বাস করবে। একে অন্যের গলা কাটবে। মাস্তানরা নিরীহ মানুষকে রাস্তার উপর মার-ধর করবে। শক্তিমান দুর্বলকে উলঙ্গ করবে। ব্যাঙের ছাতার মতো খারাপ মানুষ বেড়ে যাবে। নারীরা অধিকতর শক্তিমান, বুদ্ধিমান, আর আধিপত্যবাদী হবে। তাদের কামনা বেড়ে যাবে। বোন ভাইকে উত্যক্ত করবে। মা ছেলেকে নষ্ট করবে। কন্যা পিতাকে তাড়া করবে, আর পিতা প্রাণ ভয়ে পালাবে। বাজারের সব বিষ বিক্রি হয়ে যাবে। 'মৃত্যুর জন্য

ঈশ্বরদূতের তূর্যনিনাদের অপেক্ষা কোরো না,' যারা পবিত্রগ্রন্থের এই নির্দেশ জানতেন, কেয়ামতের আভাস পাওয়া মাত্র তাঁরা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। এক শনিবারে সাপের কামড় খেয়ে শেষ নিষ্পাপ ব্যক্তির মৃত্যু হবে। সেই একই দিন ঈশ্বর তাঁর দেবদূতকে স্বীয় তূর্যটি ঘষামাজা করার নির্দেশ দিবেন। রবিবারে সবাই জানবে, শেষ বিচারের দিন এসে গেছে, কারণ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে। সে-দিন সকলে কাছাকাছি জঙ্গলে যাবে, গর্তে গর্তে খুঁজে সাপ বের করে আনবে। সাপগুলোকে তারা উত্ত্যক্ত করবে তাদের দংশন পাওয়ার জন্য। তখন সাপের দাঁত থাকবে না, আর তাদের মাথা মৃত শিশ্নের মতো নুয়ে পড়বে। দংশনের আশায় হতাশাগ্রস্ত নর-নারী সাপগুলোকে পায়ের নিচে মাড়াবে। সাপের কাঁটায় নিজেদের পায়ের রক্ত ঝরবে, তারপরও কেউ একটি কামড়ও পাবে না। সাপের মাংসের কাদায় পা পিছলে তারা নিকটবর্তী মাঠে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য তারা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। কারণ, তাদের কেউ রাতের বেলা ঈশ্বরের নাম মুখে আনেনি। যদি তাদের একজনও রাতে ঈশ্বরকে স্মরণ করত, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠত না।

"তুমি ভাই একবার ঈশ্বরের নাম জপ করতে পারতে," একজন চিৎকার করে বলবে।

"তুমি।"

"তুমি।"

তারা ঝগড়া করবে আর পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াবে।

সময় তখন বেলা দশটা। বেলা সোয়া দশটায় দেবদূত তূর্যে সুর তুলবে। সাড়ে দশটা নাগাদ পৃথিবী থেকে শেষ মানব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বেলা এগারোটায় ঈশ্বর মানুষের ভাল-মন্দ কাজ নিয়ে ভাবতে বসবেন। চল্লিশ বছর ভাবার পর সবাইকে তিনি কবর থেকে ডেকে তুলবেন। এ হবে কেয়ামতের এক অংশ, যা কিনা এক অনন্তকালের চেয়েও দীর্ঘ।

যে কোনও বড় ঝড়ের পর আমরা শিশুরা কেয়ামতের কথা আলোচনা করতাম। এ ছিল কেয়ামতের চিত্রের ধর্মীয় বিবরণ। বহু বছর পরে, যখন অনেক ধনী দেশের শিশু জন্মের হার কমে যায়, কেয়ামত নিয়ে এক আন্তর্জাতিক বিতর্কের ঝড় উঠে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, কেয়ামত আসবে মানুষের সন্তান জন্মদানের অনিচ্ছা থেকে, অন্যদিকে দেবদূতের তূর্যনাদ থেকে

কেয়ামত সৃষ্টি হবে বলে পাদ্রিরা মূল সত্যে অবিচল থাকেন।

শৈশবে আমরা কেয়ামতের শুধু ধর্মীয় ভাষ্যটি জানতাম, যা ছিল ঈশ্বরের ধ্বংস ও শাস্তি প্রদানের অসীম ক্ষমতার বিবরণ।

দুর্যোগ চলে গেলে অন্য শিশুরা কেয়ামতের কথা ভুলে গেলেও, আমি তা নতুন দুর্যোগ আসা পর্যন্ত মনে রাখতাম। ফলে, একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাকে কেয়ামতের ভয়ে কম্পমান রাখত। আর সাথে ছিল আমার মৃত্যুভয়। কারণ, শৈশব থেকেই আমি পাপকর্ম ও পাপচিন্তায় মগ্ন হই। গোসল, আহার, দৃষ্টি, বচনসহ আমার জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র ছিল না, যেখানে পাপ লুকানো ছিল না।

উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে, বা খেতে বসে ঈশ্বরের ১৩৩ টি নামের প্রাসঙ্গিক নামটি স্মরণ না করলে, বা নারীর বুকে চোখ পড়লে, বড় পাপ হত। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অনাবৃত উরু আর চক্ষু-সুখের উপভোগ ছিল ব্যভিচার এর অন্তর্গত। কেয়ামতের দিন ব্যভিচারীকে আগুনের গুহায় ঢুকান হবে, আর ব্যভিচারিণীকে জ্বলন্ত লোহার ডান্ডা দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। ব্যভিচারী পান করবে ফুটন্ত রজস্রাব। ব্যভিচারিণী কী পান করবে তা স্বয়ং ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিবেন। আর এ হবে এক অনন্ত শাস্তির শুরু মাত্র।

সাপ্তাহিক উপাসনার দিন বেলা বারোটায়, উপাসনালয়ের বেদিতে দাঁড়িয়ে পাদ্রিরা এসব পাপের বিরুদ্ধে সমবেত জনতাকে সতর্ক করে দিতেন, আর পাপগুলোর শাস্তির কথা পবিত্রগ্রন্থ থেকে ব্যাখ্যাসহ পড়ে শুনাতেন। তা সত্ত্বেও কেউ পাপ থেকে বিরত থাকত না। বেশির ভাগ মানুষ উপাসনালয় থেকে বের হয়েই পাপ শুরু করত। আমি বুঝতাম, শাস্তি অনেক পরে হবে বলে তারা পাপ করতে ভয় পেত না। তাদের অভয় দেখেও আমি কোনও শান্তি পেতাম না। সুর, ছবি, অনাবৃত-উরু আর চক্ষু-সুখের পাপ আমাকে পিছু-ধাওয়া করতে থাকে।

স্থানীয় পাদ্রিকে আমি বার বার পরকালের শাস্তির কথা জিজ্ঞেস করতাম। এক দিন বিকালে আমি তাঁকে তা বর্ণনা করতে বলি। সে-দিন বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। বিরূপ আবহাওয়ায় পাদ্রি মহোদয় আমাদের বাড়িতে দুই ঘন্টা আটকা পড়ে ছিলেন। পুরো দুই ঘন্টা তিনি আমাকে পরকালের শাস্তির কথা শোনান। তিনি বলেন, পরকালের শাস্তির কথা বলার জন্য দুই ঘন্টা অতি অল্প সময়। আমাদের বাড়িতে ধর্মকর্মের বালাই ছিল না বলে তিনি দুঃখ করেন। আমাকে

তিনি ধর্মের পথে আসার আহ্বান জানান :

"মৃত্যু-ভয়ই যখন তোমার জীবনের একমাত্র সমস্যা, তখন ধর্মের পথে চলে আসছ না কেন? মৃত্যুর পর যদি দেখ কিছু নাই, তখন ভেবো, প্রার্থনার সময়টা নষ্ট করেছ। আর প্রার্থনার সময়তো খুব বেশি না। আর যদি দেখ পরকাল আছে, আগুন আছে, অথচ তুমি প্রার্থনা করে মরনি, তখন কেমন অনুশোচনা হবে ভেবে দেখেছ কি?"

পরকালের আলাপ করতে করতে সান্ধ্য প্রার্থনার সময় হয়ে যায়। ঝড় আগেই থেমে গেছে। এক সময় বৃষ্টিও থামে। আমি পাদ্রির সাথে উপাসনালয়ে যাই।

পথে পাদ্রি বলেন, "তোমার পিতা প্রার্থনা করুক বা না করুক, তুমি প্রার্থনা করবে।"

সে-দিন নিয়মিত প্রার্থনা শেষে, পাদ্রির অনুরোধে সাড়া দিয়ে, ঈশ্বরের নিকট দু'হাত তুলে উপস্থিত জনতা আমার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন : যেন আমি কখনও ঈশ্বরে বিশ্বাস না হারাই, যেন আমি আবশ্যিক দৈনন্দিন প্রার্থনাগুলো সময়মতো করি, যেন আমি অসময়ে ঈশ্বরের উপর ভরসা করি, যেন সুসময়ে তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকি, আর যেন আমি বিশ্বাস নিয়ে মরি।

ঈশ্বর এই সমবেত প্রার্থনার শুধু অংশমাত্র গ্রহণ করেন। আমি কখনও তাঁর উপর বিশ্বাস হারাইনি। অসময়ে আমি সব সময় তাঁর উপর ভরসা করেছি। এবং আমি বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছি। অন্যদিকে সুসময়ে আমি তাঁকে মনে রাখিনি, কারণ আমার জীবনে সুসময় কখনও আসেনি। আর ওই প্রার্থনার যে অংশটি প্রাত্যহিক বন্দনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, ঈশ্বর তা প্রত্যাখ্যান করাতে আমার দ্বারা তিনি কখনও দৈনন্দিন প্রার্থনা আদায় করেননি।

দৈনন্দিন প্রার্থনাগুলিতে অংশ না নিলেও, পরবর্তী জীবনে নতুন এক বাসনা নিয়ে আমি অনেক প্রার্থনা করি। আমার ইহকাল ও পরকাল এই বাসনাটি দিয়ে তৈরী। মৃত্যুভয়ের উপর গবেষণা করে আমি জীবন শুরু করি। প্রেমে পড়ার পর সে গবেষণা আঁস্তাকুড়ে চলে যায়। প্রেম আমার জীবনকে চিরতরে বদলে দেয়।

৩

মাননীয় শ্রোতাগণ,

যে সময়ে আমি আপনাদের এ কাহিনী বলছি, তখন ইউরোপ এক দরিদ্র রাজার আর আমেরিকা এক ধনী প্রজার জীবন যাপন করছে। আফ্রিকা তখনও যথেষ্ট সূর্যালোক পাচ্ছে না। এশিয়া পৃথিবীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আর আমার স্বদেশবাসিরা দৃঢ়তার সাথে রাষ্ট্রের শত্রুদের মোকাবেলা করছে কিন্তু তাদের সাথে কিছুতেই পেরে উঠছে না।

আমি যে জায়গায় আছি তাকে আপনারা সমুদ্রের তলদেশ, সুউচ্চ পর্বতচূড়া, বিস্তৃত বালিয়াড়ী, কণ্টকিত জঙ্গল, জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, কর্মব্যস্ত শহর, শান্ত পল্লিদেশ, স্বর্গ বা নরক বলে মনে করতে পারেন। তবে সমুদ্রতলদেশ একটি উপযুক্ত পরিবেশে হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ আমার পরকালের যাত্রা সমুদ্রের তলদেশ থেকে শুরু হয়। আমার স্বাভাবিক সৎকার হয়নি, কারণ আমি স্বাভাবিক জীবন যাপন করিনি, এবং আমার স্বাভাবিক মৃত্যুও হয়নি। আমার সৎকার হয়নি বলে আমার দুঃখ নাই। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবাই সমান, যাকে পবিত্র গ্রন্থ অনুযায়ী সৎকার করা হল, কিংবা অদৃষ্ট যাকে নীল সাগরে ডুবিয়ে মারল।

আমার নাম ছিল রুদেবিশ শেকাব। এই কঠিন নাম আপনাদের আপাতত মনে রাখার দরকার নাই। আমার গঠন ভাল ছিল। উচ্চতা ছিল আন্তর্জাতিক মানের। ওজন আমার পরিবারের মাপকাঠি অনুযায়ী কম ছিল। আমার হাড্ডিগুলো এক দর্শনীয় চওড়া কাঠামো তৈরী করেছিল, এক কথায় আমার ছিল এমন গঠন যা নারী আলিঙ্গন করে আনন্দ পায়। আমার গায়ের রঙ ছিল আমার গর্ব, যা ছিল সাবেক পৃথিবীর দুই বিপরীত গাত্রবর্ণের ঠিক মাঝামাঝি।

আমি লাজুক ছিলাম, তবে লজ্জাকে আমি ঘৃণা করতাম। কারণ লজ্জা আমার মুখের উপর ভেসে উঠত। দৈহিক কোনও কিছু নিয়ে আমি কেবল ওই সময়টাতেই লজ্জা পেতাম, যখন স্কুলের ছেলেরা জ্যামিতির স্কেল দিয়ে তাদের প্রকৃত দৈর্ঘ বের করার জন্য আমার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে বসত। আমি

জনসমক্ষে সে কাজ কখনও করিনি। যদিও গোপনে আমার নিজ বাসকক্ষে আমি সে কাজ হাজার বার করেছি।

আমি কখনও আমার জন্মতারিখ জানতে পারিনি, কারণ আমি আমার পিতাকে তা জিজ্ঞেস করিনি। পিতা অশিক্ষিত ছিলেন না। শুধু এটুকু বলা যায়, আমার জীবনে আমার জন্মদিনের অনুপস্থিতির মতো এই কাহিনীর আর কোনও কিছুই আমাদের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে না। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার স্নেহশীল প্রধানশিক্ষকটি হস্তক্ষেপ না করতেন, আমি হয়ত আমার জন্মতারিখ জানতে পারতাম। প্রধানশিক্ষক আমাকে চার-পাঁচ বছর বয়স চুরি করতে বলেন। আমি তাঁকে তাঁর পছন্দমতো একটা বয়স লিখে দিতে বলি। অশুদ্ধ জন্মতারিখ ব্যবহারই একমাত্র পাপ, যার জন্য ঈশ্বর ইহজগতে আমাকে সরাসরি শাস্তি দেননি। বাকি অপরাধগুলির শাস্তি আমাকে তিনি কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়ে দেন। যদিও আসলে আমার অপরাধ ছিল মাত্র একটি।

আমাদের সমাজ ছিল সমস্যাসঙ্কুল, তার চেয়েও বেশি ছিল অবোধ্য। আমাদের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সব ধরনের মানুষ থাকলেও, পাদ্রির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে, ৪০ ভাগ শিক্ষিত লোকের ৩০ ভাগই পাদ্রি ছিলেন। অ-পাদ্রি জনতাকে তাঁরা নাজেহাল করতেন। অশিক্ষিত মানুষ পণ্ডিতদের কাছে এলে পণ্ডিতদের সমর্থন করতেন, আর পণ্ডিতদের অনুপস্থিতিতে তাঁরা পাদ্রিদের সমর্থন করতেন। পাদ্রিরা সবাইকে ঈশ্বরের কথা বলতেন, শুধু নাস্তিকদের বাদ দিয়ে। নাস্তিকদের সাথে তাঁরা মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন বটে, তবে প্রথম সুযোগেই তাঁরা তাঁদের আল-খাল্লার নিচে লুকানো তলোয়ার দিয়ে নাস্তিকদের হত্যা করতেন।

আমাদের ধনী-শ্রেণি একটি ক্যানাডা, একটি অস্ট্রেলিয়া, দু'টি নেদারল্যান্ড বা বেলজিয়াম, তিন-চারটি সুইজারল্যান্ড বা নরওয়ে, ডজনখানে লুক্সেমবার্গ বা আইসল্যান্ডের সমান ছিল। তারপরও আমাদের সমাজকে চিনতে আপনাদের কষ্ট হবে। কারণ, পৃথিবীর আর কোথাও এত দরিদ্র মানুষ ছিল না।

পবিত্র গ্রন্থগুলির মতে ঈশ্বর প্রত্যেক জাতিকে একটি করে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের ভাগ্যে পড়ে প্রজনন-ক্ষমতা। আমাদের পুরুষদের শুক্র উর্বর ছিল। আমাদের নারীদের গর্ভাশয় ছিল টেকসই। জীববিজ্ঞানকে মিথ্যা প্রমাণ করে নারীরা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় বেশি করে ডিম্ব তৈরী

করতেন। নবজাতকের নাড়ি শুকানোর আগে স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীদের গর্ভবতী করতেন। প্রতি বার মিলনে পুরুষ নারীর গর্ভে একটি, দুটি বা তিনটি এবং কখনও চারটি বা ততোধিক সন্তান অঙ্কুরিত করতেন। জন্মনিরোধের কোনও ব্যবস্থাই আমাদের পুরুষদের উপর কাজ করত না। নিরোধের ডগা ছিঁড়ে শুক্র বের হয়ে যেত। এক বার চামড়ার নিরোধ ব্যবহারের জন্য সরকারি আদেশ জারি হয়। তাতে বড় সমস্যা দেখা দেয়। চামড়ার খরচ বেশি, আর তা কিছুক্ষণ পরার পরই দেহের ত্বকে ফোসকা পড়ত। ফলে কর্তৃপক্ষ চামড়ার নিরোধ ব্যবহারের বিধিনিষেধ শুধু তুলেই নেননি, সংশ্লিষ্ট আদেশ জারির জন্য তাঁর জাতির কাছে ক্ষমাও প্রার্থনা করেন।

নারীদের জন্য ট্যাবলেট ছিল আমাদের সমাজের একমাত্র উপযুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রক। কিন্তু নারীরা তা খেতেন না; তাঁদের কথা : ট্যাবলেট বেশ্যাদের খাবার। ফলে তাঁরা খরগোশের মতো সারা বছর সন্তান প্রসব করতে থাকেন। পাকা আমের মতো তাঁদের গর্ভ থেকে সন্তান মাটিতে ঝরে পড়ত। বিদেশীরা আমাদের দেশের মাটিতে পা দিয়ে সবার আগে প্রসূতির আর্তচিৎকার শুনতে পেতেন। গভীর রাতে ধান ক্ষেত থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাকের সাথে প্রসূতির চিৎকার অনুরণিত হত। বন্যা এসে ধুয়ে না নেয়া পর্যন্ত আকাশ-বাতাস পরিস্রবের গন্ধে ভারী হয়ে থাকত।

অতিপ্রজনন আমাদের দারিদ্র্যের কারণ হলেও, আমাদের জনগণের জ্যামিতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের জাতীয় উচ্চাশা বৃদ্ধি করে। বাকি দুনিয়া আমাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করত। আমরা তাদের উদ্বেগকে সন্দেহের চোখে দেখতাম। আমাদের মনীষীরা বলতেন, এক-দিন শুধু সংখ্যার জোরে আমরা সারা পৃথিবী দখল করব। আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী বলে তাঁরা নিয়মিত ঘোষণা দিতেন।

"আপনি পারমাণবিক বোমা দিয়ে অবশ্যই খুন করতে পারেন। তবে আপনি মুষ্টি দিয়েও খুন করতে পারেন, যদি আপনার অনেক মুষ্টি থাকে।" একবার এক সংবাদপত্র কলামে লেখা হয়। কলামটি আমাদের মহিলাদের চার-পাঁচটি করে গর্ভাশয় না থাকার জন্য আক্ষেপ করে, আর পুরুষদের প্রশংসা করে অমর-অক্ষয় শুক্রাণু তৈরী করার জন্য, যার অনেকগুলো অনেক স্রোত গড়িয়ে পুকুর, নদী আর সুয়িমিংপুলে গিয়ে সাঁতার কাটত, আর তারা আমাদের নারীদেরকে গোসল বা সাঁতারের সময় গর্ভবতী করত। এই অসতর্ক গর্ভধারণ অনেক ধার্মিক ও রক্ষণশীল পরিবারে কুমারী মেয়েদের আত্মহত্যা

আর প্রতিপক্ষ পরিবারগুলির মধ্যে সন্ধান-খুনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টি ধরা পড়ার পর ধনী কুমারীরা পলিথিনের-অন্তর্বাস পরে গোসল করতে নামত। আর গরিব কুমারীরা এক সময় নিয়মিত গোসল করাই ছেড়ে দেয়।

ধর্মবিশ্বাসের প্রভেদ তখন শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রধান আন্তর্জাতিক ধর্মগুলো তখন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এক-একটা মৃত্যুফাঁদ তৈরি করে। সম্প্রীতির অপর দুই শত্রু, ভাষা আর গায়ের রঙের পার্থক্যের সাথে যুক্ত হয়ে, ধর্ম ফাঁসুরের দড়িকে তলোয়াড়, ধর্ষকের শিশ্নকে করাত, ভ্রষ্টার যোনিকে সাঁড়াশি, প্রেমিকার হৃদয়কে পাথর, পাদ্রির লালাকে বিষ, রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তকে ধ্বংস, সৈনিকের লক্ষকে অভেদ্য, আর শিল্পীর উদাসিনতাকে ঘৃণায় পরিণত করে।

এ তো গেল আমার স্বজাতির কথা। আমার পরিবারও কিন্তু কম অদ্ভুত ছিল না। আমাদের বাড়ি আমার শৈশবের স্বপ্ন পূরণ করেনি, কারণ সেখানে কোনও নারী ছিল না। সেখানে ছিল আমার পিতা দিওনিশ শেকাব আর আমাদের পরিচারক নাজিফ। আমার যখন দুই বছর বয়স, তখন ম্যালেরিয়ায় আমার মাতার মৃত্যু হয়। জননীর কথা আমার শুধু এটুকু মনে আছে যে, কেউ এক জন আমাকে তখন ঘুম পাড়ানোর জন্য দুই উরুর উপর নিয়ে দোলাত। এ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছু আমার মনে নেই। গ্রামের মানুষ আমাদের বাড়িকে ঈর্ষা করত, কারণ সামন্তযুগে আমার পূর্বপুরুষরা জমিদার ছিল। আমাদের যুগে রাষ্ট্র ধনী আর গরিব এই দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। আমাদের পরিবার ছিল এই দুই শ্রেণীর মাঝে স্যান্ডউইচের সুমিষ্ট আচারের মতো। কাছাকাছি কোনও ধনী পরিবার না থাকায়, তা ছিল মাখনের মতো। তবে ওই বাড়িটিকে আমি পছন্দ করতাম না। কারণ আমি কথা বলতে চাইতাম। কিন্তু বাড়ির অন্য প্রধান বাসিন্দা, আমার পিতা, মুখ বন্ধ করে রাখতেন। আমি অনেক দিন তলোয়ার নিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়েছি। তবে কখনও কোপ দেয়ার সাহস পাইনি। আর শিশুরাতো কত কিছুই করে। এ সবের আসলে কোনও গুরুত্ব নাই।

আমার কাছে আমি আমার পিতার চেয়ে বেশি অদ্ভুত ছিলাম। ছেলেরা বারো বছর বয়সে যা শুরু করে আমি তা তিন বছর বয়সে শুরু করি। এত অল্প বয়সে সে নষ্টামি শুরু করেছিলাম বলে তা মুখে আনতে পারছি না। তবে আপনার নিশ্চয়ই তা আন্দাজ করে নিয়েছেন। এবং আপনাদের আন্দাজ সঠিক। যাঁরা তা করতে পারছেন না, তাঁরা ভাবতে পারেন, অনিষ্টকর কাজটা

আমি পাঁচ বছর বয়সে শুরু করেছিলাম। এটা ভাবুন, তা হলে আপনি তা সহজে খুঁজে পাবেন।

আলস্য যে আমার রক্তে ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নাই। কোনও কাজ না থাকাতে আমার নিবাস ছিল কল্পনার রাজ্যে। তাতে যা সুবিধা হয় তা হল জীবনের মূল্য সম্পর্কে আমার ধারণা আমার সমসাময়িক মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। অতি শৈশবে পেকে যাওয়ার ফল হল এই যে অতি অল্প বয়সেই আমি নারী-প্রেমকে আমার ধ্যানে পরিণত করি। আমার এ বৈশিষ্ট্য ছিল তুলনাহীন। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ইতিহাস, সাহিত্য, রূপকথা, লোককাহিনী, এ সবে বর্ণিত কোনও চরিত্র কখনও আমার মতো নারী-প্রেমের সন্ধান করেনি। আমার অনুসন্ধানের কাজটিও ছিল বেশ ব্যতিক্রম। তবে নারীর প্রেম আমার কপালে ছিল না। এক সময় আমি বুঝতে পারি, আমার জন্মের আগে ঈশ্বর আমার ইহ-জীবনের এক স্বকীয় নকশা তৈরী করে রেখেছিলেন, যদিও আমি তখন তার কারণ জানতে পারিনি। জানতে পারলে আমি তখন কথায় কথায় ঈশ্বরকে দোষারোপ করতাম না। সত্য কথা হল, ঈশ্বর নয়, আমার বিচারবুদ্ধিহীন কাজকর্মই ছিল আমার দুর্ভোগের কারণ। জীবনে প্রথম যে দিন নারীর প্রেম কামনা করি, সে-দিন থেকেই মূলত আমার পতন শুরু হয়।

৪

এক দিন খেলার মাঝে বিরতির সময় একটা ছেলে বলে, "আমি বাড়ি যেতে চাই না। ডাইনিদের আমার ভাল লাগে না। আমি সারা দিন মাঠে থাকতে চাই।"

সে রাতটা আমার জীবনের প্রথম নির্ঘুম রাত ছিল না। কারণ সে রাতে আমি হয়তো এক-দুই ঘন্টা ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু বাকি রাতটা আমি ডাইনিদের কথা কল্পনা করে কাটিয়েছি। আর পর-দিন কোনও এক অজুহাতে আমি সেই ছেলের বাড়ি যাই। সেখানে উঠানে ছেলেটার মা, বোন, চাচি, পিসি, দাদি মিলে অনেক নারীর দেখা পাই। তাদের কেউ উঠান ঝাড়ু দিচ্ছিল, কেউ কাঠে গোবরের প্রলেপ দিচ্ছিল, কেউ মাছের আঁশ তুলছিল, কেউ আয়নার সামনে

চুল ঠিক করছিল, কেউ সেলাই করছিল। আমার মনে নারী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আগে থেকেই কয়লা হয়ে ছিল। ওই উঠানের দৃশ্য দেখে মনে আগুন লাগে। জংলি কলমি ঘেরের আড়ালে দাঁড়িয়ে, সাপখোপের ভয় ভুলে গিয়ে, আমি অসংখ্য নারীর সমাহার দেখি, আর দেখতে দেখতে আমার বুক শক্ত হতে থাকে, লজ্জায়, ক্রোধে, আর এক সময় কলমির একটা সবুজ পাতার উপর টেক করে এক ফোঁটা পানি পড়ে। তখন আমি বুঝতে পারি ওই পানি আমার চোখ থেকে ঝরেছে। তখন আমার কান্না কেউ দেখলে লজ্জায় আমি তাকে আক্রমণ করে ফেলতাম। রাঙের মাংসে বা পায়ের গুলে কামড় দিতাম। আমার বুকে লোহার খন্তার একটা কোপ পড়ে যখন দেখি আমার সামনে দিয়ে এক জন হেঁটে যায়। আমাকে সে দেখে না। আমি তাকে দেখি। তার চুল থেকে পানি ঝরে। গায়ে কাপড় ছিল না বলব না। গোসলের পর আমাদের নারীরা যা পরত তা সে-ও পরে ছিল। সে দৃশ্য ভোলা যায় না। এখন আমি বুঝি কেন রোমান সম্রাট কালিগুলা নেত্তুনোর জঙ্গলে দুই খণ্ড বস্ত্র পরিহিতা দ্রুচিল্লার পিছে পিছে চলত আর বার বার কপালে আঘাত করে বলত পূর্ব জন্মের কোন অপরাধে সে আলেক্সান্দ্রিয়ার রাজপরিবারের চাকর না হয়ে রোমের অধিপতি হতে গেল। প্রেমে যে সুখ সে সুখ কি রাজদণ্ড দিতে পারে? সে সময়ে আমি তখনও কালিগুলার নাম শুনিনি। কিন্তু আজ আমি কালিগুলার দুঃখ অনুভব করতে পারি। কারণ সে সময়ে আমার বুকেও এমন দুঃখ হানা দিয়েছিল। আর এর মূল কারণ ছিল আমাদের ঘরে কোনও নারী ছিল না।

সে বছর শরৎকালে আমাদের বাড়িতে এক খ্যাপাবুড়ি আসেন। এক বিকালে তিনি গ্রামের মধ্যে উদয় হন, আর শিশুদের সাথে ঝগড়া করেন। সন্ধ্যা হওয়ার পর তিনি বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আশ্রয় চান। কেউ তাঁকে খালি ভাতের হাঁড়ি দেখান। কেউ বলেন, তাঁদের চাল থাকলেও সবজি নাই। কেউ বলেন, তাঁরা তাঁকে রাতে রাখতে পারবেন না, কারণ তাঁদের শিশুরা তাঁকে ভয় পাবে। কয়েক জন পুরুষ একত্রিত হয়ে খ্যাপাবুড়িকে আমাদের বাড়ির দিকে ঠেলে দেন। আমাদের বাড়ির চারিদিকে ইটের প্রাচীর আর ঢোকার পথে লোহার গেট ছিল। লোহার গেট পার হয়ে আমাদের বাড়ি ঢোকার আগে খ্যাপাবুড়িকে নাজিফের হাতে কয়েকটা ধাক্কা খেতে হয়। পিতা তাঁকে রাখতে রাজি হন, তবে বলে দেন, আমাদের বাড়িতে কোনও নারী নাই, যার অর্থ, পর-দিন তাঁকে চলে যেতে হবে।

পর-দিন বিকালে তিনি আবার বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আশ্রয় চান। তিনি বলেন, তিনি থাকতে চান, কারণ আমাদের গ্রামের শিশুরা ভাল। শিশুদের অত্যাচারে তিনি অনেক গ্রাম ছেড়েছেন। অনেক দিন ধরে তিনি এমন এক গ্রাম খুঁজছিলেন, যে গ্রামের শিশুরা তাঁকে উলঙ্গ করার চেষ্টা করবে না। সে-দিন গ্রামের লোকজন ডোরিদের বাড়িতে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। খ্যাপাবুড়ির পীড়াপীড়ির কারণে তাঁরা উৎসব ফেলে পিতার কাছে ছুটে আসেন। খ্যাপাবুড়িকে আশ্রয় দেয়ার জন্য তাঁরা পিতার কাছে দাবি জানান।

"আপনি আমাদের মতো নন। আপনি তাকে রাতের বেলা আক্রমণ করবেন না।" এক নবতিপর বৃদ্ধ বলেন।

তাঁরা খ্যাপাবুড়িকে উঠানে ফেলে রেখে চলে যান।

মাঝবয়সী-সুন্দরী এই পাগলি ছিল আমার জীবনের প্রথম নারী। পরপর পাঁচ শীত তাঁর স্বামী এবং দুই ছেলে তাকে বাড়ি নিতে আসেন। প্রতিবারই খ্যাপাবুড়ি গোঁ ধরেন। তাঁরা অনেক দূর থেকে আসেন। প্রথমবার তাঁদের হইচই শুনে সারা গ্রাম উঠানে জড়ো হয়। অনেক দিন পর কাছে পেয়ে, খ্যাপাবুড়ি ছেলে দু'টিকে দুই হাত দিয়ে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর স্বামী তাঁকে ধমক দিয়ে বাড়ি নিতে চান। খ্যাপাবুড়ি মাটিতে গড়াগড়ি খান, আর ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদেন। গ্রামবাসিকে তিনি তাঁর লম্বা চুল দেখিয়ে বলেন, বাড়ি নিয়ে গিয়ে স্বামী তাঁকে কড়ির সাথে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে মারবে। হাত-পা ভেঙ্গে খালি ঘরে তালা দিয়ে আটকে রাখবে। দিনের পর দিন তাঁকে সেখানে পড়ে থাকতে হবে। ছেলে দু'টোর মুখ দেখে গ্রামবাসি বোঝে, খ্যাপাবুড়ির আশঙ্কার ভিত্তি আছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার। বালকদ্বয় তাঁদের মা'কে তাঁদের পিতার হাতে নির্যাতিত হতে দেখেছে।

উঠানে তখন গ্রাম্য-আদালত। গ্রামবাসি তার বিচারক। তাঁরা স্বামীটিকে নিয়ে হাসাহাসি করেন। তাঁরা বলেন, কেন ভাই, নিশ্চয়ই আপনার কিছু একটা নাই। সত্যি করে বলুনতো। মিথ্যা বলবেন না। মিথ্যা বললে আমরা আপনাকে বিবস্ত্র করব। আপনি শুধু শুধু নাজেহাল হবেন। সেটা না হতে চাইলে হাত দিয়ে দেখুন। নিজেকে নিজে পরীক্ষা করে বলুন আছে কি না। থাকলে স্ত্রী ঘর থেকে পালায় কেন? কই, আমাদের কারও স্ত্রীতো পালায় না। এই, তোমার স্ত্রী পালায়? তোমার পালায়? এর মধ্যে অনেকে তাঁদের স্ত্রীর সংখ্যার হিসাব দেন। দুই জন। তিন জন। চার জন। হিসাব প্রদানকারিগণ প্রত্যেকে একই কথা

বলেন, কই, কেউতো পালায়নি। শুধু আপনার স্ত্রী পালায় কেন?

আমি, রুদেবিশ শেকাব, জানতাম কেউ কেউ মিথ্যা বলছেন। কেউ অতিরঞ্জণ করছেন। কারণ তাঁরা কেউ হাস্যরসের সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন। এক সময় দুই হাত মাথার উপর তুলে আমার পিতার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ডামা ডোরি গর্জন করেন, তোমরা সবাই থামো। এটা তামাসার সময় নয়।

ডামা ডোরির ধমক খেয়ে সবাই চুপ করেন।

এর পর ডামা ডোরি বলেন, কেন তিনি নিরীহ মহিলাটিকে উত্ত্যক্ত করছেন, তিনিতো কারও কোনও ক্ষতি করছেন না। এটা সে বাড়ি, দাড়িশোভিত সেই নবতিপর বৃদ্ধ বলেন, যা এক সময় শত শত পাগল, দুঃস্থ, আর দুর্গত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। স্বামী মহোদয় যদি তাঁর স্ত্রীর প্রতি কোনও দায়িত্ব পালন করতে চান, তবে তিনি মাসোহারা পাঠাতে পারেন। একটা পাগল স্ত্রী থেকে তাঁর কী পাওয়ার আছে? না সে ভাত রাঁধবে, না তাঁর জ্বরের সময় মাথায় পানি ঢালবে। এ সব বলে বুঝিয়ে-সুজিয়ে প্রবীণ ব্যক্তিটির নেতৃত্বে গ্রামবাসি স্বামীটাকে ঠেলতে ঠেলতে গ্রাম থেকে বের করে দেন। ছেলে দু'টো তাদের পিতাকে অনুসরণ করে।

সে দিন তাঁদের সিদ্ধান্ত দেখার জন্য আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে ছিলাম। আমি কিছুতেই চাইছিলাম না, খ্যাপাবুড়ি আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাক। হোক সে পাগল। না হয় সে আমার সাথে কথা বলে না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে একজন নারী থাকবে, এটাই বড় কথা।

৫

সে-দিনের পুরো ঘটনায় আমার পিতা নির্লিপ্ত ছিলেন। খ্যাপাবুড়ির স্বামী ও ছেলেরা আরও চার বার আসেন। তাঁরা খ্যাপাবুড়ির জন্য পোশাক আর রোনা আনেন। পিতা খ্যাপাবুড়িকে বাড়ির সবচেয়ে ভিতরের ঘরটিতে থাকতে দেন। নাজিফ পরিপাটি করে ঘরটি পাটের মাদুর, কাঠের বিছানা আর পুরনো একটি টেবিল দিয়ে সাজিয়ে দেন। নাজিফ রান্না করে খ্যাপাবুড়িকে খাবার দিয়ে

আসেন, আর খ্যাপাবুড়ি পরিষ্কার চাদরের উপর বসে আরামে আহার করেন।

খ্যাপাবুড়ি সারা দিন ঘরে থাকতেন। শুধু বিকালবেলা শিশুদের তাড়া করতে বাড়ি থেকে বের হতেন। লোহার গেটটিকে আমরা ভেতর থেকে ছিটকানি টেনে খুলতে পারতাম। বাহির থেকে তা খুলতে হলে চাবি লাগত। আমার, পিতার আর নাজিফের চাবি ছিল। খ্যাপাবুড়ি ভেতর থেকে নিজে গেট খুলে বের হতেন। প্রতি সন্ধ্যায় পিতা বা নাজিফ তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসতেন।

শীঘ্রই গ্রামবাসি পিতাকে অনুরোধ করেন খ্যাপাবুড়িকে বিয়ে করার জন্য। বিয়ে করার জন্য পিতার প্রতি এটাই তাঁদের প্রথম চাপ ছিল না। গ্রামে হাটতে গিয়ে আমি জেনেছি, আমার মাতার মৃত্যুর পরও তাঁরা পিতাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। পিতা তাঁদের কথা শুনলে আমি অনেক আগেই ঘরে একটা নারী পেতাম। খ্যাপাবুড়ির আগমনে তাঁরা এখন আবার পিতাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, এমন একটা শক্ত-সবল দেহকে কষ্ট দেয়া পাপ।

"হাঁড়িতে চাল বসানোর জন্য হলেও একজন মহিলা দরকার," তাঁরা আসতে যেতে বলতেন।

"যদি শুধু সে পাগল না হত," ডামা ডোরি একদিন সেই নবতিপরকে বলেন, যিনি খ্যাপাবুড়িকে আমাদের বাড়িতে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তাঁরা নদীর পাড়ে আমার সামনে এই আলোচনা করছিলেন। গ্রামের ওই দুই প্রবীণ ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হলেও তাঁরা আমাদের ধর্মের নিয়মগুলো জানতেন। আমাদের ধর্ম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের স্ত্রীহীন জীবন অনুমোদন করত না। প্রবীণদ্বয় খ্যাপাবুড়িকে পাগল মানতে নারাজ। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ব্যাখা করেন, খ্যাপাবুড়িকে কেউ কখনও খ্যাপা হতে দেখেনি। বিকালে তিনি বাতাস খেতে বের হলে কিছু উচ্ছৃঙ্খল শিশু তাঁকে উত্ত্যক্ত করে মাত্র। বুড়ির, যদিও তিনি মোটেও বুড়ো ছিলেন না, তাঁর নব্বই দিনের বাধ্যতামূলক স্বামী-বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। ফলে ধর্মমতে তিনি আর কারও স্ত্রী নন। দিওনিশ শেকাব তাঁকে বিয়ে করলে গ্রামবাসি তাঁর ষণ্ডামার্কা প্রাক্তন স্বামীকে এ গ্রামে ঢুকতে দিবে না। তাঁরা বলেন, খ্যাপাবুড়ি সুন্দরী আর দিওনিশ শেকাবের জন্য মানানসই। কাজেই খ্যাপাবুড়ি তাঁদের পূর্বপুরুষদের জমিদারের নাতির ভাবি স্ত্রী হিসাবে মোটেই অনুপযুক্ত নন।

পিতা গ্রামের লোকের কথায় কান দেন না। আর তাঁরাও খ্যাপাবুড়িকে ভুলে

যান। কিন্তু আমি ভুলতে পারি না। ছেলেবেলা থেকে অচেনা জিনিসের প্রতি আমার অপ্রতিরোধ্য টান। খ্যাপাবুড়ি দূর দেশ থেকে এসেছেন বলে আমার তাঁকে বেশি ভাল লাগে। তিনি আমার সাথে কথা বলেন না সত্যি, কিন্তু তাঁর হাসিতে আমার মন ভরে যায়। আমি ভাবি, পিতার মৃত্যুর পর আমি তাঁকে বিয়ে করব।

এক দিন বিকালে, খ্যাপাবুড়ি যখন নদীর পাড়ে, আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসি। তিনি সবে শিশুদের তাড়া করে বাড়ি পাঠিয়েছেন। ঘামে তাঁর পোশাক ভিজে আছে। তখনকার যুগে যে স্বল্প সংখ্যক জিনিসে আমরা পৃথিবীতে শীর্ষ স্থানে ছিলাম মাথা-পিছু ঝরা ঘাম ছিল তাদের অন্যতম।

খ্যাপাবুড়ি আমাদের বাড়িতে ঢোকার দিন থেকেই আমি তার কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকি। তবে কখনও তার কাছে এক দুই মিনিটের বেশি আমার থাকা হয়নি। তাঁর কারণেই হয়নি। তবে কেন হয়নি তা জায়গামতো বলব। তাঁর এত কাছে বসতে পেরে আমার মনে কী যে খুশি। সম্ভোগের শীর্ষসুখ এর মুহূর্তগুলি আপনাদের কাছে যেমন অসীম মনে হয়, আমার কাছেও খ্যাপাবুড়ির সান্নিধ্যটা তখন তেমন লাগছিল। কারণ আমার আশঙ্কা ছিল তা যে কোনও সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। তার পাশ থেকে উঠে গেলে সে উধাও হয়ে যেতে পাওে, আমার তেমনটাই মনে হচ্ছিল।

শীর্ষসুখের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সবারই জানা আছে। খ্যাপাবুড়ির সাথে আমার অন্তরঙ্গতার সুখটাও স্থায়ী হয় না। আমি তাঁর দিকে যত আগ্রহ নিয়ে তাকাই তাঁর দৃষ্টি ততই দূরে চলে যায়। আমি যে একটা শিশু খ্যাপাবুড়ির আচরণে তার কোনও লক্ষণ নাই। নিজেকে মনে হল আমি তাঁর কাছে একটা মাটির মূর্তি। আর তাঁর তা-ও বুঝি সহ্য হচ্ছিল না। পানির থেকে তাঁর চোখ কখনওই সরেনি। পানির দিকে তাকিয়েই তিনি বলেন, "রুদেবিশ কি আমাকে কিছু বলতে চায়?"

তাঁর কথা শুনে আমার শুকিয়ে যাওয়া বুকের ভিতর একটুখানি আর্দ্রতার প্রলেপ লাগে। কারণ তিনি প্রথম বারের মতো আমার সাথে কথা বলেন। এর আগে যতবার আমি তাঁর সাথে কথা বলতে চেয়েছি, ততবার তিনি আমাকে এড়িয়ে গেছেন। আমার আরও ভাল লাগত যদি তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসতেন। শিশুদের তাড়া খেয়ে তাঁকে হাহা হিহি করে আমি হাসতে দেখেছি। অবশ্য সে রকম হাসিতে আমি আনন্দ পেতাম না। কিন্তু

তিনি যদি অন্য কোনও হাসি না জনানে, তা হলে আমার ওই পাগলা হাসিটা হলেও চলত। কিন্তু তিনি আমাকে তা-ও দিলেন না।

"তোমাকে আমার পাগল মনে হয় না," আমি বলি। "শিশুরা তোমার সাথে বেয়াদবি করে, এটা আমার ভাল লাগে না।"

কী বললাম বুঝলাম না। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর নমনীয় দেহখানা শক্ত হয়ে যায়। বাচ্চা হয়ে বড়দের সাথে কারবার করা যে কত কঠিন আমি তা ভাবছিলাম। নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার কষ্ট আমার বুকে। খ্যাপাবুড়ির সুন্দর গাল দু'টি টানটান হয়ে আসে। এই বুঝি তিনি কেঁদে উঠবেন। কেন তিনি কাঁদতে যাবেন? আমার মনে প্রশ্ন। যদিও আমি আজ এই ঘটনার সব কিছু বুঝি, সেদিনতো আমি তার কিছু বুঝতাম না। তাই সেই প্রশ্নের উত্তর তখন আমার কাছে ছিল না। এক বার মনে হল পালিয়ে যাই। কিন্তু তাঁর আকর্ষণের কারণে তা সম্ভব ছিল না। ভাবলাম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দেখি।

"তোমাকে কী বলে ডাকব?" আমি বলি।

"কেন?" তিনি বলেন, "পাগলাবুড়ি বলে। এটাইতো যথেষ্ট।"

আমি বলি, "পিতা বা নাজিফ নয়, আমিই তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব। ওই বুড়োদের হাত ধরে বাড়ি যেতে তোমার নিশ্চয়ই লজ্জা করে। তারা বলে তারা তোমার উপর বিরক্ত। আমার হাত ধরে বাড়ি যেতে তোমার লজ্জা করবে না। আমি ছোট। আমি বিরক্ত হব না। তাদের মতো আমার কোনও কাজও নাই। আমি সব সময় তোমার কাছে কাছে থাকব—"

আমি বুঝলাম আমি নিজেই বকবক করে যাচ্ছি আর আমার সাথী কিছুই বলছেন না। আমি বিব্রত হই আর চুপ করে যাই। আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি বসে থাকি। আমার মনে হাজার চিন্তা আসে। খ্যাপাবুড়ি কি বাস্তব, না কল্পনা, না ভূত, না জিন, না পরী। আমি কে? তিনি কে? মাটিতে কী তাঁর ছায়া পড়ে? এখনতো সূর্যও নাই। তাঁর বাহুতে কামড় দিয়ে দেখা দরকার তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরে কি না। রক্ত ঝরলে তিনি মানুষ। রক্ত না ঝরলে তিনি ছায়া, মায়া, বা অন্য কিছু, কিন্তু মানুষ না।

"রুদেবিশ শেকাব, আর কিছু বলতে চাও?" গলার স্বর নরম করে খ্যাপাবুড়ি বলেন।

"আমি তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে চাই।"

খ্যাপাবুড়ি তাঁর বাম হাত বাড়িয়ে দেন। কব্জির উপরে তাঁর হাতের পিঠে

আমি আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিই। তাঁর হাত ঠাণ্ডা। আমার গায়ে কাঁটা উঠে।

পানি থেকে চোখ সরিয়ে খ্যাপা বুড়ি আমার দিকে তাকান। আর বলেন, "তুমি তোমার পিতার মতো।"

তাঁর কথা শুনে আমি খুশি হই। গ্রামবাসির মধ্যে আমি শুধু পিতাকে অনুসরণ করতাম, আর তাঁর মতো হতে চাইতাম। পিতা যা যা করেন, বড় হয়ে তা তা করা তখন আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল। তবে পিতার মতো আমি নারীবিহীন জীবন যাপন করব না। সেটাও নিজেকে মনে করিয়ে দিই।

আমি বলি, "আমি তোমার সাথে থাকতে চাই। তুমি সামনে সামনে হাটবে। আমি পিছনে পিছনে হাটব। গ্রামের প্রত্যেক বাচ্চা কোনও না কোনও মহিলার সাথে ঘুমায়। আমি তোমার সাথে ঘুমাব। তুমি আর পাগলামি করবে না।"

"দিনের বেলা ঠিক আছে," চঞ্চল হয়ে খ্যাপাবুড়ি বলেন, "রাতে নয়; আমি পাগল।"

তখন খ্যাপাবুড়ির পাগলামি উঠে। তাঁর চোখের সাদা অংশ অক্ষিকোটরে সিদ্ধ ডিমের মতো গড়াগড়ি খায়। মুখের পেশীগুলো তিরতির করে কাঁপে। তিনি ঠোঁট খুলে আমাকে তাঁর ধারালো দাঁত দেখান। মনে হল তিনি আমার যকৃত কামড়ে ধরবেন। রাতের বেলা তাঁর সাথে ঘুমানোর কথা চিন্তা করতে গিয়ে ত্রাসে আমার পেট চিপে উঠে। আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াই। দাঁড়াতে কষ্ট হয়। শরীরের কাঁপ। কাঁপতে কাঁপতে আমি বাড়ির দিকে হাঁটা ধরি। তিনি স্থির হয়ে বসে থাকেন। তারপরও আমার মনে হয়, তিনি বুকে ভর করে আমার পিছনে পিছনে আসছেন। এক-এক বার মনে হয়, এই বুঝি তিনি আমার গোড়ালি টেনে ধরলেন। আর তাতে যেন ছেঁতছেঁত করে বিজলিচমকে আমার হাতমুখ ঝলসাতে থাকে। কোনওভাবে আমি বাড়ির গেট পর্যন্ত হেঁটে আসি। তালা খোলার আগে চাবিটা কয়েকবার আমার হাত থেকে পড়ে যায়। বিছানায় পৌঁছানোর আগেই আমার জ্বর আসে।

রাতে নাজিফ আহারের জন্য ডাকেন। আমি তাঁকে বলি, কম্বল দিয়ে আমাকে ভাল করে মুড়ে দিন। আরও রাতে পিতা আমাকে দেখতে আসেন। আমি বলি, জঙ্গলে ঢুকে জংলী ফল খেয়ে আমি জ্বর এনেছি।

আমার দুঃস্বপ্নে উল্টানো চোখ আর চোখা দাঁত নিয়ে খ্যাপাবুড়ি আমাকে বারবার তাড়া করেন। ঘুমের ঘোরে আমি ভাবি, আমি যা ভেবেছি, নারী তা নয়।

অসুখের সময় পিতা আমার উপর বিরক্ত হন। আমি সেরে উঠার পর তিনি মুখ কালো করে আমাকে সমুদ্রপাড়ে বেড়াতে নিয়ে যান। সমুদ্র দেখা আমার ছোটবেলার সবচেয়ে সুখের ঘটনা ছিল। পিতারও মন ভাল হয়ে যায়। তিনি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেন। তটের বাজার থেকে তিনি আমাকে জামা, চশমা, ব্যাগ, জুতা, আর রুমাল কিনে দেন। তিনি নাজিফের জন্য একটা জামা কিনেন, কিন্তু খ্যাপাবুড়ির জন্য কিছু কিনেন না। খ্যাপাবুড়ির জন্য কিছু কিনতে আমি তাঁকে অনুরোধ করি। তিনি বলেন, খ্যাপাবুড়ি একটা বোঝা। বাড়ি থেকে যেতে চায় না। তার জন্য কিছু কেনার দরকার নাই। পিতা আমাকে সমুদ্রের ধর্ম ব্যাখ্যা করেন। খরবায়ুতে বড়বড় ঢেউ। আমরা একটা হোটেলে দুই রাত থাকি। দ্বিতীয় রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, সমুদ্রে সাঁতার কাটছি। আরও অনেকে সাঁতার কাটছে। সমুদ্রের জলে ছোট ছোট তরঙ্গ। জলের নীচ থেকে উঠে বড় বড় গাছ আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোক ঢুকে ঢেউয়ের উপর পিছলে পড়ে। সমুদ্রের ওপারে স্বর্গ। স্বর্গ আমার গন্তব্য। আমি সুখে সাঁতার কাটি।

পিতা আমাকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন আমার ক্ষত সারাতে। সেরেও গিয়েছিল। রহস্যের জট খুলল অনেক বছর পর। যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে দিন বাড়ি এসে খ্যাপাবুড়িকে আমি আমার প্রতারক পিতার সাথে মিলনরত অবস্থায় ধরে ফেলি। তখন শহর থেকে শেষবারের মতো আমি আমাদের বাড়ি আসি। খালি বাড়ি পেয়ে তাঁরা খোলামেলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর তা করতে গিয়ে ক্রীতদাস নাজিফকে তাঁরা আমলেই নেননি। প্রেমের জন্য খ্যাপাবুড়ি আর পিতা যে নাটক সাজিয়েছিলেন, সে নাটক আর কখনও কেউ করেনি। আমি রেগে গিয়েছিলাম। তবে আমার রাগের কারণ তাঁদের ব্যভিচার নয়; তাঁরা যে আমার সাথে প্রতারণা করেছিলেন, সে জন্য আমি রাগ করেছিলাম। অথচ পিতা প্রথম দিনই আমাকে বলতে পারতেন, যখন আমি শিশু ছিলাম। দরকার হলে আমি নিজে খ্যাপাবুড়িকে পিতার ধরে ঢুকিয়ে দিতাম। তাঁদের জামাকাপড় খুলতে সাহায্য করতাম। বন্ধ দরজার বাইরে বসে তাঁদের পাহারা দিতাম। তাঁরা কখনও বুঝতেই পারেননি আমাকে আস্থায় নিলে আমার সাহায্যে আরও কত সহজে আর নির্ভয়ে তাঁরা রাতদিন যখন ইচ্ছা তখন মিলন করতে পারতেন।

আমার জীবনে খ্যাপাবুড়ির চেয়ে বড় কোনও প্রেমিকা দেখিনি। দূরদেশি

প্রেমিকের কাছে থাকার জন্য তাঁর সে কী কষ্ট স্বীকার। শিশুরা বনের কাঁটা দিয়ে তার পাছায় খোঁচা দিত। তাঁর দিকে গুয়ের দলা ছুঁড়ে মারত। রাস্তায় তাঁকে শুইয়ে দিয়ে তারা তাঁর চুল টেনে ধরত। আর সন্ধ্যা নামার পর সব ধুয়েমুছে, গায়ে আতর মেখে, তিনি তাঁর প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করতেন, কখন—আর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে—প্রেমিক তাঁর ঘরে ঢুকবেন।

আমার প্রতি খ্যাপাবুড়ির রূঢ় আচরণ আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। কারণ তিনি ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে যেতেন না। আসলে তিনি লজ্জায় আমার সামনে মুখ তুলেই দাঁড়াতে পারতেন না। সে জন্য তাঁকেতো আর দোষ দেয়া যায় না।

৬

লোটাস আমার মনে প্রথম দাগ কাটে খেলার মাঠে। লোটাস ছিল ডামা ডোরির বড় মেয়ে। লোটাসের সাথে আমার পরিচয় খ্যাপাবুড়ির চেয়েও পুরনো। আমরা দূর থেকে একে অন্যের দিকে তাকাতাম; কাছে এলে কথা বলতাম। এর বেশি কিছু না। সমুদ্রভ্রমণের পর সে-দিন প্রথম আমি খেলার মাঠে যাই। লোটাস কোথা থেকে যেন বাড়ি ফিরছিল। আমাকে দেখে সে রাস্তা বদলায়।

"বিচ্ছুগুলোর সাথে মেশ কেন? ওদের গায়ের ময়লায় তোমার সাদা শার্টটা নষ্ট হবে।"

এ কথা বলে লোটাস আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে।

গ্রামের মধ্যে লোটাসের অনেক বদনাম : তার বিয়ে হয় না। লোটাসের মা-বাবা ঝগড়া করেন। গায়ের রং ফর্সা হওয়ার কারণে লোটাসের দু'টি ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। লোটাসের বিয়ে হয় না, কারণ সে শ্যামলা। এ জন্য পাত্রপক্ষ অনেক টাকা যৌতুক চান। লোটাসের মা লোটাসকে বার বার একটা কথাই বলতেন, তুই বিষ খা, মরে যা।

এক দিন দূর থেকে চেঁচামেচি শুনে আমি লোটাসদের বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকি। মারামারি, ঝগড়াঝাটি দেখার প্রতি সব সময় আমার প্রবল কৌতূহল ছিল। আফসোস ছিল এই যে তখনও আমার একটাও মরা মানুষ দেখা হয়নি। কবর দেখেছি যদিও। আর ফুল ফল লতাপাতা গুরু ছাগল গাছপালা নদী আর

সমুদ্র দেখেছি। কিন্তু কখনও লাশ দেখিনি। তাই কোথাও গণ্ডগোলের খবর পেলেই আমি সে দিকে দৌড়াতে থাকতাম। তবে আমি সাহসী ছিলাম না। মারপিট দেখলে আমার হাঁটু কাঁপত। তবু দেখার আগ্রহে ভাটা পড়ত না।

লোটাসদের বাড়ি গিয়ে দেখি লোটাস আর লোটাসের মা ঝগড়া করছে। বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ গাছগাছালি, বেড়া, দেয়ালের আড়াল আর ঘরের কোনা থেকে তাদের ঝগড়া দেখছিল। আমি একটা খালি নিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যাই। লোটাসের মা উঠানের ঝাড়ু দিয়ে লোটাসের পিঠের উপর বার বার বাড়ি তুলছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম লোটাসের মা লোটাসকে মারবেন না। তবু ভয় হচ্ছিল যদি একটা বাড়ি লোটাসের পিঠে পড়ে যায়।

"ডাইনি। আমার আর সব মেয়ে ফর্সা, তুই কালো কেন? কে তোকে আমার পেটে ভরেছিল? কে আমার ঘরে প্রবেশ করেছিল? কে আমাকে হাত পা বেঁধে বাঁশ বাগানে নিয়ে গিয়েছিল? কথা বল। নইলে ... আমি আজ তোর পিঠের ছাল তুলে ফেলব।"

লোটাস কথা বলে না; সে ঘরের ভেতর দৌড়ে গিয়ে দা নিয়ে আসে। সে তার মায়ের হাত থেকে ঝাড়ুটা টেনে ফেলে দিয়ে মায়ের হাতে দায়ের গোড়াটা গুঁজে দেয়। আর নিজে মাটিতে শুয়ে পড়ে আর গলা উঁচিয়ে ধরে।

"পোঁছ দাও।"

"পোঁছ দাও।"

"পোঁছ দিচ্ছ না কেন তুমি?"

লোটাসের চিৎকারে শনের ঘরগুলো কেঁপে উঠে। আছাড় খেয়ে আমি নিম গাছের শিকড়ের উপর পড়ে যাই। লোটাসের মা দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

লোটাস বলে, "যদি খুন করতে না পার, আমাকে পীড়ন কোরো না।"

লোটাসের মা দা'টা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন। ঝাড়ুটা তুলে নিয়ে নিজের কপালে আঘাত করেন আর কাঁদেন। যাঁরা লুকিয়ে ছিলেন তাঁরা বের হয়ে আসেন। কেউ কেউ কিছু দায়িত্বশীল কথা বলেন, যা মা'র পক্ষে যায়, মেয়ের পক্ষে যায় না। লোটাস উঠে ঘরের ভেতর চলে যায়। লোটাসের পালানো দেখে আমার মন কেমন করে। আমি চাচ্ছিলাম লোটাস যেন কিছুতেই অপমানকারিদের কথা শুনতে না পায়।

তারা লোটাসের সাথে খারাপ ব্যবহার করত। এমনকি শিশুরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। শুধু লোটাসের বাবা, ডামা ডোরি, লোটাসের সাথে

ভাল ব্যবহার করতেন। ডামা ডোরির প্রবল আত্মসম্মানবোধ ছিল। তিনি তাঁর মেয়েদের জন্য ছেলে খুঁজতে যেতে অপমান বোধ করতেন। লোটাসের মা ডামা ডোরিকে প্রায়ই ঘর থেকে বের করে দিতেন। ডামা ডোরি ঘরে ঢুকার সুযোগ খুঁজলে তাঁর স্ত্রী জানালা দিয়ে মাথা বের করে ডামা ডোরি কার কার জারজ সন্তান উঁচু গলায় তাঁদের নাম ঘোষণা করতেন। স্ত্রীর কথায় ডামা ডোরির গাল লাল হয়ে যেত। স্ত্রী বলতেন, লোটাসের জন্য ছেলে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ডামা ডোরি যেন ঘরে না ঢুকেন। ডামা ডোরির পর আমি রুদেবিশ শেকাব দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে কখনও লোটাসের সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি।

"সে একটা ডাইনি, পাগল একটা, পুরা পাগল," এক দিন আমি লোটাসকে খ্যাপাবুড়ি সম্পর্কে বলি।

"তুমি কাছে থাকলে মা আমাকে গালি দিতে লজ্জা পায়।" লোটাস বলে তার মায়ের কথা।

লোটাসের মা আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন এই গরম এই ঠাণ্ডা। লোটাস আর তার বোনরা বলত, আমি তাদের ভাই। আমাকে দেখা মাত্র লোটাসের মা লোটাসকে ডেকে বলতেন, "লোটাস, তোর ভাই এসেছে।"

লোটাসদের বাড়ি যাওয়া আমার পিতা পছন্দ করতেন না। একদিন নাজিফ আর পিতা এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করেন।

নাজিফ বলেন, "শিশুর দরকার মা, না হলে মায়ের মতো কেউ, না হলে—"

নাজিফের কথা আমার মনে গেঁথে যায়। আমি মনে করি নারীর কাছে না গেলে আমি ভালভাবে বেড়ে উঠব না। পিতার উপর আমার রাগ হয়। পিতা নিজের কথা ছাড়া কারও কথা ভাবেন না। খ্যাপাবুড়ির সঙ্গ চাওয়ার জন্য নিজেকে আমার বুদ্ধিমান মনে হয়।

আমি আর লোটাস ঘনিষ্ঠতর হই। সে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। আমাকে সে প্রশ্রয় দেয়, আর তার আকাঙ্ক্ষার কথা বলে। তার চাওয়াপাওয়ার বেশি কিছু ছিল না। সে জানত তার জীবন তার মার বা দাদির জীবনের মতো হবে; চেষ্টা করেও সে এর খুব একটা উন্নতি করতে পারবে না। তারপরও তার সিল্কের পোশাক, পরিষ্কার বিছানা, ফুলের বারান্দা, একটা বড় উঠান আর একটা পুকুরের শখ ছিল।

লোটাস কঠিন কিছু পড়তে পারত না। প্রতি বছর বাচ্চার জন্ম দেয়া মা'কে সেবা করতে গিয়ে তাকে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। এক দিন লোটাস আমাকে

তার সিলাইয়ের বাক্স খুলে একটি চিঠি হাতে দেয়। তার প্রেমিকের চিঠি। লোটাস যে প্রেম করত, আমার জানা ছিল না। সে আমাকে চিঠিটা পড়তে বলে। ওই বয়সে প্রেমের চিঠি পড়তে হবে ভেবে আমার ভয় হয়। আবার গর্বও হয়। আমি বড়দের বিষয় জানতে পারছি। লোটাস আমাকে জানতে দিচ্ছে। আমি লোটাসকে চিঠিটা পড়ে শুনাই। পচা হস্তাক্ষর। তাতে ভালবাসা, বিয়ে আর মিলন এর কথা লেখা ছিল।

লোটাস প্রথমে আমাকে মিলন এর বিষয়টি বুঝিয়ে বলে।

"এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ছেলেরা সারা দিন শুধু এটার কথা ভাবে। আর কিছু দিন পর তুমিও তা-ই করবে।"

লোটাসের প্রেমিকের নাম ছিল বিনি তারা। সে ছিল আমাদের মাঠের ফুটবল খেলার রেফারি। সে ছিল তার পরিবারের ছোট ছেলে। বয়সে সে লোটাসের চেয়েও কিছু ছোট ছিল। আমার তখন জানা ছিল না, কোনও পুরুষ তার চেয়ে বয়সে বড় কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। লোটাস বলে, "এটা সম্ভব, ধর্মে মানা নেই।"

আমি লোটাসের কাছে প্রতিজ্ঞা করি আমি কাউকে বিনি তারার নাম বলব না। তখন গ্রামদেশে প্রেম করা খুব বিপজ্জনক ছিল। একবার প্রেমের বদনাম ছড়ালে, কোনও মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনা চিরতরে শেষ হয়ে যেত।

সে-দিন সারা বিকাল আমরা লোটাসের প্রেমের গল্প করি। লোটাস বকবক করে।

"'আমি তোমাকে শীঘ্র বিয়ে করব।' ওই লাইনটা আবার পড় না?" লোটাস বলে।

আমি পড়ি : "আমি তোমাকে শীঘ্র বিয়ে করব।"

লোটাস বলে, "সে আমাকে চায়, আর কিছু না।"

আমি বাড়ি ফিরতে চাই। লোটাস বাধা দেয়। সূর্য ডুবতে আরও কিছু সময় বাকি। লোটাস বলে, অন্ধকার হয়ে গেলে সে আমাকে খোলা মাঠটা পার করে দিয়ে আসবে। আমরা আরও কিছু সময় কথা বলি। সূর্য দেরি করে না। আমাকে ছাড়ার আগে উত্তেজিত হয়ে লোটাস বলে :

"আমার স্বামী আর তুমি হবে দুই ভাই। এখন সে আমার প্রেমিক। দু'দিন পর স্বামী হবে। আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও তুমি আমার ভাই থাকবে। আমরা ভাই-বোনের মতো বসবাস করব।"

লোটাসের কথা শুনে আমার চোখে পানি আসে। লোটাসও কাঁদে।

"আমরা কাঁদছি কারণ আমরা খুব আপন," লোটাস বলে।

আমি বলি, "অবশ্যই।"

"যে কোনও আপনজনের চেয়েও আপন। অন্যরা আমাদের বুঝবে না।"

নিজের ওড়না দিয়ে লোটাস তার চোখ মোছে, আর আমার দিকে নরম ওড়নাটার এক মাথা এগিয়ে ধরে। আমি তা দিয়ে আমার চোখ মুছি। লোটাসের গায়ে সাবানের গন্ধ। সে আমাকে চিঠিটা আর একবার পড়তে বলে। অন্ধকারে আমি তা আর একবার পড়ি।

বাড়ি ফেরার সময় আমি নারী-পুরুষের মিলনের কথা ভাবি। এর পর যতবার লোটাসের সাথে আমার দেখা হয়, ততবার আমি তাকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে বলি। এমন কি আমাদের মধ্যে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হলেও আমি তাকে চেপে ধরি। লোটাস আমাকে এড়িয়ে যায়। কখনও খুব জোর করলে বলে, "যথা সময়ে।"

এই পাপের বিষয়টি বার বার জিজ্ঞেস করে লোটাসকে আহত করার জন্য বড় হয়ে আমি অনেক অনুতাপ করেছি। কিন্তু সে-সময়ে আমি তাকে তা জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারতাম না। আমি ভাবতাম, যদি সে গোপনে প্রেম চালিয়ে যেতে চায়, আমাকে তার বিষয়টা খুলে বলতে হবে। খ্যাপাবুড়ি ক্ষমতাধর ছিল। লোটাস ছিল দুর্বল।

৭

পরের দিন আমাদের দেখা হলে লোটাস বলে, "রু, তুমি আমার জন্য একটা উপযুক্ত জবাব লিখে দাও।"

লোটাসের হাতে আগের দিনের চিঠি।

আমি লোটাসের জন্য চিঠি লেখা শুরু করি। বিনি তারা লোটাসকে আর কোনও চিঠি লেখেনি। লোটাস অনেকগুলো চিঠি লিখেছিল। তার চিঠিগুলোতে একটিই কথা : কীভাবে সে তার স্বামীকে বিয়ের প্রতিদান দিবে। কীভাবে সে

তাকে সুখী করবে। জীবনে আমি বহু মেয়েকে দেখেছি, নিরাপত্তার জন্য প্রেম করতে। কিন্তু লোটাসের মতো এত মরিয়া হতে কাউকে দেখিনি। তাদের ধর্মে রজঃস্বলা কোনও অবিবাহিতা নারী কেউ সহ্য করতে পারত না, এমনকি তার মাতা-পিতাও না। তাদের ধর্মমতে, শেষ বিচারের দিন নারীদের দুই লাইনে দাঁড় করাতে হবে, প্রথম লাইনে দাঁড়াবে তারা যাদের বিয়ে হয়েছিল, আর দ্বিতীয় লাইনে দাঁড়াবে তারা যাদের বিয়ে হয়নি।

"সাবধান, তোমার কন্যাকে যেন দ্বিতীয় লাইনে দাঁড়াতে না হয়।" এটা তাদের পবিত্র গ্রন্থের সতর্কবার্তা।

অনূঢ়া মেয়েদের পরকালের শাস্তি ইহকালেই শুরু হয়ে যেত। "প্রত্যেক গুণী নারীর জন্য আমরা একজন পুরুষ তৈরী করি," পবিত্র গ্রন্থের অন্য জায়গায় বলা ছিল। যে মেয়ের একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বিয়ে হয়নি, ঈশ্বর তাকে একাকিত্বের অভিশাপ দিয়েছেন বলে বলা হত। মেয়েদের উচ্চতা, পরিধি, ওজন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে পাদ্রিরা প্রত্যেক মেয়ের সেই নির্দিষ্ট বয়স হিসেব করে বের করতেন। জটিল ক্ষেত্রে একাধিক পাদ্রির সাহায্য নেয়া হত। পাদ্রিদের হিসাব অনুযায়ী কোনও মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলে, সে মেয়েকে সারা জীবন একা থাকতে হত। এ ধরনের মেয়েদের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। জানা যায়, লোটাসের মা এক প্রবীণ পাদ্রিকে দিয়ে তাকে "এখনও বিবাহযোগ্যা" বলে একটি সনদ নিয়েছিল। লোটাসের মা সনদটি লোটাসের সতেরো বছর বয়স থেকে নবায়ন করে যান। সেই সনদ অবশ্য তুলে রাখা ছিল; একান্ত বাধ্য না হলে তা ব্যবহারের ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

বছরের পর বছর পাদ্রিকে ঘুস দিয়ে সনদটি নবায়ন করার জন্য লোটাস মায়ের উপর বিরক্ত ছিল। মাকে এই কষ্টের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লোটাস পণ করে, যে-ভাবে হোক, সে নিজের বিয়ে নিজে ঠিক করবে। তার সাধনার ফল বিনি তারা, যাকে সে রোজ একটি করে প্রেমপত্র লিখে চলেছে।

আমার সন্দেহ দূর হয় যখন বিনি তারাকে লোটাসের উপর নির্ভর করতে দেখা যায়। সে ডোরিদের বাড়ির চার দিকে ঘুরঘুর করে, তাদের শিশুদের কানামাছি খেলার বিচার করে, আর সে আমার সাথে প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে। লোটাস তাকে ভাল ভাল খাবার পাঠায়। ওই বছর লোটাস ভাল কিছু খায়নি। তার ভাগ সরাসরি বিনি তারার কাছে চলে গেছে। বিনি তারা খাবারগুলো নেয়ার জন্য গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকত। অনেক কিছু আমি নিজে তাকে পৌঁছে

দিতাম। এ কাজে আমার আগ্রহ ছিল না। লোটাস আমাকে লোভ দেখাত।

বিনি তারার চার জন বন্ধু ছিল। তারা পাঁচ জন মিলে নদীর পাড়ে আড্ডা দিত। ফসল তোলা আর ফুটবল খেলার মাস ছাড়া সারা বছর তারা নদীর তীরে কাটাত। আমাদের অঞ্চলের মানুষ আড্ডাবাজ ছিল। রাস্তার উপর, নদীর পাড়, প্রায় সব জায়গায় তারা শনের ঘর তুলে রাখত, যাতে বৃষ্টির দিনেও ছাতা মাথায় করে তারা আড্ডার জন্য জড়ো হতে পারে। বিনি তারা আর তার বন্ধুদের একটা বাঁশের ছাউনি ছিল। লোটাস সব সময় ওই ছাউনিতে গোপনে খাবার পাঠাত, আর বিনি তারাদের আড্ডার সময় সারা বিকাল বাড়ির পিছনের বাগানে কাটাত। যে-যে স্থান থেকে প্রেমিকদের কুটীরটা দেখা যেত, সেই-সেই স্থানে গিয়ে সে দাঁড়াত। প্রেম হওয়ার পর লোটাস বাড়ির পিছনের সব কাজ নিজ হাতে একা করত। বাড়ির পিছনে বেলেল্লাপনা করার সময় এক দিন আমি লোটাসকে ধরে ফেলি। আমাকে দেখে লোটাসের গাল লাল হয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর চলে যায়। আবার কিছুক্ষণ পর ফিরেও আসে। তার হাতে এক বাটি পাকা আমের ফালি। লোটাস বাটিটা আমার হাতে ধরিয়ে দেয়।

"দিয়ে আসো, রু।"

"দিব, যদি তুমি আমাকে খুলে বল।"

"ঠিক আছে, আগে দিয়ে আসো।"

হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। লোটাসের ছাতা নাই। সে ঘর থেকে একটা চাদর এনে আমার গায়ে জড়িয়ে দেয়, আমি যাতে না ভিজি। আধোয়া চাদরটির ধুলায় আমার হাঁচি উঠে। আমগুলো নিয়ে আমি নীরবে ছাউনির কাছে যাই। বিনি তারা আর তার বন্ধুরা তখন লোটাসকে নিয়ে ব্যস্ত।

"বুকে কিছু নাই। "

"তাতে কি? অন্য পাশ। যে বড়-।"

"পাঁচ জন নিতে পারবে!"

"পাঁচ জন, একসাথে!"

"চার যথেষ্ট, তুই আমার কেনে আঙ্গুলের সমান।"

"ছয়, তুই যে ঘোড়া সবাই জানে।"

ওদের কথা আমি শেষ পর্যন্ত শুনতে চাই। দেখি, ওরা কী কী বলে। কিন্তু মরার হাঁচি উঠে একটা। আমার হাঁচির শব্দ শুনে ওরা চমকে উঠে। আর চুপ হয়ে যায়।

বিনি তারা এক লাফ দিয়ে এসে আমার দুই হাত চেপে ধরে বলে, "আমরা তার সম্পর্কে কিছু বলছি না।"

এক জন এসে আমার হাত থেকে আমের বাটি ছিনিয়ে নেয়।

"আমরা আমার চাচাতো বোনের কথা বলছিলাম," একজন বলে।

আমি দ্রুত ওদের আস্তানা ত্যাগ করি। কিন্তু ফিরে এসে আমি লোটাসকে কিছু বলতে পারিনি। এর একটা কারণ, লোটাস আমাকে বুকে চেপে ধরে; আমি মুখ খুলতে পারি না। 'ওই বিষয়' খুলে বলার দাবি তুলে না নিলে, লোটাস বলে, সে আমাকে ছাড়বে না। আর একটা কারণ, আমাদের অঞ্চলে মেয়েদের নিয়ে রগড় করা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

লোটাসের মুখে এমন আনন্দ, যেন ওর বিয়ে হয়েই গেছে। আমার প্রায় কান্না পায়। আমি রগড়ের কথা ভুলে যাই।

লোটাস গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ আর হেমন্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে। বিনি তারার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে না। লোটাসও আমার কাছে আর একটা তেমন আসে না। আমিও তার কাছে যাই না। এর মধ্যে আমি পিতার লাইব্রেরিতে অনেক মজার মজার বইয়ের সন্ধান পাই। অকালপক্ক আমি নিষিদ্ধ পুস্তক অধ্যয়নে নেমে পড়ি। আর আশা করতে থাকি লোটাসের বিয়ে হোক। বিনি তারার ঔরসে তার গর্ভে সতেরোটা সন্তানের জন্ম হোক। জগতের সকল প্রাণি সুখী হোক। আমার সুখ বাসনার নিবৃত্তিতে। আমাকে যেন কেউ বাধা না দেয়।

৮

শেষে এক দিন লোটাস আসে। শীতের সে দুপুরে নাজিফের রান্না করা মুরগির মাংস আর আটার রুটি খেয়ে জিবে ফুঁ দিতে দিতে আমি হাঁটার জন্য বের হই। খ্যাপাবুড়ি ছেঁড়া জামা পরে আমার আগেই বের হয়ে যায়। বাড়ি থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর দেখি, লোটাস আসছে। অনেকটা দৌড়ে এসে সে আমাকে ধরে ফেলে। তাকে দেখে বুকে ধাক্কা লাগে, দ্বন্দ্বও জাগে। যা দেখছি তা কি লোটাস না লোটাসের ছায়ামূর্তি। ছোঁয়া আর গন্ধ না পেলে আমি কী করতাম

কে জানে। চোখকে অবিশ্বাস করলেও ত্বক আর নাককেতো বিশ্বাস করতেই হয়। আমি প্রাথমিক ধাক্কাটা হজম করি। তারপর গেট খুলে লোটাসকে বাড়ির ভেতর ঢুকাই।

লোটাসের গায়ে একটা উলের শাল। শালটি তার নিজের বানানো। এটা ছিল লোটাসের পরিচয়। লোটাসকে কেউ কখনও কিছু দেয়নি। সে নিজের কাপড় নিজে সেলাই করত। গ্রামের মানুষদের সস্তায় কাপড় সেলাই করে সে নিজে চলত। ফ্যাকাশে আর পাতলা, লোটাস যেন আশপাশের গাছগুলোর প্রতিচ্ছবি : সূর্য-পোড়া, রুক্ষ, কংকালসার। লোটাসের সেই পরিবর্তন তখন বুঝতে পারিনি। বেশ কয়েক বছর পর ম্যালেরিয়ায় আমার এক বন্ধু মারা যাওয়ার সময় তা বুঝেছিলাম। চোখের সামনে দেখলাম, কীভাবে আমার বন্ধু পাতিলের তলার মতো কালো আর কাঠির মতো পাতলা হয়ে গেল।

"তোমরা কি দেখ না? রোগে, শোকে, মৃত্যুতে আমি তোমাদের কীভাবে পরিবর্তন করি? তবুও তোমরা বিশ্বাস কর না। তবুও তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা কর।" পবিত্রগ্রন্থের এই বাণী কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, আমি কখনও তা আর অস্বীকার করিনি।

লোটাস আমার মনের অবস্থা বোঝে। "ভয় পেয়ো না, রু। এখনই ভয় পেলে চলবে না।"

লোটাসের কথা শুনে বুকটা ধুক করে উঠে। লোটাস এভাবে কখনও আমার এত কাছে এসে দাঁড়ায়নি। তার বাতাসের গন্ধও আগে কখনও এমনভাবে পাইনি। আমাকে জড়িয়ে ধরে লোটাস কাঁদে। এমনভাবে কাঁদে যেন ও বন্যায় ভেসে যাওয়া পিতামাতার রেখে যাওয়া তিন বছরের অসহায় শিশু। আমার বুক ধুকধুক করে।

"রু, ভূমিকম্প হয়ে গেছে। আমি আর ইহকালে নাই। তুমি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ আমি জানি।"

আমি মাথা নাড়ি। আমি ভয় পাচ্ছি না।

লোটাস নিজেকে আমার শরীর দিয়ে ঢেকে নেয়। ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপে। লোটাস বলে তার মায়ের জন্য তার চিন্তা বেশি। পাঁচ মাস আগে লোটাসের বাবা মারা গেছে। লোটাস আর লোটাসের মাকে এখন গমের ক্ষেতে কাজ করতে হয়। হাটে গিয়ে কে কচুর লতি বিক্রি করবে তা নিয়ে তারা মারামারি করে। লোটাসের মাকে লোটাস ভয় পায়। লোটাস বলে সে

জানে না কী করে সে তার মাকে বুঝাবে।

আমি লোটাসের কথা বুঝি। আমি ভাবি বিনি তারার উপর আমার প্রভাব আছে। আমি বিনি তারাকে সব খুলে বলব। আমার মুখে বিনি তারার নাম আসাতে লোটাসের চেহারা বিকৃত হয়। আমি আর এক বার বুঝি আমি এখনও ছোট। লোটাসের এমন ভয়ানক চেহারা আগে কখনও দেখিনি। এমন নয় যে, এই প্রথম আমি লোটাসকে ক্ষিপ্ত হতে দেখেছি। তবুও এই লোটাস সেই লোটাস নয়, এক দিন যাকে মায়ের হাতে দা তুলে দিতে দেখে আমাদের সবার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল। মনে হল এই লোটাস দুনিয়া ধ্বংস করার অক্ষমতায় কাঁপছে।

"সে ... সে ... সে।" এ কথা বলে লোটাস জ্বলে উঠে। হতাশা ব্যক্ত করার মতো কোনও শব্দ সে খুঁজে পায় না। জানাশুনা কোনও গালি তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। কখনও সে আহত বাঘের মতো গোঙ্গায়। আবার কখনও পিঠে বাড়ি খাওয়া সাপের মতো ফুঁসে উঠে। আমার আশঙ্কা হয়, ক্ষিপ্ত হয়ে সে আমাকেই না মেরে বসে। আমি চাইছিলাম লোটাস শান্ত হোক। আমার আকুতি বুঝি লোটাস ধরতে পারে।

"ভয়ে, আধমরা অবস্থায়, গুমোট অন্ধকারে," লোটাস বলে। "আহা কী ব্যথা, রু। ওরা আমাকে কোনও দয়া করেনি। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না। চেনাজানা ডাকাতের হাতে সম্ভ্রম হারানোর চেয়ে অপমানজনক আর কিছু নেই। রু, আমি আর বলতে পারছি না। চোখের জলে চোখ জ্বলে যাচ্ছে।"

আমি নিজেও তা বুঝতে পারছিলাম। লোটাসের অশ্রু আমার বুকের উপর যেন ফুটন্ত পানি। আমার পরনের পাতলা জামা ভেদ করে ঢোকা অশ্রু। আমি বিহ্বল হয়ে কিছু সময় লোটাসকে ধরে রাখি। আর অপেক্ষা করি।

আগের বছরের বর্ষার এক অপরাহ্নে চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি এসেছিল। নাজিফ ছুটিতে ছিলেন। পিতা ছিলেন বাইরে। চার দিক এত অন্ধকার আর বৃষ্টি এত ঘন ছিল যে, মনে হয়েছিল, বৃষ্টি আর কোনও দিন থামবে না। অথচ আধঘন্টার মধ্যেই বৃষ্টি থামে; চারিদিক লাল করে রোদ ওঠে; খ্যাপাবুড়িকে হাতে নিয়ে পিতা ঘরে আসেন। সে-দিন আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে আমার জীবনে বড় একটা ক্ষতি এবং ছোট একটা লাভ হয়েছিল। ক্ষতি হল : আমি বিশ্বাস করেছিলাম, জীবনের যে কোনও অন্ধকার এক সময় কেটে

যায়। আর লাভ : আবহাওয়া সম্পর্কে আমার জ্ঞান। অবশ্য সেই অপরাহ্নের বৃষ্টিই আমার জীবনের সবচেয়ে ভারি বৃষ্টিপাত ছিল না। আমার জীবনের সব দুর্যোগ বৃষ্টিকে ঘিরে। সে যাই হোক। সেই অপরাহ্নের বৃষ্টির মতো এক সময় লোটাসের কান্না থামে। নিজের হাতে সে আমার চোখ মুখ মুছে দেয়, আর বলে :

"তুমি আমাকে কখনও ঘৃণা করবে না, তাই না, রুদেব?"

"কখনও না।"

"আমি জানতাম," লোটাস বলে।

মাঝে মাঝে শয়তান আমার উপর ভর করত। তখনও তা-ই হয়। আমি লোটাসকে প্রায় বলে ফেলি, আমাকে সে ওই 'বিশেষ বিষয়টি' বুঝিয়ে বলুক বা ওই সংক্রান্ত কিছু দেখাক। জীবনের ওই পর্যায়ে সেই 'বিশেষ জিনিস' সম্পর্কে আমার কৌতূহল চরমে উঠে। এর মধ্যে পিতার লাইব্রেরিতে পাওয়া চিত্রকর্মের বইতে অনেক উলঙ্গ নারী-পুরুষের ছবি দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বারবার পিতার লাইব্রেরিতে ঢুকি আর খুলে খুলে ছবিগুলি দেখি।

লোটাস বলে, ভিতরে চলো। আমি গরম হয়ে যাই। লোটাস নিজেকে সামলে নেয়। ভিতরে আমার ঘরে গিয়ে দু'টি টুলের উপর আমরা সামনাসামনি বসি। লোটাসের চাপে পড়ে আমি বসে থাকতে বাধ্য হই। লোটাস অনেক কথা বলে। সে-সব সাধারণ কথায় কোনও প্রাণ নাই। তার একশটি প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলি, তার সারমর্ম হল, আমি বাকি জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড লোটাস এর জন্য ব্যয় করব।

লোটাস শুনে খুশি হয়। "কেউ আমাকে এত সুন্দর কথা কখনও বলেনি," লোটাস বলে। "তবে একটা কথা, রু, কারও জন্য কারও জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড ব্যয় করা সম্ভব না, যদি না সে জীবনকে কেটে ছোট করা হয়।"

এরপর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। বেপরোয়া হয়ে লোটাসের চোখ দুইটি আমার কাছে কিছু একটা চায়। আমি বুঝি না আমি লোটাসকে কী দিতে পারি। তবুও লোটাস চেয়ে যায়। ওর চোখের তরল চুম্বক আমার কিশোর-মুখের মাংসপেশী টেনে ধরে। লোটাসের নিঃশ্বাসের গরম ভাপ আমার বুকে লাগে। লোটাসের চোখের অকরুণ আকর্ষণকে আমি ভয় পাই। আমি এক ভিন্ন লোটাসকে চিনতাম। এই লোটাস কেয়ামত আনবে, নিজে ধ্বংস হবে,

আমাকে ধ্বংস করবে। আর সত্য কথা বলতে কী আমার নিজের কৌতূহল থেকেই যায়।

"তবে আমার বাকি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি তোমাকে দেব, রুদেবিশ শেকাব," লোটাস বলে।

লোটাসের কথার ভারে আমার বুক বুঝি মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়বে। তারপরও মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কৌতূহল বার বার লাফ দিয়ে উঠে। লোটাস দাঁড়িয়ে আমার হাত টেনে ধরে। টুলটা পা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

"ঠিক বড়দের মতো।"

আর কি কিছু গোপন আছে? মনেতো হয় না। তবে লোটাস যা বলে তা আমাকে শঙ্কিত করে। আমার হাঁটু দু'টি একটু কেঁপেও উঠে। লোটাস বলে এটা নাকি তার কাছে জীবন-মরণের ব্যাপার। শুধু এভাবেই সে আমাকে তার বাকি জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড দিতে পারে।

"তা ছাড়া," সে বলে, "তুমি কি আমার কাছে সব সময় এটা চেয়ে আসনি?"

যদি সে দশ-পনেরো বছর পর এ কথা বলত, আমি লজ্জা পেতাম। কিন্তু ওই সময়ে আমার কাছে এর চেয়ে বড় প্রলোভনের আর কিছু ছিল না। তারপরও আমি সতর্ক হই। বুকে তুফান নিয়ে আমি কেয়ামতের আগের দিনগুলোর কথা স্মরণ করি। আমার কারণে পৃথিবীতে কেয়ামত চলে আসুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার সমস্যা হল আমি কেয়মতের মুখোমুখি হতে রাজি ছিলাম না। পাদ্রির মানা ছিল। শুধু হতভাগারা কেয়ামত প্রত্যক্ষ করে। আমি তা করতে চাইনি। লোটাসের দিকে চেয়ে দেখি। কেয়ামত নিয়ে তার কোনও ভয় নাই। অবশ্য আমরা দু'জন দুই ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ। আমাদের কেয়ামত ভিন্ন। মনে হল লোটাসের কেয়ামতটা বেশি সহনীয়। আরও কিছু জিনিস ভেবেছিলাম। শ্রোতাগণ, আমি আপনাদের সে-সব কথা খুলে বলতে চাই না। আমি জানি আমার না বলা কথাগুলোই আপনারা বেশি করে মনে রাখবেন। আর তখন আমার মনে ভয়। লোটাসের ভয় হারা। লোটাস দুই হাত দিয়ে আমার দুই গাল চেপে ধরে।

আমার গায়ে কাঁটা উঠে। আমি লোটাসকে বলি, দেখো, আমার কী অবস্থা। এর পর কি তোমার এখানেই থেমে যাওয়া উচিত নয়? লোটাস বলে, ত্বকের কাঁটা, এই উঠে, এই মিলিয়ে যায়। দরকার হল তোমার বুকে সাহস নিয়ে

আসা। আমার চোখের দিকে তাকাও। আমি তাকাই। আমি তাকানোর আগেই লোটাসের চোখ দু'টি মধুতে ভরে যায়। সে মধু লোটাস আমার উপর ঢেলে দেয়।

লোটাস আমার হাতের তালুতে তার হাতের তালু চেপে ধরে। "এটা এমন কিছু না। আমি তোমার জ্বর এনেছি। আমি তা সারিয়ে তুলব।"

৯

দু'টি বালিশ মাথার কাছে টেনে নিয়ে আমরা দু'জন বিছানায় শুয়ে পড়ি। আমি ঘামে ভিজে গেছি। আমার শীতল ত্বকে লোটাসের নিঃশ্বাসের ভাপ হুলের মতো লাগে। হাত পায়ের আঙ্গুল দিয়ে সে বিছানার চাদর খিঁচে ধরে। বুঝুন আমি তখন কোথায় অবস্থান করছি। লোটাসের চোখ দু'টি ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে যেখান দিয়ে একটা কালো কড়িকাঠ চলে গেছে। লোটাসের চোখ দিয়ে পানি ঝরে। লোটাস যেন ছাদের সাথে কথা বলে। আমি কান খাড়া করে শুনি।

"মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি মন্দিরে যাই। পাদ্রি তিন বার ভবিষ্যদ্বাণী করল কেয়ামত হবে। কেয়ামত হল না। তাই পাদ্রিকে আর কেউ বিশ্বাস করে না। তাই এখন আর মন্দিরেও কেউ যায় না। খালি মন্দির। মেঝেতে আগাছা উঠে ভরে গেছে। এক সময় যেখানে প্রার্থনা হত এখন সেখানে ডাকাতি হয়। ডাকাত আসে। ডাকাতির মাল চায়। আমি দিতে রাজি হই। রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। একটা স্বামী পাওয়ার জন্য আমি কী না দিতে পারি। তবে ঘৃণায় অন্ত্রের মধ্যে ঘা অনুভব করি। তবুও দিই। ব্যথা। ক্রোধ। রক্ত। দিই বা না দিই। সব নিয়ে যাচ্ছে। আরও ডাকাত আসে। একে একে। আমি জিজ্ঞেস করি, আমার বিয়ে হবে কি না। ডাকাতরা বলে, হবে। আমি বিশ্বাস করি না। তবুও দিই। দিই মানে জোর করে নেয়ার অপমানটুকু থেকে নিজেকে রক্ষা করি। সবার বাসনামোচন শেষ হয়। বিনি তারা বলে, তার অভিযান শেষ। আসলে আমি যেন এ কথা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তারপরও আমি

দাবি জানাই আমার তাকে বিয়ে করতে হবে। আমি বলি যা হয়ে গেছে আমি তা ভুলে যাব। আমি তাকে সুখী করব। সে যেন আমাকে বিয়ে করে। সে বলে শেষ বিচারের দিন দ্বিতীয় লাইনে দাঁড়ানোর মতো ধৈর্য আর মনোবল আমার দুই-ই আছে। যে মেয়ের তা নাই এমন একটা মেয়েকে সে রক্ষা করবে। যে আশায় সে আমার সাথে প্রেম করেছিল, তার চার বন্ধুর সাথে বাজি ধরে, সেই আশা তার পূরণ হয়েছে। সে চির বিদায়ের কথা বলে। আমি অবশ হয়ে যাই। তখন আকাশ থেকে এক দেবদূত নেমে আসে। আমার কোমর থেকে নিচের অংশে কোন অনুভূতি নাই। হাত ধরে সে আমাকে টেনে তোলে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। আমি বমি করে তারা জামা নষ্ট করি। আমার আর কিছু বাকি নাই। আজ কেউ আমাকে থামাতে পারবে না। তুমিও না, রুদেবিশ শেকাব। এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।"

দেবদূতের বিষয়টি আমার কাছে লোটাসের দৃষ্টিভ্রম বলে মনে হয়। লোটাস আমার মাথা তার বুকে চেপে ধরে। আমার জন্য ওটুকুনই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু লোটাসের জন্য তা ছিল না। দাঁড়া, বলে সে আঁচল খুলে একটা ছোট কৌটা বের করে। কৌটার দিকে মন দেয়ার মতো অবস্থা আমার ছিল না।

"পবিত্র পানি," কৌটাটি খুলতে খুলতে লোটাস বলে।

পবিত্র পানির কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে বাজ পড়ে। পবিত্র পানি দিয়ে কী হয় আমি তা জানি। আমার অবস্থা লোটাস বুঝতে চায় না। সে আমার ডান হাত টেনে নিয়ে কৌটাটা দিয়ে বলে, "আমার মুখে তুলে দাও।"

আমার হাত কাঁপে। কৌটাটা আমার হাত থেকে পড়ে যায়। লোটাস লাফ দিয়ে তা ধরে ফেলে। অনেকটা পানি মেঝেতে চলে যায়। তারপরও যা থাকে তা কাজ শেষ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। লোটাস আমার ডান হাত শক্ত করে ধরে। কৌটাটা আমার হাতে দিয়ে সে শুয়ে পড়ে, আর নৌকার মতো জিব বের করে। আমি কৌটাটা উপুড় করে তার মুখের উপর ধরি। এক ফোঁটা পানি তার জিবের উপর পড়ে। "আর দুই ফোঁটা," লোটাস বলে। আরও কয়েক ফোঁটা পানি আমি লোটাসের মুখে দিই।

আমাকে শুইয়ে দিয়ে একই ভাবে লোটাস আমার মুখে তিন ফোঁটা পানি দেয়। আমি তার মুখে স্বস্তি দেখতে পাই। কৌটাটা আঁচলে বেধে নিয়ে সে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে বাকি কাজ শেষ করে।

লোটাস বলে, "আমি এখন প্রথম কাতারে চলে এলাম।"

আমি উঠে বসি। লোটাস বালিশের উপর শুয়ে পড়ে। আমাকে সে তার পাশে কিছুক্ষণ পুরুষ-সঙ্গীর মতো শুয়ে থাকতে বলে।

আসলে তখন আমি আর শুতে পারি না। ছেলেমানুষি ঠিক আছে। কিন্তু লোটাস যা করে ফেলল। ব্যাপারটা বুঝতে বুঝতে দুনিয়া বুঝি দুই ভাগ হয়ে একভাগ আমার মাথার উপর পড়ে গেছে। আমি বুঝি আমি আর শিশু নই। লোটাস আমাকে জোর করে টেনে লম্বা করে ফেলেছে। আমার মধ্যে দায়িত্ববোধ মাথাছাড়া দিয়ে উঠে। আমি হাল না ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করি। পিতার সাথে বিষয়টা কীভাবে তুলব, তা ভাবি। কিছু একটা করার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠি। লোটাস বলে, "তোমাকে কিছু করতে হবে না। শুধু আমার পাশে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো।" লোটাসের মুখে অকরুণ হাসি। তার চোখমুখ আলোকিত। তার দুই গালে পানির দাগ। আমি তাকে গাল মুছতে বলি। সে তার ওড়ানার এক মাথা আমার হাতে দেয়। আমি তা লোটাসের দুই গালে চেপে ধরি। তার চোয়ালের মাঝের নরম পেশী আমার আঙ্গুলের নিচে কেঁপে উঠে।

"এবার আসল কাজ শুরু হবে," লোটাস বলে। সে বুঝায়, কীভাবে জীবনের নারীকে ভালবাসতে হয়। "আলিঙ্গন তার প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ, আচ্ছা, মুখে না বলে দেখিয়ে দিই।" গরম আর কুয়াশাঘন। তারপর আরও কঠিন, আরও অন্তরঙ্গ ধাপ। "তোমার কিছু করতে হবে না। সব আমি করব। তুমি হলে রাজা।"

আমাকে কিছু করতে হবে না। আমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি শুধু অবাক হই, কী করে সে এত কিছু জানে।

"বছরের পর বছর বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে শেখা," লোটাস বলে।

লোটাসের দেয়া জ্ঞান আমাকে আমার ভবিষ্যতের নারীদের পরাজিত করতে সাহায্য করে। পরবর্তী জীবনে, রক্তপ্রবাহের শক্তি দিয়ে লড়াই করা সেই যুদ্ধে আমি আর কখনও হারিনি আর প্রতিটি বিজয়ের মুহূর্তে আমি লোটাসকে স্মরণ করেছি।

"আমি এখন তোমার সেই কৌতূহল মিটাব," লোটাস বলে।

লোটাসের গাল দু'টি কাঁচা রক্তের মতো লাল। সারা পৃথিবীতে ছড়ানো আমার সব মনোযোগ লোটাসের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। "মন ভরে কৌতূহল নিবৃত্ত কর, রু," লোটাস বলে।

আমাকে খুশি করার জন্য তার ব্যাকুলতা। আমিও উদার হই। মানে

লোটাসের জন্য আমার জীবন, এই প্রতিজ্ঞা করে ফেলি। আমার মন থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। মনে হয়, আমি এ দায়িত্ব বইতে সক্ষম।

ব্লাউজ আর স্কার্টের নীচে লোটাস মসৃণ আর ফর্সা। তার কোমেরর নীচ এত ফর্সা যে, আমি কারণ জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারি না। আর এভাবে আমি প্রথমবারের মতো জানতে পারি, আমাদের মেয়েরা খানাখন্দে ভেসে থাকা শুক্রাণুর ভয়ে জলনিরোধক অন্তর্বাস পড়ে পানিতে নামত। লোটাস আমাকে আরও অনেক কিছু হাতে কলমে শিখায়। আমার এত দিন ধারণা ছিল, বাইশ বছর বয়সে জীবনে প্রথম নারী দেখব। পিতার লাইব্রেরিতে ঢুকে অনেক চিত্রকর্মের পুস্তক নাড়াচাড়া করেছি, আর আঙ্গুলের উপর গুনে আক্ষেপ করেছি, আমাকে প্রায় আরও নয় বছর অপেক্ষা করতে হবে। অথচ নয় বছর আগেই আমার সেই কৌতূহল মিটে যাচ্ছে। আনন্দের দোলা আমার মনে। কেন এত ভাল লাগছিল? বহু বছর পরে বহু বই পড়ে জেনেছি ওটা ছিল মূলত শুধু রক্ত প্রবাহের আনন্দ। তখন শক্তিশালি রক্তপ্রবাহ আমার সারা দেহে। মগজের কোষগুলি একে অন্যকে ধরে রাখে, যাতে ভেসে যেতে না হয়, কিন্তু তারা আনন্দ ছড়াতে থাকে প্রবল বেগে। যা আবার বিভিন্ন শক্তির রস উৎপাদন করে। আনন্দের রস। এমন আনন্দ যা অপব্যাবহার করলে পরমায়ু কমতে থাকে।

লোটাস প্রথমে আমাকে তার বুক দেখায়। "জারজ সন্তানেরা," আমি গালি দিই। ওই সময়ে কোন শব্দ আমার মুখে এসেছিল তা অবশ্য মনে নাই। তবে আমি ওই গালিটাই দিতে চেয়েছি যা শুনলে আমাদের পুরুষদের গায়ে বিছুটি উঠত। শুধু মাত্র শক্ত বক্ষবন্ধনী পরত বলে বিনি তারার বন্ধুদের চোখে লোটাসের স্বাস্থ্য ধরা পড়েনি। আমাকে ওই অবস্থায় রেখে লোটাস ওড়নার এক প্রান্ত খুলে আর একটা জিনিসি বার করে দেখায়। ওটা লোটাসের জন্য পাদ্রির দেয়া সনদ, যাতে লেখা, লোটাস তখনও বিবাহযোগ্য। সনদের সংকেতগুলোর মানে করে লোটাস আমাকে পড়ে শোনায়, দেহের উপরিভাগ এখনও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া থাকেনি।" আমার দু'হাত তার বুকে চেপে ধরে লোটাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আমার বয়স চব্বিশ। কী হাস্যকর পাদ্রির হিসাব।"

লোটাসের চোখ থেকে আমার হাতের পিঠে টপ টপ করে গরম পানির ফোঁটা পড়ে।

সে-দিন যা অনুভব করেছিলাম—বড় হয়ে জেনেছি—তার নাম কামনা;

তখন লোটাসের জন্য প্রার্থনা করে আমি বিবেকের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই দিন আমার কাছে কোনও কিছুই অসভ্য মনে হয়নি। আমি সব কিছু পুরোপুরি উপভোগ করি। লোটাস তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উন্মুক্ত দেয়। লোটাসের সেই আগ্রহ আমি কোনও দিন ভুলতে পারিনি। আহা, আমার জন্য তা জীবনের কৌতূহল—পানির পিপাসা আর ভাতের ক্ষুধার মতো—যা কখনও মিটবার নয়। ঘাসবনের মাঝে সজীব নদী, ভাপে ভেজা দুই পাড়। আমি জীবনের গভীরতর রূপ দেখি। লুকিয়ে-চুরিয়ে বা দুর্ঘটনা বশতও আগে যা কখনও দেখা হয়নি। লোটাস জিজ্ঞেস করে, কেন আমার চোখের মণি দু'টি বের হয়ে এসেছে।

"আমি জানতাম না ... এত নিচে, ঠিক ..."

"কিসের কাছে—?" লোটাস আমার মুখের কথা কেড়ে নেয়। আমাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে কানের মধ্যে আস্তে করে বলে, "এ দু'টি নেই বলে।"

সে দিন থেকে শরীরবিদ্যা, যুক্তি বিদ্যা, দর্শন শাস্ত্র এর কোনও কিছুই আমার এই ভুল ভাঙ্গাতে পারেনি যে আমার প্রাণের অবস্থান হল দুটি গোলাপি রঙের বিলাতি বেগুনের ভিতরে। এই ভুলটি ধারন করানোর জন্য আমি লোটাসের নিকট দুই কালেই কৃতজ্ঞ আছি। এই ভুলটির জন্য আমার মৃত্যুর সময় আমার কোনও কষ্ট হয়নি। আমার শত্রুরা আমাকে হৃৎপিণ্ডে আর মস্তিষ্কে আঘাত করে মেরেছে। আমার প্রাণের আধার দুটি অক্ষত থাকাতে আমি ভেবে নিয়েছি না মরেই আমি পরকালে চলে এসেছি। এখনও সেই একই বোধ কাজ করছে যখন আমি আপনাদেরকে আমার জীবনের কথা শোনাচ্ছি।

তারপর কী হল শুনুন। নদী গিয়ে মোহনায় পড়ে। সূর্য গিয়ে পশ্চিম দিগন্তে ঠেকে। অনেক পশু আর মানুষের জীবনে মৃত্যু নেমে আসে। দেরি করার সময় কোথায়? জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে লোটাসের জ্ঞান ছিল। তাই সে দ্রুত এগোয়, অথচ কোনও কিছু বাদ দেয় না। কিন্তু সময় কম। আর মোহনারও কোথাও না কোথাও-তো শেষ আছে। লোটাস আমাকে চূড়ান্ত রসের স্বাদ নিতে বলল। বাকি জীবন আমার মনে ছিল, কীভাবে সে তা মেলে ধরে আর কী ভাবে আমি তাতে ঝাঁপ দিই। ঘরের মধ্যে এমন আনন্দ থাকতে বাইরে যায় কে? কয় মিনিটের সময় মনে নেই। তবে আনন্দের কারণে এক একটা মুহূর্ত একশ বছরের বেশি ছিল। আরও দীর্ঘ ছিল উপসংহার। তারপর সব কিছু বুঝি অসীমে হারিয়ে যায়।

লোটাস বিশ্রাম নেয়। আমাকে আলিঙ্গন করে বলে, " আমি এতটা আশা করিনি, রু। কত সহজে সব হয়ে গেল।"

খালি গর্তে যে ভাবে প্রবল বেগে পানি ঢুকে সে ভাবে আমার মধ্যে সচেতনতা প্রবেশ করে। বাকি দুনিয়ার কথা আমাদের মনে আসে। লোটাস এসেছিল আমাদের বাড়ির রুটিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। আর ঈশ্বরও সে-দিন আমাদের সাহায্য করেছিলেন।

"আমাকে কখনও ভুলবে না, ঠিক আছে, রু?" যাওয়ার সময় লোটাস বলে যায়।

শুন্য ঘরে আমি গুটি মেরে পড়ে থাকি। সন্ধ্যার পর পিতা আর নাজিফ বাড়ি ফিরেন। নাজিফের হাতে খ্যাপাবুড়ি। আমাকে তাঁরা অন্ধকারে জড়োসড়ো অবস্থায় পান।

নাজিফ জানান, লোটাস বিষ খেয়েছে।

নাজিফের কথা শুনে আমি অবশ হয়ে যাই। ধারণা করি সে ভাবেই লোটাস মন্দিরের মধ্যে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। নাজিফের দেয়া তথ্য যেন ডাকিনির মন্ত্র। আমার দেহের কোথাও কোনও চেতনা নাই। শুধু কান ছাড়া, যেখানে বার বার বাজতে থাকে :

"আমাকে কখনও ভুলবে না, ঠিক আছে, রু?"

১০

জীবনের প্রথম নির্ঘুম রাতে আমি মৃত্যুর কথা ভাবি : আমার মৃত্যু, পিতার মৃত্যু, নাজিফের মৃত্যু, খ্যাপাবুড়ির মৃত্যু, এবং আরও অনেকের, যারা বেঁচে আছে, যারা মরে গেছে। সব চেয়ে বেশি ভাবি লোটাসের মৃত্যুর কথা। বার বার ভাবি, লোটাস মরবে না। বিষ খাওয়া অনেকের কথা আমার জানা ছিল। তাদের কেউ কেউ মারাও গেছে। কিন্তু বেশির ভাগ মরেনি। আমি দু'টি মেয়ে আর একটি ছেলের কথা স্মরণ করি। তারা বিষ খেয়েছিল সাহস দেখানোর জন্য, যাতে অনুমোদনহীন প্রেমের জন্য তাদের পিতামাতা তাদের মারধর না করে।

লোটাসের জন্য মনে খুব ভরসা পাচ্ছিলাম না। সে আমার জায়া। সে আমার জন্য বেঁচে থাকবে, বা আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে, এমনটাও ভাবতে পারছিলাম না। ভাবি লোটাসের জীবন এখন আমার বোঝা। চিন্তাক্লিষ্ট আমি ক্লেদাক্ত বিছানার উপর কয়েক ঘন্টা বাড়ি খাওয়া সাপের মতো মোচড়াতে থাকি। তারপর কুণ্ডলী হয়ে যাই। দেহ থেকে অঝোরে ঘাম বের হয়। হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। গায়ে কম্বল জড়ানোর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু উঠে গিয়ে দেরাজ থেকে কম্বল নামানোর সাহস পাই না। হতবুদ্ধি হয়ে আমি লোটাসের মৃত্যু কামনা করি।

ভোর বেলা সবার আগে উঠে বাইরে যাই। আমার সামনে ছাই রঙের পথ। পথের দুই ধারে ঘাস। আলো নাই বলে ওগুলো কালো মনে হয়। চারিদিকে কুয়াশা। হাঁটতে হাঁটতে লোটাসদের বাড়ির দিকে কান খাড়া করে রাখি। মানুষের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে দীর্ঘ কোনও কান্নার রোল নয়। তাতে আশ্বস্ত হতে পারি না। চাপা কোলাহল আমার বুকে ঝুলে থাকা ভারটাকে আরও শক্ত করে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছিলাম।

চোখের সামনে এ কী দেখি? আমি থমকে যাই। এক ছায়ামূর্তি। যার সহসা আবির্ভাব হয়েছে। সামনে ডান পাশে একটা জারুল গাছ ছিল। সে কী ওটা থেকে নেমেছে। না আকাশ থেকে। বুঝতে পারছিলাম না। আকাশ থেকে শয়তান বা দেবদূত নামতেই পারে। কারণ আমি এক গোপন যুদ্ধের নিভৃত সৈনিক। ভূতপ্রেত আমার সঙ্গে খেলা করবে এটাই স্বাভাবিক। অন্য সময় হলে পেছন ফিরে দৌড় দিতাম। খ্যাপাবুড়ির উল্টানো চোখের কথা মনে আসে। প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর আর ভয় পাই না। বরং মনে হয় নিঃসঙ্গতার কষ্ট থেকে মনকে সরিয়ে নেয়ার একটা সুযোগ এল। আসলে কারও সঙ্গ তখন আমার খুব দরকার ছিল। আগন্তুকের উপস্থিতি তাই সহায়ক মনে হয়। সে আমার চেয়ে লম্বা। আমি শুধু তার চোখ, নাক, আর ঠোঁট দেখতে পাই। তার মুখের বাকি অংশ বাদুরটুপিতে ঢাকা। তার মধ্যে কোন অস্থিরতা নাই। আর তাকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছুও মনে হচ্ছে না।

"আমি জানি, তুমি কেন বাইরে," আগন্তুক বলে।

ভূত বা মানুষ যা-ই সে হোক না কেন, ভেবেছিলাম তার সাথে দুই চারটা কথা বলে মন হালকা করব। আগন্তুকের কথা শুনে উল্টা আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। তার কথা আমার কাঁচা স্নায়ুতে আঘাত করেছে। সে কি গোয়েন্দা? তা হলেতো আমার সর্বনাশ। কিন্তু আমার অপরাধ তদন্ত করার জন্য সরকার

গোয়েন্দা পাঠাবে, তাও ভাবতে পারছিলাম না। গোয়েন্দা হলে তার বয়স আরও বেশি হত। আমি আর এক বার তাকে দেখি। তার বয়স বেশি নয়। আমার থেকে তিন বছর বেশি হতে পারে। টুপিটি মাথা থেকে খুলে সে আমার দিকে চেয়ে হাসে। মন চাইছিল তার চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিই।

"কে তুই, বেয়াদব?" আমি বলি। "আমি কেন আঁধারের মধ্যে ঘরের বাইরে তার তুই কী জানিস। আমি সকালের বাতাস আর সকালের সূর্য ভালবাসি। আমি স্বাস্থ্য সচেতন এক তরুণ। তাই আর্লি টু বেড এন্ড আর্লি টু রাইজ করি। আর তুই? তুই কি করিস? নিশ্চয়ই তুই চোর। আমাদের ঘরে বন্দুক আছে। এখনই আমাদের এলাকা থেকে বের হয়ে যা। না গেলে তোর খুলি উড়িয়ে দিব।"

"মঙ্গলবার বিকালে আমি তোমাদের গ্রামে প্রথম আসি," আগন্তুক বলে।

কী বলছে সে? আমি তার দিকে কান ঘুরিয়ে দিই। মঙ্গলবার বিকালে! মঙ্গলবার বিকালে। মঙ্গলবার বিকালে? কী সর্বনাশ। তার সাথে কথা বলতে হবে। অথচ আমি বেশি গরম হয়ে গিয়েছিলাম। কণ্ঠ নিচু করে বলি, "চুরিটুরি কর না তো?"

"তোমার যে রাগ কমল। এটা খুব ভাল কথা।"

"তোমাকে আর চোর মনে হচ্ছে না। তাই রাগ কমালাম।"

"কী মনে হচ্ছে?"

আমার মুখ ফসকে লোটাসের বলা শব্দটা প্রায় বের হয়ে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, "মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তুমি কি কাউকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলে?"

আগন্তুক মাথা নাড়ে।

আচ্ছাআআ! আমি এক মুহূর্ত মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করে ভাবি। লোটাস তা হলে একেই দেবতা কি দেবদূত বানিয়ে দিয়েছিল। যদিও সে কথা আমি তখন বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম বিনি তারার কোনও বন্ধুই লোটাসকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। এখন বুঝলাম, এই সেই হনুমান, যে মন্দিরে লোটাসের উপর অত্যাচার হতে দেখেছে।

সব কিছু মিলে যাচ্ছে। কোনও রহস্য বাকি থাকতে চায় না। আমি আর বিস্মিত না হয়ে দার্শনিক হতে শুরু করি। আপনাআপনি আমার মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে যায়। আমি বুঝি পৃথিবীর সব ঘটনা-দুর্ঘটনার একটা যোগসূত্র আছে। এ

জন্যই পাদ্রিরা কিছু করে খেতে পায়। মানুষ জ্যোতিষ আর দর্শনশাস্ত্রে বিশ্বাস করে। কিন্তু জ্ঞান আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে কি? আমার বুক কাঁপে। হাতও বোধ হয় কাঁপে। তা হলে আর কী কী দেখেছে সে? আমার মনে প্রশ্ন আসে।

কিন্তু তা সম্ভব বলে মনে হয় না। সে আমাদের এলাকার ছেলে নয়। গতকাল বিকালে সে নিশ্চয়ই তার এলাকায় ছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মন্দিরে সে কি দেখল না দেখল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। গত বিকালের কিছু না দেখলেই হল। না, গতকাল বিকালে সে কিছু দেখেনি। এটা হতে পারে না। এটা অসম্ভব। দুনিয়ার সব ঘটনা সে দেখবে, তা কী করে সম্ভব? দুনিয়ার সব ঘটনার যোগসূত্র থাকবে, তা কী করে হয়। শিশু আর প্রেমিক-প্রেমিকাদের লোক-লজ্জার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য হলেওতো কিছু ঘটনা মরে যাওয়া উচিত।

কিন্তু তা হয় না। যা মুছে যাওয়ার তা মুছে যায় না। যা মানুষ বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তা মরে যায়। যা আড়াল করতে চায় তা বাতাস এসে বের করে নিয়ে আসে। লজ্জার হাত থেকে জীবনে কেউ কোথাও রেহাই পায়নি। শিশুর প্রশ্রাবের উপর মা সব সময় আছাড় খেয়ে পড়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসার শত্রু দেখে ফেলে। শৌচাগারের দরজা বন্ধ করেও সুযোগসন্ধানী আর দেবদূতদের চোখ থেকে মানুষের উলঙ্গ দেহ নিস্তার পায় না।

"গতকাল বিকালে আমি তোমার জানালার পাশে ছিলাম," আগন্তুক বলে।

আমি লাফ দিয়ে উঠি। আমার স্নায়ুতে ধপাস করে মাটিতে বসে যাওয়ার চাপ। আমি কোনও ভাবে নিজেকে সামলাই।

আপনারা শুনেছেন। কত সহজ সে কথাটা বলল। কেন যে ঘর থেকে বের হতে গেলাম। ঘর থেকে বের হওয়া আমার বদ-অভ্যাস। তবে এই সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার আমার দরকার ছিল। অন্তত আমি সত্য জানতে পারলাম। আর ঘটনাটা যেহেতু আমার বিরুদ্ধে, তাই আমি তাকে বিশ্বাস করলাম।

তবে আরতো চুপ থাকা যায় না। অ্যাকশন, অ্যাকশন। কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। গ্রামের সবাইকে বলে বেড়ানোর আগে তাকে শেষ করে দিতে হবে। তার চেহারায় বিদ্বেষের ছাপ নাই, তবু আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না, আমার পাপের একজন সাক্ষী আছে। সে কি আর যে-সে পাপ? গুরুপাপ। যা কেয়ামতের দিন ঘনিয়ে আনে, যার শাস্তি হাজার

বছরের নরকবাস। তার চেয়েও বড় কথা তা জীবনে অনেক অপমান আর দুঃখ নিয়ে আসে। আমি মনে মনে বলি, এখন কোনও লজ্জায় পড়তে চাই না, যা হবার মৃত্যুর পরে হোক। ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করি, পিতার লাইব্রেরিতে গিয়ে চিত্রকর্মের বই খুলে উলঙ্গ নারী-পুরুষের ছবি আর দেখব না। আমাকে যেন তিনি লজ্জা থেকে রক্ষা করেন।

আসন্ন ব্যবস্থা হিসাবে আমি শত্রুকে খতম করতে চাই। শত্রুর অণ্ডকোষে আঘাত করে তাকে হত্যা করার কথা চিন্তা করি। তার পরনে ডাকাতদের মোটা কাপড়। হিসাব করে দেখি, তার দু'পায়ের মাঝে আমার লাথি উঠবে না, কারণ সে আমার চেয়ে লম্বা। ভাবি, বোয়াল মাছের ক্ষিপ্রতায় মাথা নিচু করে তার মুষ্কজোড়া ঠেসে ধরব। কিন্তু মোটা কাপড় পরে থাকায়, এভাবে আক্রমণ করে তাকে বেহুঁশ করতে পারব বলে মনে হল না। আর বেহুঁশ করতে না পারলে তাকে গলা টিপে খুন করা অসম্ভব ব্যাপার হবে। হা, ঈশ্বর। আমি ধরা পড়ে গেছি।

"কে তোর এ সব কথা বিশ্বাস করবে?" আমি চেঁচিয়ে উঠি। "আমার পিতা তোকে গুলি করবে। আমি ডাকলে এখনই গ্রামবাসি এসে তোকে ছিঁড়ে খাবে। যা। এখনই আমাদের গ্রাম থেকে বের হয়ে যা।"

চারিদিক অনেকটা ফর্সা হয়ে এসেছে। তাই আমি তার মিটিমিটি হাসি দেখতে পাই। লোটাসের দুই পায়ের মাঝে দাঁড়াতে পেরে আমি ভেবেছিলাম, আমি বড় হয়ে গেছি। আসলে আমি বড় হইনি। আমি যে কত বড় আহাম্মক রয়ে গেছি, তা এই আগন্তুক অবিচল থেকে প্রমাণ করে দিল।

"চলো, আমরা নদীর পাড়ে গিয়ে বসি," আগন্তুক বলে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই এটুকু কথাতেই আমি ঠাণ্ডা হয়ে যাই। আমি যতই খারাপ ব্যবহার করি না কেন, সে কিছুতেই উত্তেজিত হয় না। বরং সে বলে, "হাত বাড়িয়ে দাও।"

"কেন?" আমি উত্তর করি।

"তোমার হাত কাঁপছে, তাই।"

এ ভাবে সে আমাকে শান্ত করে। তখনও লোকজন বের হয়নি। আমরা হেঁটে গিয়ে বিনি তারাদের ছাউনিতে ঢুকি। ছাউনির ভিতর খড়ের গাদাগুলো শিশিরে ভেজা। আমরা মুখোমুখি বসি। অন্ধকারে আমার ভয়ভয় লাগে। আমি বলি, "এখানে অনেক মশা। চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি।"

সে বলে, "আমি বাইরেই বসতে চেয়েছিলাম। তোমার শীত করতে

পারে, তাই ভাবলাম ভিতরেই বসি।"

আমরা নদীর পাড়ে গিয়ে পানির কাছাকাছি বসি। আমার গায়ে শুধু একটা সোয়েটার ছিল। আমার একটা মাফলার এর দরকার ছিল। উত্তেজনার মধ্যে আমি শীতের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আর উত্তেজনার কারণে আমি শীত টের পাই না। আগন্তুক তার কথা বলে।

"আমি এক গরু চোর। তোমাদের গ্রাম থেকে আমি কিছু গরু চুরি করব।"

আমি ভেবেছিলাম সে বাতাস আর বৃক্ষের নিয়ন্ত্রক। এর থেকে নিচু মানের কিছু তাকে ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অথচ সে বলল সে একটা গরু চোর। আমি অবশ্য চোরটোর তেমন ভয় পেতাম না কারণ আমাদের বাড়িতে কখনও চুরি হত না। আর সে যে-ভাবে আমার হাত ধরে আমার হাতের কাঁপন বন্ধ করেছে তারপর আর তার থেকে আমার ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। সে আমাকে তার চুরির পরিকল্পনা খুলে বলে, আর আমার কাছে সাহায্য চায়। যদি সে আমার ঘরের জানালায় রাতে টোকা দেয়, আমি যেন দরজা খুলে তাকে ঘরে ঢুকতে দিই। আমার জানালাটা পরীক্ষা করার জন্য গতকাল বিকালে সে ওখানে গিয়েছিল।

"প্রতি গ্রামে আমার বন্ধু আছে," সে বলে। "তারা আমাকে পালাতে সাহায্য করে। তুমি আমাকে সাহায্য কর বা না কর, আমি কাউকে কিছু বলব না।"

আমি তাকে আশ্রয় দিতে রাজি হই। কীভাবে সে আমাদের বাড়ির দেয়াল বেয়ে উঠবে তা আর জিজ্ঞেস করি না। সে কাজ সে ইতিমধ্যে করেছে।

জীবনে কখনও কোনও ছেলের এত কাছে আগে আসতে পারিনি। আমার বুক হালকা হয়। হৃদয় উদ্বেল হয়। দেহের মধ্যে রক্ত যেন শান্ত স্রোত, যা আমাদের সামনের নদীটাতে আছে। ভাবি আমার একটা ভাই থাকলে কত না ভাল হত। আমরা কথা বলি। নদীতে একটা শুশক লাফ দেয়। শুশকটিকে দেখা যায় না। আমরা তার শব্দ শুনি। শীতকাল বলে নদীতে পানি কম ছিল। আমি আর গরু চোর আশঙ্কা করি, প্রাণিটা কোথাও ধরা পড়ে যাবে। আমাদের দু'জনের কারও জানা ছিল না, আমাদের মানুষরা শুশকের মাংস খায় কি না। প্রাণিটার প্রতি গরু চোরের করুণা আমার মন স্পর্শ করে।

দেখতে দেখতে সূর্য উঠে যায়। গরু চোর ছুটি চায়। তারপর আমতা আমতা করে বলে :

"সে দুই ঘন্টা আগে মারা গেছে।"

আমার শরীরে জোরে একটা ধাক্কা লাগে। আমি দুই হাত দিয়ে ঘাস আঁকড়ে ধরি, যাতে উল্টে না যাই। ভুলে গিয়েছিলাম, এই খবরের জন্যই আমি বাইরে এসেছিলাম। সারা রাত ভেবেছি, লোটাসের কী হবে। লোটাসের কী হবে? দিশাহারা হয়ে আমি তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম। কেন ইশ্বর আমার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, শুধু আমার প্রার্থনার কারণেই লোটাস মরে গেল। আমি অনুভব করি কী করে আমার বুকের পাঁজরগুলি শক্ত হয়ে যায়। যদি আমি লোটাস এর মৃত্যু কামনা না করতাম, তার দেহের বিষ-ক্রিয়া ভাল হয়ে যেত। বিনি তারা আর তার বন্ধুদের দেয়া আঘাত এক দিন মুছে যেত। লোটাস বেঁচে থাকত। আমার প্রার্থনা প্রবল ছিল, এ কথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে তা গ্রহণ করতে হবে? অপরাধবোধে আমার চোখে পানি আসে। দুই কাল পার করে আসা এই আমি আজ সাক্ষ্য দিতে পারি : সত্যিকার অপরাধবোধের চেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু নাই। আমি অসহায়ভাবে গরুচোরের দিকে ভেজা চোখে তাকিয়ে থাকি। সে দ্রুত চোখের আড়ালে চলে যায়।

বাড়ি ফিরে এসে আমি সারা দিন ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকি। বিকালে নাজিফ এসে আমাকে গর্ত থেকে বের করেন। আমার কাছে লোটাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা দেন। লোটাসের দেহ পুড়তে দেখে উপস্থিত সকলের চোখে পানি এসেছিল। লোটাসের পিতার মৃত্যুর পর লোটাস হল প্রথম শব, যা আমাদের দাহস্থানে দাহ করা হয়। লোটাসকে তার পিতার বেদিতে রেখে আগুন দেয়া হয়। নাজিফ বলেন, লোটাসের মুখ বাদামি হয়ে গিয়েছিল। লোটাসের মা লোটাসের চাচাদের বাজার থেকে কাফন কিনে আনতে বাধা দেয়। লোটাসের নিজ হাতে তৈরী করা একটা পোশাক লোটাসের মা তাকে পরিয়ে দেন। নাজিফ লোটাসের মাকে গালি দেন। "বুড়ি একটা পাথর, একটা পশু, তার ভাব দেখে মনে হয় সে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাচ্ছে।"

নাজিফের অনুভূতির প্রতি আমি সম্মান দেখাতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম তিনি মেয়েদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। আসলে তিনি তেমন কিছু জানতেন না। প্রভুর বিশ্বাসী চাকর হওয়া ছাড়া। লোটাস ছিল তার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে। আমি জানি লোটাসের মার কান্না শুরু হবে রাতে, যখন আর সকলে ঘুমিয়ে পড়বে।

১১

দুই দিনের মাথায় গরু চোর ধরা পড়ে। রাতের বেলা তাকে কোথায় রাখা হয়েছিল আমি দেখিনি। সকাল বেলা গ্রামবাসিকে দেখানোর জন্য তাকে গ্রামের প্রধান চত্বরে আনা হয়। গ্রামের মেয়রের নির্দেশে দুই জন চৌকিদার তাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটান। পিটান মানে পিটানোর ভান করেন। ডাকাত শ্রেণির লোক ছাড়া আমাদের দেশের অন্য মানুষরা কেউ কাউকে কঠিন আঘাত করতে পারতেন না।

স্থানীয় নিয়মে তদন্ত হয়। উদ্ধার করা ষাঁড়টিকে তারা চত্বরে একটা কাঠের পালায় বেঁধে রাখে। তার মালিক, লাল জামা পরা আর মিলিটারি গোঁপধারী এক নবীন কৃষক, কালো ষাঁড়টিকে দেখিয়ে ঘটনা খুলে বলেন, কীভাবে চোর তাড়া খেয়ে পশুটিকে রেখে চলে যায়।

চোর হাতেনাতে ধরা পড়েছে। তবুও কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, ধরা পড়া বালক সে কাজ করেছে। যে নবতিপর বৃদ্ধ খ্যাপাবুড়িকে আমাদের বাড়িতে রাখতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি বলেন, হতে পারে ছেলেটার মাথা খারাপ। তাই রাতের বেলা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করে। মাননীয় বৃদ্ধের মতে আসল চোর পালিয়ে যাওয়াতে সে ধরা পড়েছে।

বৃদ্ধ এখন আরও জবুথবু। তবে তাঁর গলার জোর আগের চেয়ে ধারালো। গ্রামের প্রতিটা বিবাদে তিনি হাজির থাকেন। তাঁর মতের অনেক দাম।

বৃদ্ধের সাথে অনেকে সহমত পোষন করেন। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলেন, অকুস্থলে নয়; ছেলেটা ধরা পড়েছে শেকাব ভিলায়। তাঁর ক্ষীণ গলা কেউ শুনতে পায় না। মেয়র গরু চোরকে বলেন, সে যদি তার সহযোগিদের নাম বলে, তাকে কোনও শাস্তি দেয়া হবে না, বরং তাকে রক্ষা করা হবে। মেয়রের জন্য এটা ছিল সুবর্ণ সুযোগ। মেয়র তাঁর প্রশাসনিক জীবনে প্রথম কাউকে সাজা দেয়ার সাহস পান। চৌকিদার দুইজন ছেলেটাকে সারা দিন মারেন। কী মার মেরেছে তা চৌকিদার দুজন ভাল বলতে পারবেন। ছেলেটা সারা দিন হাসাহাসি করেছে। হাসি ছাড়া কোনও বাড়ি সে গায়ে তোলেনি। বিরক্ত হয়ে এক সময় মেয়র তাকে ছেড়ে দেয়ার অজুহাত খোঁজেন।

"মান্যগন্য সবাইকে অন্তত বল্, কেন তুই চুরি করিস।"

গরু চোর মুখ খোলে।

তার নাম লৌহান দৌমত। চার গ্রাম পর তার বাড়ি। জমিদার বংশের সন্তান সে। তার পিতামহ একবার পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছে, সেখানে বরফের সুড়ঙ্গে তিনদিন বিবস্ত্র ঘুমিয়ে বাড়ি ফিরে। তার প্রপিতামহের উরুর মাংস মোমবাতির আগুনে পুড়ত না। তার বংশের সব পুরুষই কোনও না কোনও পৌরুষের স্বাক্ষর রেখে গেছে। প্রাচীনযুগে, তাদের যখন জমিদারি ছিল, বাড়িতে ডাকাত এলে, বাড়ির মহিলারাই তাদের ধরত ও খুন করত; পুরুষরা পালংকে বসে হাততালি দিত। এক সময় তাদের দুঃখের দিন শুরু হয়। আলস্যের কারণে পূর্বপুরুষরা জমিদারি হারায়। ছোট বোনের জন্মদানকালে তার মা মারা যায়। কিছু দিন পর তার বাবা মারা যায় পোষা সাপের কামড়ে। এরপর জায়গাজমি শত্রুর হাতে চলে যায়। ঘরে তার ছোট দু'টি বোন আছে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব তার। সে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। রোজগারের কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে, নিজ গ্রামের চতুর্দিকের পাঁচটি গ্রামের পাশের পাঁচটি গ্রামে গিয়ে পাঁচ জন কশাইয়ের সাথে সে কথা বলে। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কশাইদের সাথে বোঝাপড়া করে। তারপর দূরের গ্রামগুলোতে গিয়ে, প্রতি সপ্তায় সে একটি করে তাজা গরু চুরি করে। চুরি করা গরু খোলা মাঠে এনে সে ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করে। পূর্ণিমাতে চাঁদের আলো, অমাবস্যা বা মেঘান্ধকারে কুপির আলো ব্যবহার করে সে। জবাই করা পশুর দেহ থেকে সে ধর্মীয় রীতিতে মাংস কাটে। কাটা মাংস প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে কাঁধে করে নিয়ে কশাইদের কাছে বিক্রি করে। কশাইরা তা বাজারে নিয়ে বেচে। পকেট থেকে সে পলিথিনে মোড়ানো সাদা একটা পাউডার বের করে সবাইকে দেখায়। ওই পাউডার দিয়ে সে গরুগুলোকে বেহুঁশ করে। এ ছাড়া তার পক্ষে একা একা চোরাই গরু সামাল দেয়া সম্ভব নয়। চুরির রোজগারে তার সংসার চলে।

লৌহানের চেহারা আর গায়ের রঙ তার বংশের পরিচয়। বিখ্যাত ওই জমিদার পরিবারের কথা সবাই শুনেছেন বলে তথ্য দিতে থাকেন। লৌহান কথা শেষ করার পর মজলিসে এমন নিস্তব্ধতা যেন সবাই নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেছেন। সবাই লৌহানের কথা বিশ্বাস করেন। কয়েকজন মহিলাকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের পানি মুছতে দেখা যায়। এরপর ফিসফাস শুরু হয়। শুধু উপস্থিত

লোকজনই নয়, যার দূর থেকে এ গল্প শুনেছেন তারাও চত্বরের দিকে দৌড়াতে থাকেন। সবার মুখে একই কথা : লৌহানকে বাঁচাতে হবে। মোট কথা সারা গ্রাম তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসে। আগে যাদের গরু চুরি গেছে, তারা সকলে মেয়রকে এসে অনুরোধ করে, লৌহানকে মুক্তি দিতে। আর যাঁর গরু সে পূর্বরাতে ঘর থেকে বের করেছিল, সেই নবীন কৃষক ঘোষণা করেন, লৌহানের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ নাই। কে তার গরু ঘর থেকে টেনে বের করেছে, তা তিনি নিজ চোখে দেখেনিন। অন্য কেউ যদি দেখেও থাকে, তার কথার কী দাম? গরু ঘর থেকে বের হয়েছে তাঁর। এখানে শুধু তাঁর কথার দাম। তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর গোয়ালে অনেক ষাঁড়। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় লৌহানের মতো এক দুধের শিশুকে বিপদগ্রস্ত করা।

মাননীয় মেয়র শেষ বিকেলে লৌহানের মুক্তি ঘোষণা করেন।

সে-দিন সারা বেলা পিতা তাঁর লাইব্রেরিতে দরজা বন্ধ করে পড়াশোনা করেন। খ্যাপাবুড়ি পুরো বিষয়টা দেখেন। নাজিফ পিতাকে চোরের খবর দিতে এলে তিনি নাজিফকে মারতে যান। তখন জানতাম পিতা ওইরকম ছিলেন। কোনও কিছু তাঁকে বিচলিত করত না। আর আজ, দুই পৃথিবীর জ্ঞান নিয়ে আমি জানি, ওই গরু চোর আমার পিতার প্রেমের ফসল। সে কথা এখানে নয়। অন্য কোনও খানে। লৌহান আমার অবৈধ ভাই। তাই বুঝি তাকে অত ভালবেসেছিলাম।

সে-দিন, যখন জানতাম না লৌহান সত্যি সত্যি আমার ভাই, সবচেয়ে বেশি খারাপ লেগেছিল আমার। রাতে আমি জানালায় টোকার শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু দরজা খুলে লৌহানকে ঘরে ঢোকানোর সাহস পাইনি। বরং আমি কম্বল দিয়ে চোখ ঢেকে দম বন্ধ করে শুয়ে থাকি। নাজিফ লৌহানকে জনতার হাতে তুলে দেন, যার জন্য পিতার হাতে তাঁকে কড়া একটা চড় খেতে হয়। লৌহানকে যখন চৌকিদাররা হেনস্তা করছিল, তখন আমার ভয় হচ্ছিল, লৌহান না আবার লোটাসের কথা তাঁদের বলে দেয়।

তাই লৌহানের মুক্তি হলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। রাতে লৌহানের জন্য ভালবাসা অনুভব করি। ইচ্ছে করছিল, আমি তার সাথে যাই, গ্রামে গ্রামে ঘুরি, আর রাতের বেলা গরু চুরি করি। যে-সব দেশীয় ও বিদেশি ডাকাত ধনীদের বাড়িতে ডাকাতি করে গরিবদের সাহায্য করত, তাদের কাহিনী পড়েছিলাম। আমার ইচ্ছে করছিল লৌহানের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে এমন একটা ডাকাত দল

গড়ে তুলি। লৌহান হবে রবিনসন ক্রুসো, আমি হব তার বিশ্বস্ত ফ্রাইডে।

শেষ রাতে লোটাসের কথা মনে আসে। মনে মনে আমি আর লৌহান বিনি তারা আর তার বন্ধুদের খতম করি। লৌহান গুলি করে তিন জনকে। আমি এক জনকে। বিনি তারা পালিয়ে যায়। বিনি তারাকে ধ্বংস করতে না পারাতে আমার আক্ষেপ থেকে যায়। লোটাসের জন্য আমার চোখের জল গড়ায়। জগতের কাছে লোটাস মৃত ছিল। আমার কাছে নয়। পাখা মেলা বিশাল এক প্রজাপতির মতো ফ্ল্যাপফ্ল্যাপ করে সে আমার বুকের মধ্যে উড়ে বেড়ায়। আমি তার কথা ভাবি, আর আমার সারা দেহে শিহরন ছড়িয়ে পড়ে। সে রাতে বুঝেছিলাম সবার উপরে পাপ সত্য তাহার উপর নাই। আমার কল্পনা বাধ মানে না। আমি ভাবি লৌহানের দুইটি বোন আছে। বৃষ্টির সময় বা রাতের বেলা, ঘরের দরজা যখন বন্ধ। কত খারাপ বিষয় যে মনে আসে। শাস্তি নিশ্চিত জেনেও মনে হয়, আমি আর কখনওই কামনা থেকে বিরত থাকতে পারব না। পিতার লাইব্রেরিতে ঢুকে চিত্রকর্মের বই খুলে দেখতে চাই, কিন্তু সাহস হয় না। ভাবি, কবে আমি একজন নারী পাব। খ্যাপাবুড়িকে আমি ঘৃণা করি। আমি লোটাসের মতো কাউকে চাই। আহা লোটাসকে যদি বাঁচানো যেত। সে থাকলে জীবনে আর কখনও নারীর অভাব হত না। সে একাই কত নারী। কত দুধ। কত মধু।

১২

শীতকালে আমাদের স্কুলগুলো এক মাস বন্ধ থাকত। ওই বছরের বন্ধটা আমি লোটাস আর গরু চোরের কথা ভেবে কাটাই। যখন স্কুল খোলে তখন গরু চোর অনেক দূরে, রাজধানীতে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য পিতা আমাকে যেখানে পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছেন। গরু চোর চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে দারোয়ানের চাকরি পেয়েছে। মেয়রের অনুরোধে আমাদের মেয়রের চাচাতো ভাই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গজলে টেন্ডন তাকে সেখানে নিয়ে গেছেন। স্কুলের প্রথম দিন বার্ষিক পরীক্ষার ফল হাতে পাই। ওটা ছিল হাইস্কুল জীবনের

প্রথম ফল। সে ফল এত ভাল হয় যে, আশপাশের লোকজন আমার চেহারা দেখতে আসে।

আপনারা জানেন ইহকালে আমার এক মাত্র চাওয়া ছিল নারীর প্রেম। এর সাথে দু'টি সহকারি চাওয়া আপনাআপনি যুক্ত হয়ে যায়। একটা হল রাগমোচন, অন্যটা ঘোরাঘুরি। নারীর প্রেম আমি ইহকালে পাইনি। বাকি দু'টি আমি এত পেয়েছি যে তার তুলনা করা মুশকিল। ইহকালের তেত্রিশ বছরের জীবনে আমি যত বার শীর্ষসুখ ভোগ করেছি তা সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোনও নারী বা পুরুষের ভাগ্যে কখনও জুটবে না। আর ঘোরাঘুরি। বলতে পারেন আপনাদের পৃথিবীর সব অঞ্চলে তা করেছি। স্থল ও ও জলের যেটুকু ইহকালে ভ্রমণ করতে পারিনি পরকালে এসে তার প্রতি ইঞ্চিতে গড়াগড়ি খেয়েছি।

মাধ্যমিক স্কুলে পাড়ি দেয়ার পর আমার আসল ঘোরাঘুরি শুরু হয়। আমি নতুন নতুন সবুজ ভূমি, শস্য ক্ষেত আর লোকালয়ে চলে যাই। তন্ময় হয়ে নদী দেখি, নদী থেকে বের হয়ে যাওয়া খালগুলি দেখি, যেখানে ছোট মাছ লাফ দেয়, বড় মাছ ভাসে। অনেকে আবার দলে দলে খাবি খায়। গোধূলি লগনে মাছের মাথার দশ হাত উপর মশার ঝাঁক। এসব দেখে সূর্য ডোবার আগে বাড়ি ফিরি। স্কুলের একজন শিক্ষক পড়াতে আসেন। পিতা তাঁকে মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে ডেকে নিয়ে আমার পড়াশোনার খবর জিজ্ঞেস করেন।

পিতার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কথা আগেই বলেছি। আমার জীবনে বইয়ের সাথে আমার পরিচয় সবার আগে। পিতার অনেক বই ছিল। বেশিরভাগ এমন এক ভাষায় লেখা যার নাম ছিল ইংরেজি, যা আমার সময়ে দুনিয়ার প্রধান ভাষা হয়ে যায়। কিছু বই ছিল ভারী; কিছু আমি পড়তে চেষ্টা করতাম। কিছু শুধু নাড়াচাড়া করতাম। মানচিত্র আর ছবির বইগুলো বেশি দেখতাম। আর চিত্রকর্মের বই। ওই বইগুলিতে জীবনে প্রথম যখন নগ্ন নারী-পুরুষের ছবি দেখি তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার জানা ছিল না, ওই সব চিত্রশিল্পীর পাদ্রিরা তাঁদেরকে নগ্ন শিল্পকর্ম সৃষ্টির জন্য তলোয়ার নিয়ে তাড়া করতেন না। কী না এঁকেছে তারা? শজারুর কাঁটার মতো ঝাড়ের মাঝে লোহার ডান্ডার মতো কঠিন ধ্বজ। বাদামি চুল, পাতলা কোমর, ছোট কুচ, আর লম্বা বৃন্তের নারী। বই খুলে আমি বার বার তাদের কোমল অঙ্গরুহ দেখি। সে-সব দিনে এরা আমার প্রিয় নারী ছিল না, যদিও এদের মতো একজন ভবিষ্যতে আমার প্রিয় নারী হবে। ওই সময়ে আমার প্রিয় নারীটির ছিল দুঃখে

ভরা মুখ, শিথিল বুক, সুগোল পেট, আর সুডৌল বাহু। আমার ক্ষোভ হত, কেন সে তার ভারী উরু দুটো একটার উপর একটা চেপে রেখেছে। এ-সব ছবি দেখে পিতার গ্রন্থাগার থেকে বের হয়ে আমি দৌড়ে গিয়ে লোটাসকে হুমকি দিতাম, আমাকে নরনারীর গোমর খুলে না বললে আমি তার গোপন কথা ফাঁস করে দিব।

এক সারিতে একটা লম্বা টিনের ঘর, একটা ছোট দ্বিতল ইটের ভবন, আর একটা একতলা পাকা বাড়ি নিয়ে ছিল আমাদের ইস্কুল। দোতলা বাড়িটা মাঝখানে ছিল। একতলা পাকা বাড়িটা কমনরুম হিসাবে ব্যবহার হত। আমাদের তখন ক্লাশ হত দোতলায়, যেখানে সারা বছর কাঁঠালচাপা আর প্রশ্রাবের গন্ধ ঘুরে বেড়াত। একটা ক্লাশ শেষ হলেই আমরা বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম। টিনের ঘর এবং দোতলা বাড়িটার মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল। ঘন্টা বাজার পর মেয়েরা শিক্ষকের সাথে তাদের কমনরুমে চলে যেত। দু'টি ঘন্টার মধ্যে দশ মিনিট বিরতি ছিল। ওই সময়ে উপর থেকে দাঁড়িয়ে আমরা ছেলেরা মেয়েদের চলা দেখতাম, গোপনে ও প্রকাশ্যে নানান অঙ্গভঙ্গি আর হাসি-ঠাট্টা করতাম, আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে সাহসী মেয়েদের চোখ মারার জবাব দিতাম।

মাছরাঙা যেমন করে নদীর এ পাড় থেকে এক উড়াতে ওই পাড়ে গিয়ে বসে তেমন করে হাইস্কুলের প্রথম তিন বছর পার করি। একদিন আমি একটা ক্লাস শেষে রেলিং ধরে সামনের খোলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছি। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। শীতকাল শেষ হলেও বৃষ্টির কারণে শীত ছিল। ছেলেরা দেশি উলের মোটা জামা, আর মেয়েরা কেউ কেউ শাল পরে এসেছে। পরবর্তী ক্লাসের ঘণ্টা বেজেছে। টিনের ঘরে যে তিনটা ক্লাশ বসত, তাদের একটার মেয়েরা এর মধ্যে শ্রেণিকক্ষে চলে গেছে। আমাদের ছিল ধর্মশিক্ষার ক্লাস। ধর্মশিক্ষক উপাসনালয়ে যেতেন বলে ক্লাসে আসতে তাঁর দেরি হত। আমাদের ক্লাসের ছেলেরা এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছিল। আমি একাকি মেয়েদের যাতায়ত দেখছিলাম। এ সময় সপ্তম শ্রেণির মেয়েরা শিক্ষকের সাথে ক্লাশে যায়। বৃষ্টির পানি জমে যাওয়াতে তারা লাফ দিয়ে খোলা জায়গাটা পার হয়। আমি উপর থেকে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখি। এক সময় মেয়েদের চলা বন্ধ হয়। আমি ইস্কুল ঘরের পেছনের আম গাছগুলো বেয়ে বৃষ্টির পানির পতন দেখছিলাম।

নীচের খোলা জায়গাটা থেকে একটা আওয়াজ পাই। ভাবি, দারোয়ান-টারোয়ান কেউ পড়ে গেছে। দারোয়ান বা দপ্তরির আছাড় খাওয়া দেখার মধ্যে কোনও আনন্দ নাই। এমনিতেই তাদের জীবনে অনেক দুঃখ। ভাত-কাপড় যোগাড় করতে গিয়ে তারা হিমশিম খায়। গোসল করারও সময় পায় না। আর পুকুরের নোংরা পানি দিয়ে গোসল করলেই বা কী? তাতে শুধু চামড়ার উপর গাদের আস্তরণ মোটা হয়। পিচ্ছিল রাস্তার উপর গরিব-দুঃখীর আছাড় আমি দেখতে চাই না। তবে বড়লোক কেউ হলে ঠিক আছে। এক বার আমাদের ইংরেজির শিক্ষকের আছাড় খাওয়া দেখেছিলাম। নাদুস-নুদুস ভদ্রলোক। শত শত পুরুষ ধরে বয়ে যাওয়া শরীরের আর্য-রক্ত ধরে রেখেছেন। উপযুক্ত নারী না পেয়ে স্যার বিয়ে করেননি। আছাড় খেয়ে স্যারের লুঙ্গি মাথায় উঠে এসে চোখমুখ ঢেকে দিয়েছিল। আর তার পা দু'টি ওই ভাবে ঠেস না দিয়ে রাখলে বুঝি আকাশ ভেঙ্গে মাটিতে পড়বে। লাল জোড়া টম্যাটোর মতো মুষ্কথলিটা স্যারের নাভির উপর উঠে বসে আছে। তবুও স্যারের চেতনা নাই। তবে শেষ পর্যন্ত সেই দৃশ্য আমার ভাল লাগেনি। পতিত শাসকের ফাঁসিতে ঝোলা দেখতে কার ভাল লাগে?

তাকাব না, তাকাব না বলে এত কিছু ভাবার পরও, শেষ পর্যন্ত খোলা জায়গাটার দিকে না তাকিয়ে পারি না। আসলে জীবনে আমি কিছুই না করে পারিনি। যে-দিন উপবাস করব বলে ঠিক করেছি, সে-দিন এক সপ্তাহের খাবার গিলেছি। আর যে দিন পেট পুরে খাব বলে ঘটা করে একশত তরকারি রান্না করিয়েছি সে দিন রুচি হারিয়েছি। মেয়েটির দশা স্যারের চেয়ে মোটেও ভাল নয়। শুধু তার পা দু'টি আকাশ ঠেস না দিয়ে মাটিতে প্রতিষ্ঠিত, আর তার জামাটা কোলের উপর। তার সাদা উরুর দ্যুতি বেলা এগারোটার বৃষ্টিতে চারিদিকে রঙধনুর সৃষ্টি করেছে। তার সামনের যে কয়টা দাঁত দেখা যাচ্ছিল সবগুলিকে হিরার টুকরা মনে হয়েছিল। সে পড়েছিল খানিকটা বামদিকে বেঁকে, চিত হয়ে। আমি তার ডান দিক থেকে তাকে দেখছিলাম।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। আমি একটু আড়ালে সরে আসি যাতে সে আমাকে দেখতে না পায়। ছিটকে পড়া খাতাগুলো খুঁজে নিয়ে সে এ-দিক ও-দিক তাকায়। আর এ-সময় আমার সাথে তার চোখাচোখি হয়।

তার নাম রুনিতা। আমরা মনে করতাম, সে শুধু আমাদের স্কুলেরই নয়, সারা দেশের, এমন কি সারা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। রুনিতা তার

ছোট বোনকে নিয়ে স্কুলে আসত। ছোট বোনটিও এত সুন্দরী ছিল যে, তাকে পাওয়ার জন্য যে কেউ গৃহযুদ্ধ বাধাতে পারত। রুনিতার উকিল পিতা রাজধানীতে বাস করত, আর সেখান থেকে তাদের দুই বোনের জন্য আধুনিক পোশাক কিনে পাঠাত। রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে সে-সব পোশাক পরে তারা দুই বোন স্কুলে আসত। পরিবারের প্রভাবের কারণে পাদ্রিরা তাদের নিয়ে বেশি কথা বলার সাহস পেত না।

সে দিন রুনিতার আছাড় খাওয়ার ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। সারা দিন মনে হতে থাকে, রুনিতা শীত, ভেজা শাল, আর বন্ধুদের টিটকারিতে কষ্ট পাচ্ছে। তার মুখের লজ্জা ভুলতে পারি না। তার খোলা উরু দু'টি আমার উপর চিরস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে। এতটাই যে জীবনের অনেক শোচনীয় মুহূর্তে কল্পনায় নারীর কুসুম-কোমল দু'টি উরুর পৃষ্ঠ দেখে আশু আত্মহত্যার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি। সে দিন রুনিতার পড়ে যাওয়া, আমার সাথে তার চোখের মিলন, তার লাল মুখ, সব কিছু মিলে ওটা ছিল আমার জীবনে প্রথম রোমাঞ্চের অনুভূতি। এর সাথে লোটাসের সাথে আমার সম্পর্কের তুলনা করে লাভ নাই। লোটাসের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল অকালিক। রুনিতা নারীর সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে দেয়। আমি বুঝতে পারি, এখন থেকে আর যাকে তাকে আমার ভাল লাগবে না। বুঝতে পারি, পিতার "রেনেঁসাযুগের বিখ্যাত শিল্পকর্ম" বইতে দেখা বাদামী চুল আর লম্বা উরুর নারীগুলোই আসল সুন্দরী, অন্যরা নয়।

এর মধ্যে আমার অভিজ্ঞতার সাথে তাত্ত্বিক জ্ঞান যোগ হয়েছে। উপন্যাস পড়ে আমি নারীর ভালবাসা, অনুরাগ আর করুণা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি। নারীদেহের কোথায় দুধ, কোথায় মধু আর কোথায় আনারসের স্বাদ, তা-ও জানা হয়ে যায়। এর সব কিছু আমি রুনিতার মধ্যে দেখতে পাই। আমি আগের নারীদের ভুলে যাই। নারী নিয়ে আমার সেই যে যৌবনরসে ভরপুর কল্পনার শুরু, তা আর কখনও থামেনি। সেই তৃষাতুর কল্পনার নিরবচ্ছিন্নতা আর তীব্রতা এত পরিশ্রমের, অথচ এত অক্লান্তিকর যে, পিতামাতার সামনে ডাক্তারকে যেমন সন্তানের পক্ষে মেহ-রোগের কথা খুলে বলা সম্ভব নয়, আমার পক্ষেও তেমনি সম্ভব ছিল না, সেই কল্পনার কথা কারও কাছে ইহকালে খুলে বলা। জীবনে আর কোনও পুরুষকে স্বপ্নের নারীকে নিয়ে এত কল্পনা করতে দেখিনি। সারা জীবন সব কিছুর পাশাপাশি কোনও-না-কোনও নারীর

কল্পনায় আমি ব্যস্ত ছিলাম। ঘুমের মধ্যেও আমি তাদের কল্পনা করে গেছি। প্রথম প্রথম যা ছিল শুধু স্বপ্ন-সুখ, এক সময় তা নিদারুণ অনিদ্রারোগে পরিণত হয়। বহু বছর পরে, এই একই কল্পনার ভারে এত ক্লান্ত হই যে, বিকালের পর বিকাল নিজের দুর্বলতার জন্য নিজেকে করুণা করে আমি তখন অনেক কাঁদি। তারপরও নারীর কল্পনা থেকে কখনও নিস্তার পাইনি। ক্ষোভে-যাতনায় অনেক বার মনে হয়েছে আহা আমি যদি গলা টিপে পৃথিবীর সব নারীকে হত্যা করতে পারতাম। দৈব দুর্বিপাকে যদি পৃথিবীর সব নারী মরে যেত। ওদের একটাও যদি সে পৃথিবীতে আর জীবিত না থাকত, তবেই কেবল আমি আমার দেহকে বার বার কামড়ে ধরা কামনার বিষের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতাম।

আমি রুনিতাকে নিয়ে দিবা-স্বপ্ন দেখা শুরু করি। মনে করতাম, মেয়েদের কথা ভাবার বয়স আমার তখনও হয়নি। কিন্তু রুনিতার চিন্তা মাথা থেকে কিছুতেই নামাতে পারছিলাম না। রাতে শুয়ে তার মুখ কল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি, আর ঘুমের মধ্যে সে মুখ স্বপ্নে দেখি, কী যে সে মুখ, আয়নার মতো চকচকে, যে মুখ দেখে বুক শীতল হয়, সবুজ ধান ক্ষেত মনে হয় স্বর্গের উদ্যান। সে মুখ দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠি। স্কুলে যতটা সময় পারি, তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সুযোগের একটা সেকেন্ডও নষ্ট করি না। রুনিতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্য মেয়েদের সাথে গল্প করে; আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখি। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখি। সে ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে আসে, নদীর স্রোতে ভেসে যায়। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের পিঠে সে একা বসে থাকে। কখনও উঁচু স্বরে গান গেয়ে পেছনে তাকাই, রুনিতা হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমাকে "রেনেঁসাযুগের বিখ্যাত চিত্রকর্ম" বইতে আঁকা মেয়েদের পদমূলের রূপ খুলে দেখায়। আর পৃথিবী বড় সুগন্ধময় মনে হয়।

সে-বছর রুনিতাদের ক্লাশের একটি মেয়ে আমাকে একটা প্রেমপত্র লেখে। ওটা ছিল আমার জীবনে পাওয়া একমাত্র প্রেমের চিঠি। অথচ তা আমি ঠিকমতো পড়তেও ভয় পাই। যে অল্প কয়টা ছেলেমেয়েকে লেখাপড়ায় ভাল করে এক সময়ে রাষ্ট্রের অর্থ চুরি করার সুযোগ পাবে বলে শিক্ষকরা ধরে নিতেন আমি ছিলাম তাদের সবার উপরে। আর ছিলাম প্রধান শিক্ষকের প্রিয় ছাত্র। প্রতি বছর বৃত্তি পেতাম। চারিদিকে আমার শুধু সুনাম। আমি আড্ডা মারি না। মেয়েদের উত্ত্যক্ত করি না। আমি এক আদর্শ

তরুণ। নাস্তিক পিতার আস্তিক সন্তান। আরও কত কী? ভয় হয়, প্রেমের বদনাম হলে আমার সব সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে।

ওই মেয়েটির নাম ছিল রোজা। চিঠি পাঠানোর কয়েক দিন আগে সে রুনিতাকে আক্রমণ করে। তাদের চুলাচুলি শেষ হওয়ার পর রোজার দাঁত থেকে রক্ত বের হয়। রুনিতা তার চুলের গোড়া ধরে চেঁচিয়ে কাঁদে। রোজা চিঠিতে জানায়, আমি সারা দিন রুনিতার দিকে তাকিয়ে থাকি, তা সে সহ্য করতে পারে না। আমার দোষে সে রুনিতাকে মেরেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সে রুনিতাকে খুন করবে। রুনিতার মৃত্যু ঠেকাতে চাইলে আমি যেন তার দিকে আর না তাকাই। চার পৃষ্ঠার সে চিঠিতে সংক্ষেপে ভালবাসার সব কথা, এমনকি আমাদের কতজন সন্তান হবে, সব লেখা ছিল। রোজা দাবি করে, রুনিতা একটা ছেনাল, আর সে ছিল প্রকৃত নারী।

রোজাকে আমি আগে কখনও খেয়ালই করিনি। চিঠিটা পেয়ে আমার খুব গর্ব হয়। পরামর্শের জন্য আমি স্থানীয় এক রাজনীতিকের কাছে যাই, যিনি পিতার লাইব্রেরি থেকে বই ধার করতেন। জনাব রাজনীতিক বলেন, এটা প্রেম নয়, অপরিণত যৌবনের ধাক্কা, যা কেটে উঠা জরুরি। আমার রোজার প্রস্তাবে রাজি হওয়া ঠিক হবে না। সময়োচিত প্রেমের ব্যাপারে তিনি আমাকে ধারণা দেন। আমি তাঁর সাথে একমত হই। রুনিতাও যদি আমাকে সে চিঠি লিখত, আমি একই কাজ করতাম। রোজার জন্য আমার মায়া হয়। আমি একটা কাগজে তাকে লিখে পাঠাই, "রোজা, আমরা দু'জনেই ছোট। তোমার আরও বড় হয়ে প্রেম করা উচিত।"

কয়েক দিন পর রোজা একটা ছোট ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে আসে, আর বলে, সে নয়, প্রত্যাখ্যানের ফলে আমিই ঠকেছি। ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে সে শপথ করে, আমি যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব, তখন সে বড় এক উকিল হয়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবে, রাজনীতিতে যোগ দিয়ে রাস্তায় মিছিলের নেতৃত্ব দিবে, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হয়ে সে আমাকে দেখিয়ে দিবে। "যা, এখন থেকে যে মাগিকে মন চায় তাকে তোর চোখ দিয়ে উলঙ্গ কর্।" এ কথা বলে রোজা চলে যায়। আসলে আমরা বাচ্চারা তখন অল্প বয়সে পরিণত হয়ে যেতাম। সে জন্য রোজা এমন শক্ত কথা বলতে পারল।

ব্যর্থ প্রেমের কষ্ট রোজা কীভাবে সামলে উঠেছে, আমি জানি না। জীবনে আমি কখনও তা সামলে উঠতে পারিনি।

এক দিন রুনিতা হাত ধরে আমাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে স্কুলের একটা খালি ঘরে ঢুকায়। ঘরের কোনায় নিয়ে সে এমনভাবে দাঁড়ায়, আমার বের হওয়ার জায়গা থাকে না। আমি ভাবি, সর্বনাশ। রুনিতার মাথায় ভূত চেপেছে। অবশ্য আমার ভালর জন্যই চেপেছে। তবে ধরা পড়লে জেল-জরিমানা হয়ে যাবে। তাতে কী? নিজেকে বলি, আমি প্রস্তুত। লোটাসের কথা মনে আসে। যে আমি রোজার চিঠিটাকে জাতীয় ইস্যু করেছিলাম, সে আমি গভীর শ্বাস টেনে সুগন্ধ গ্রহণ করি। আহা কী আনন্দ। খোলো খোলো দ্বার। রাখিও না আর। এ কোনায় আমায় দাঁড়ায়ে। রুনিতা আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। কী লজ্জার কথা। রুনিতার চোখ দুটিকে বাজপাখির চোখ মনে হয়।

যা উত্থিত হয়েছিল তার পতন ঘটে।

"সারাদিন এত কী দেখ," রুনিতা বলে। "তোমার জন্য রোজা আমাকে মারল। মাগি তোমার প্রেমে পড়ে পাগল হয়ে গেছে।"

আমাকে তখন বোবায় ধরেছে। আর আমার চোখ নিচের দিকে নামে। স্কার্টের ভিতর থেকে রুনিতার হাঁটু দুটি আমার দিকে তাকায়। কী ভেবে মুখে পানি চলে এসেছিল? তারপর কি আর হাঁটু দেখে কোনও আনন্দ আছে? আমি শক্ত হই। বলতে চাই, সারা দিন আমি তোমাকে দেখি, এ কথা ঠিক নয়। বড় জোর রোজ দুই কি তিন বার। আর আমি প্রত্যেক মেয়ের দিকেই তাকাই। আর তা করতে গিয়ে আমি মুখের গঠন বা ত্বকের রঙের মধ্যে কোনও বৈষম্য করি না। কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনও কথা সরে না।

"তোমার কী দোষ?" রুনিতা বলে। "সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশি তাকায় শিক্ষকরা। অথচ দেখো, আমার বুক এখনও পুরোপুরি ভরেনি।"

লোটাসের সার্টিফিকেটের কথা মনে আসে। আমি আড়চোখে রুনিতার বুকের দিকে তাকাতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই।

"আর দেখার সুযোগ পাবে না," রুনিতা বলে। "আমি শহরে চলে যাচ্ছি।"

আমি রুনিতাকে শুভকামনা জানাই। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "তুমি রোজাকে পাত্তা না দিয়ে ভাল করেছ। তুমি এর চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে পাবে।"

কয়েক-বছর পরে আমি শুনেছিলাম, সড়ক দুর্ঘটনায় রুনিতার সবাই মারা গেছে। শুধু সে বেঁচে ছিল।

১৩

আমাদের বাড়ি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শান্ত জায়গা। পিতা আস্তে কথা বলতেন। তিনি নাজিফকে আস্তে কথা বলা শিখিয়েছিলেন। খ্যাপাবুড়ির যখন পাগলামি উঠত না তখন তাঁর চেয়ে শান্ত কোনও মানুষের কথা কল্পনা করাও দুষ্কর ছিল। আমাদের বাড়ির চারিদিকের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাইরের কোলাহল ভিতরে আসতে পারত না। নানা কারণে বাড়িটা ছিল রহস্যময়। তার ইতিহাসও আমার জানা ছিল না।

এক রাতে দেখি পিতা বৈঠকখানায় বন্দুক নিয়ে বসে আছেন। টেবিলে একটা খালি সুরার গেলাশ। নাজিফ পিতার পাশে বসে ঝিমাচ্ছেন। তাঁর সামনে একটা তলোয়ার। পিতার চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে রয়েছে। আমার শৌচকর্মের তাড়া ছিল। আমি চাচ্ছিলাম না, তাঁরা বুঝুক, আমি তাঁদের দেখেছি।

ফেরার সময় পিতাকে কথা বলতে শুনি : "নাজিফ, ওঠো, ঘুমাতে যাও।"

নাজিফ তাঁর মাথাটা উপরের দিকে ঝাড়া দিয়ে আবার ঢুলতে থাকেন।

তাঁদের হৃদ্যতা আমাকে মুগ্ধ করে, বিশেষ করে নাজিফ যখন কথা বলেন :

"মাননীয় স্যার, আপনার মতো অনেক মান্যগণ্যইতো নতুন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হয়ে গেলেন। তাঁদের সব কিছু এখন পুলিশ পাহারা দেয়। শত্রুর জ্বালায় আপনি রাতে ঘুমাতে পারেন না। আপনি স্থানীয় সরকারে একটা বড় পোস্টের জন্য দরখাস্ত করছেন না কেন?"

"জীবনে আমার আর কিছু চাওয়ার নাই, নাজিফ," পিতা বলেন।

নাজিফ দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কথা বলছিলেন। নয় মাস আগে, এক দলছুট রাজনীতিক আর ছয়জন জুনিয়র আর্মি অফিসারের সাহায্যে, অবৈধ এক রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে নতুন এক রাষ্ট্রপতি দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সরকারের অবৈধভাবে পালাবদল জনগণ সমর্থন করে। ক্যু এর নেতা, ৪৬ বছর বয়সী এক ব্যারিস্টার, দলছুট রাজনীতিক আর আর্মি অফিসারগুলোকে সাথে নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করেন। আর্মি অফিসারদের মধ্যে একজন ছিলেন রাষ্ট্রপতির নিজস্ব গার্ড রেজিমেন্টের সদস্য। তিনি ঘুসের সাহায্যে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁদের ঢোকার ব্যবস্থা করেন। ক্যু-কারিরা ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতিকে দুর্নীতি

আর স্বজনপ্রীতির দায়ে অভিযুক্ত করেন, আর ক্যু'র লিডার তরুণ ব্যারিস্টার ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির গালে চড় মারেন। দুর্নীতির অভিযোগগুলো সত্য ছিল। থাপ্পড়ের দৃশ্য দেশবিদেশের টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হয়।

পরের দিন বিকালে ক্যু' এর আট নেতা পাদ্রিদের পোষাক পরে জাতীয় টেলিভিশনে আসেন। তাঁরা বলেন দুর্নীতিবাজ সাবেক রাষ্ট্রপতি ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য এক ঐশ্বরিক ডাকে তাঁরা সাড়া দিয়েছেন মাত্র। তাঁরা একে অনের কাছে অপরিচিত ছিলেন। ঈশ্বরদূত তাঁদেরকে পৃথকভাবে স্বপ্নে দেখা দিয়ে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাঁদের মাথার কাছে রেখে যাওয়া ঈশ্বরদূতের তছবি দেখে তাঁরা একে অপরকে চিনতে পারেন। তছবির কথা বলার সময় তাঁরা প্রত্যেকে ডান হাত তুলে ধরেন আর তাঁদের মধ্যম আঙ্গুল আর তর্জনির বৃত্ত থেকে এক এক করে আটটা ধবধবে সাদা তছবি ঝুলতে থাকে। তারপর পর্দায় আসেন রাষ্ট্রের মুখ্য সচিব, যিনি ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতিরও মুখ্য সচিব ছিলেন। মুখ্য সচিব বলেন তছবিগুলোর দানা ও রশি স্বর্গে তৈরি। প্রতিটি দানা একই পদার্থের। তবে রশিগুলোর দৈর্ঘ ভিন্ন ভিন্ন। যিনি সবচেয়ে লম্বা রশি পেয়েছেন, তিনি হয়েছেন ক্যু-লিডার, যিনি নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে এখন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। আর যিনি সবচেয়ে ছোট রশি পেয়েছেন, তিনি নতুন রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক উপদেষ্টা হয়েছেন। ক্যু এর অন্য ছয় নেতা তাঁদের তছবির রশির দৈর্ঘ অনুযায়ী বিভিন্ন দায়িত্ব পান। রাষ্ট্রপতিসহ ক্যু-এর আট নেতা জাতির সামনে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরার আগে যাঁর যাঁর তছবিতে তাঁরা ১৩৩ বার করে ঈশ্বরের নাম জপ করেন।

নেতারা তাঁদের শাসনের দুই বছরের মাথায় প্রতিটি পরিবারকে একটি করে ইটের বাড়ি, একটি ছোট গাড়ি, আর একটি টেলিভিশন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা আরও বলেন, অতি দ্রুত তাঁরা দেশকে চাল, গম, সবজি, মধু, মাখন, দুধ, ডিম আর চিনির বন্যায় ভাসাবেন। তবে তাঁদের প্রথম কাজ হল, তাঁরা বলেন, দুর্নীতি উচ্ছেদ করে গোটা দেশকে পাশ্ববর্তী সমুদ্রের পানি দিয়ে ধুয়েমুছে পুতপবিত্র করা।

ক্যু নেতারা আমাদের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ভেদে সবার সমর্থন পান। উপাসনালয়গুলিতে ঢুকে মানুষ নতুন রাষ্ট্রপতির জন্য প্রার্থনা করেন। রাত জেগে চত্বরে চত্বরে হারিকেনের

আলোয় জনতা সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। কবিরা নতুন রাষ্ট্রপতির প্রশংসায় গান বাঁধেন আর পাদ্রিরা প্রার্থনা দীর্ঘতর করেন। সংবাদপত্রগুলো বিপ্লবী সরকারকে শিক্ষা দেয়, কীভাবে নতুন রাস্তা আর রেলপথ নির্মাণ করতে হবে, কীভাবে নদী শাসন করতে হবে, কীভাবে জিনপ্রযুক্তির খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে, কোথা থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হবে, আর জাতীয় স্বার্থে কোন কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে, আর কোন কোন রাষ্ট্র জোর করে দখল করতে হবে।

এত বড় আশাবাদ যত দ্রুত আসে তার চেয়ে দ্রুত শেষ হয়ে যায়। মাত্র নয় মাসের মাথায় দেশবাসী বুঝে ফেলে, ক্যু-কারি নেতারা তাঁদের ধোকা দিয়েছেন। বুদ্ধিজীবিরা বলেন, পৃথিবীতে এমন আর একটা জাতি নাই, যাকে তছবি দেখিয়ে এমন কাত করা যায়। নৈরাশ্যবাদীরা বলেন, মুর্খ এ জাতির জন্য এটা ছিল উপযুক্ত সাজা। কে তাঁদের মুর্খ করে রেখেছে, আশাবাদীরা প্রশ্ন তোলেন। নতুন রাষ্ট্রপতি ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে দেশ শাসন করতে থাকেন। অনেক জমিদারের বংশধর তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখান। ২০০ জনকে উপদেষ্টা করা হয়। নাজিফ আফসোস করে বলেন, তাঁর মালিক, মানে আমার পিতা, কোনও কিছুর জন্য চেষ্টা করলেন না।

নাজিফের মতো, আমারও পিতার উদাসিনতা পছন্দ হয়নি। আমি চাইছিলাম, পিতাও অন্যদের মতো চেষ্টা করুক বড় কোনও পদের জন্য। দুশ্চিন্তা করতে করতে আমি বিছানায় ফিরে যাই। পরে শুনি, পিতা আর নাজিফ অনেক রাত এ ভাবে বাড়ি পাহারা দিয়ে কাটিয়েছেন।

১৪

এক দিন পিতা বাইরে যান। স্কুল বন্ধ ছিল। আটা রুটি, মুরগির ডিম, পাকা কলা আর তালের শাস দিয়ে প্রাতরাস সেরে আমি পড়তে বসি। খ্যাপাবুড়ি তার ঘরে ছিলেন। নাজিফ আমার কাছে একটা চিঠি নিয়ে আসেন। চিঠিটা পিতা নাজিফকে দিয়েছিলেন পোস্ট অফিসে দিয়ে আসার জন্য।

"তোমার চাচার কাছে লেখা, তোমার আব্বার চিঠি," নাজিফ বলেন।

এ যাবৎ চেনাজানা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আমি শুধু আমার এক সৎ ফুফুকে চিনতাম। পিতা কয়েকবার আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। রাস্তাঘাটে শুনেছিলাম, পিতার এক সৎ ভাই আছে, যিনি কয়েক গ্রাম পরে বাস করেন। আমি কখনও তাঁকে দেখিনি।

সৎ ভাইবোন থাকাটা ছিল আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। তাই এটা নিয়ে আমি কখনও মাথাও ঘামাইনি। জমিদারের উত্তরাধিকার হলে তাঁরা ভিন্ন বাড়িতে বাস করেন আর তাতে দূরত্বের কারণে তাঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাটির সুযোগ কমে যায়। আর প্রজার উত্তরাধিকার হলে তাঁরা একই বাড়িতে বাস করেন, একে অন্যের মাথা ফাটান, চুল ছিঁড়েন, রাতের বেলা ঘুমন্ত শত্রুর মুখে বিষ ঢেলে দেন।

তা হলে এই চিঠির গুরুত্ব কী? নাজিফই বা কেন তা আমাকে দিলেন? চিঠিটা আমি পড়ি না। কিন্তু ওটার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাই। আর তাতে আমার মাথা গরম হতে থাকে। কপালটাও শক্ত হয়ে যায়। চিঠির বিষয়বস্তু জটিল। পেছনের ঘটনা না জানা থাকাতে আমি তার কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তাই আমি নাজিফকে সব খুলে বলতে বলি। তিনি সাহস পান না। তাঁর কথা হল তিনি আমাকে কিছু বলতে পারবেন না। এমনকি আমি যে চিঠিটা দেখেছি, তা-ও পিতা যেন না জানেন। আমি নাজিফকে বলি, তা হলে আপনি আমাকে এটা দেখালেন কেন। নাজিফ তখন আমার দিকে চোখ নরম করে তাকান। আর কিছু তথ্য প্রদান করে।

আমার দাদি মারা যাওয়ার পর দাদা ডাকাত পরিবার থেকে জানকি নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। দাদার উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতদের সাহায্যে নিজের এবং নিজের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা। ডাকাতদের উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতি করা। দাদা বিয়ের রাতেই বিষয়টা আঁচ করতে পেরেছিলেন। জানকি এসেছিলেন সব কিছু বাচ-বিচার করে দেখতে, কীভাবে জমিদারকে তার জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করা যায়। জানকি দেখলেন তাঁর উদ্দেশ্য সাধন প্রায় অসম্ভব। তবে তিনি যদি তাঁর সৎ পুত্র, অর্থাৎ আমার পিতা দিওনিশ শেকাবকে খুন করতে পারেন, তাঁর উদ্দেশ্য অন্ততপক্ষে আংশিক সফল হবে, কারণ এতে করে তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁর স্বামীর সব জমি পেয়ে যাবেন। দাদা জানকিকে সে সুযোগ দেন না। তিনি দিওনিশ শেকাবকে বাড়ি থেকে বহুদূরে

পর্তুগিজ মিশনারিদের তৈরি দু'শ বছরের পুরনো এক বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেন, যেখানে পিতা স্কুল শেষ করেন। পিতা সেখানে এক রাজকুমারীর সাথে প্রেম করে তাঁকে ফেলে চলে আসেন। বহু বছর পর সেই রাজকুমারী এক খ্যাপাবুড়ির অভিনয় করে আমাদের বাড়িতে ঢোকেন।

বিয়ের সাত মাস পর জানকি বিওনিশ শেকাবের জন্ম দেন। মাত্র সাত মাসের মাথায় সন্তান হওয়ায় জানকির প্রতি অনেকের সন্দেহ হয়। তাঁদের জমিদারকে ব্যভিচারিণী স্ত্রী দিয়ে ঠকান হয়েছে, এই ধারনায় গ্রামবাসি প্রতিবাদ করেন। জানকির লোকজন ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। জানকিকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য তাঁরা এক দরবেশ পাঠান। দরবেশের লোক গ্রামবাসিকে ডেকে আনেন।

দরবেশ পবিত্রগ্রন্থের বাণী পড়ে এক কিশোরের উপর ফুঁ দেন, আর সে কিশোরের পায়ের পাতা মাটি থেকে এক ফুট উপরে উঠে যায়। "সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, ওই মহিলা নির্দোষ," চিৎকার করে কিশোর বলে। এর মধ্যে মাঝবয়সী এক লোক বুক চাপড়ে জিজ্ঞেস করেন, এলাকায় এত কিশোর থাকতে দরবেশ তাঁর একমাত্র ছেলেকে কেন আকাশে তুলে নিলেন? দরবেশ পরিষ্কার জানিয়ে দেন, উপস্থিত জনতা যদি জানকির উপর থেকে বদনাম না তুলে নেন, তিনি কিশোরকে মাটিতে নামিয়ে আনবেন না। প্রয়োজনে তাকে উর্ধ্বলোকে পাঠিয়ে দিবেন। আর এই তিরোধানের সব দায়িত্ব যাবে গ্রামবাসির কাঁধে।

"শ্রদ্ধেয় গ্রামবাসী, দেখুন আপনারা। এই বালক প্রমাণ করছে, কী নিষ্ঠুরভাবে আপনারা তাঁকে কলংক দিয়েছেন। এ কি শুধু এ জন্য যে, তিনি সুন্দরী? এ কি শুধু এ জন্য যে, তিনি এক বৃদ্ধ জমিদারের তরুণী স্ত্রী।"

এ কথা শুনে লজ্জায় উপস্থিত মান্যগন্যগণ মাথা নিচু করেন।

"ঠিক আছে," বলে হুঙ্কার ছেড়ে দাদা ঠেলা সামলান। লোকজন যে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে যায়।

দাদা দরবেশকে বিশ্বাস করেননি। তিনি আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করেন। আশা করেন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তত দিনে জানকি তাঁর মেয়ে পিওশানির জন্ম দেন। এক রাতে কী যেন একটা শব্দ শুনে দাদার ঘুম ভাঙ্গে। অন্ধকারে দাদা আঁচ করেন জানকি দা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাদা লাফ দিয়ে উঠে বসেন। জানকির হাত থেকে দাখানা পড়ে যায় আর জানকি ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। একই ঘরে ভিন্ন খাটে শিশু পিওশানি ঘুমিয়ে আছেন। তার

যেন ঘুম না ভাঙ্গে এ জন্য দাদা নীরবে জানকির চুল মুঠিতে নিয়ে তাকে টানতে টানতে কাচারি ঘরে নিয়ে যান। সেখানে তিনি জানকিকে বেতের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আধমরা করেন। দাদা ঘটনা ধামাচাপা দেন। বাড়ির সব অস্ত্র এক কক্ষে জড়ো করে তিনি অস্ত্রখানা তৈরি করেন এবং অস্ত্রখানার তদারকির জন্য এক বিশ্বস্ত চাকর নিয়োগ করেন। দাদার সময়ে তখন রান্নার তরকারি কুটার জন্যও চাকরদের অস্ত্রখানা থেকে কয়েক ঘন্টার জন্য অস্ত্র ধার করতে হত। কে কোন অস্ত্র কতক্ষণ ব্যবহার করছেন তা অস্ত্রখানার রেজিস্ট্রি বই দেখলেই জানা যেত।

সাড়ে আট বছরের কলহপূর্ণ দাম্পত্যের পর দাদা জানকির সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটান। আট বছরের ছেলে আর পাঁচ বছরের মেয়ে নিয়ে জানকি পিত্রালয়ে চলে যান। এক দিন জানকির ভাইয়েরা দাদাকে রাস্তায় আটক করেন। তাঁরা জোর করে দাদার কাছ থেকে তাঁর সব সম্পত্তি জানকির ছেলে বিওনিশ শেকাবের নামে লিখিয়ে নেন।

দুই বছর পরে তাঁরা সবাই এসে দাদার কাছে ক্ষমা চান। জোর করে বানানো দলিল ফেরত দেন। বিষয়টা এক রকম সমাধা হয়। দাদা স্থানীয় পাদ্রিকে ডেকে জানকিকে বিয়ে করে আবার ঘরে আনেন।

আবার পুরনো বিবাদ শুরু হয়। এবার জানকি ঘুরে দাঁড়ান। মা'র নেতৃত্বে বিওনিশ, যিনি এর মধ্যে নিজেই এক ডাকাতে পরিণত হয়েছেন, অন্যায়ের মোকাবেলা করেন। এক হাতে বিওনিশ আর একহাতে পিওশানিকে নিয়ে জানকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাদার বদনাম করে আসেন। গ্রামবাসি এবার জানকিকে সমর্থন করেন।

এক দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে গ্রামবাসি দেখেন, বিওনিশ শেকাব পাগল হয়ে গেছেন। বোর্ডিং স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। তাই দিওনিশ শেকাবও বাড়ি ছিলেন। সৎ ভাইয়ের জন্য দিওনিশ শেকাবের করুণা হয়। তাঁর সৎ বোন ও সৎ মা কান্নাকাটি করে লোকজন জড়ো করেন। তাঁরা বলেন, নির্যাতনের কারণে বিওনিশ শেকাব পাগল হয়ে গেছেন। তাঁরা সবাই পিতার দিকে তাকান। পিতা লজ্জায় কীসের আড়ালে মুখ লুকালেন তা নাজিফ ভাল করে বলতে পারলেন না। তবে তিনি অন্য ঘটনাগুলি বেশ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। বিওনিশ শেকাব যখন পাগলামি করছিলেন তখন দাদা নীরব থাকেন। শেষে গ্রামবাসির চাপে পড়ে তিনি তাঁদের ইচ্ছার নিকট হার মানেন। তিনি বিওনিশের চিকিৎসার জন্য সম্মতি প্রদান করেন।

কোনও একটা কিছু ঘটলেই জানকির লোকজন টের পেয়ে যেতেন। তাঁরা তখন আমাদের বাড়ির চারিদিকে ব্যূহ রচনা করতেন। এবারও জানকির লোকজন ধেয়ে আসেন। আশপাশ থেকে বেছে তাঁরা বৈদ্য, ডাক্তার, আর গুনিন নিয়ে আসেন। বৈদ্য বলেন, রুগীর হাসি তাঁর পক্ষে নিরাময় করা সম্ভব নয়। এটা মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। ডাক্তার বলেন, ছোটকাল থেকে লোহার ডান্ডার বাড়ি খেতে খেতে বিওনিশ শেকাব পাগল হয়ে গেছেন। গুনিন রোগীর উপর প্রেতের আছর দেখতে পান। প্রহারের কারণে মানুষ পাগল হয় না, গুনিন বলেন। প্রেতের আছরে মানুষ পাগল হয়। বরং প্রহার করে প্রেত তাড়িয়ে মানুষের পাগলামি ভাল করতে হয়। দাদা গুনিনকে বিওনিশ শেকাবের উপর ভর করা প্রেত তাড়ানোর অনুমতি দেন।

বিওনিশকে পাঁচ-ছয় জন লোক চেপে ধরেন। গুনিন দু'টি লোহার শিক আগুনে পুড়ে বিওনিশের পায়ের তালুতে সেঁক দেন। যন্ত্রণায় বিওনিশ লাফ দিয়ে উঠেন। যাঁরা তাঁকে চেপে ধরেছিলেন, তাঁরা ছিটকে পড়েন। তখন পেছন থেকে চার-পাঁচ জন এসে বিওনিশকে জাপটে ধরেন। তাঁরা বিওনিশকে চেপে ধরেন আর গুনিন লোহার শিক দিয়ে বিওনিশের পায়ের তালুতে সেঁক দিতে থাকেন। বিওনিশের পায়ের পাতার শক্ত চামড়া ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে জ্বলে উঠে। বিওনিশের আর্তনাদে তাঁর সৎ ভাই দিওনিশ শেকাব কেঁপে কেঁপে উঠেন। এর মধ্যে বিওনিশ শেকাব গুনিনের হাত থেকে একটা শিক কেড়ে নিয়ে দাদাকে আক্রমণ করেন। লোকজন ধরে নেন, ওটা বিওনিশের উপর ভর করা প্রেতের কাজ, বিওনিশের কাজ নয়। প্রেত তাঁদেরও আক্রমণ করে বসতে পারে এই ত্রাসে যিনি যে দিকে পারেন ছুটে পালান। দাদাকে তৃতীয়বার আঘাত করার আগে বিওনিশ মাটিতে পড়ে যান। পোড়া পায়ের তালুর উপর তিনি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেননি। পালানো গ্রামবাসি আবার উঠানে এসে জড়ো হন।

"পড়ে না গেলে তোমার দাদাকে সে সে-দিন মেরে ফেলত," নাজিফ বলেন।

বিওনিশ শেকাব পাগলামির ভান করেছিলেন তাঁর কথিত পিতা অর্থাৎ আমার দাদাকে বিব্রত করার জন্য। দাদা বিওনিশ ও জানকিকে উঠানে দাঁড় করিয়ে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলতে গেলে গ্রামবাসী সায় দেন। আমার পিতা দিওনিশ শেকাব তাঁর সৎ আত্মীয় জানকি ও বিওনিশ শেকাবকে ক্ষয়িষ্ণু ওই ক্রুদ্ধ জমিদারের হাত থেকে রক্ষা করেন।

জানা যায়, জানকির বাপের বাড়ির বৈঠকখানায় পুরো নাটকটা লেখা হয়েছিল। তরুণ গুনিনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নাটকটার মঞ্চস্থ পণ্ড হয়ে যায়। ওই গুনিনটা ছিলেন সেই দরবেশের পুত্র, যিনি আমার পিতামহের ঔরসে বিওনিশের জন্ম হয়েছিল বলে প্রমাণ করেছিলেন। গুনিনটাকে পাঠানো হয়েছিল এটা প্রমাণ করতে যে, বিওনিশের উপর কোনও প্রেত ভর করেনি। তরুণ গুনিন প্রেত তাড়ানোতে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করার লোভ সামলাতে পারেননি। ঘটনার এক মাসেরও কম সময়ে, ধান ক্ষেতে দু'টি স্থানে ৩০০ মিটার ব্যবধানে যথাক্রমে তরুণ গুনিনের মাথা ও দেহের অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায়। ওই এলাকার মানুষ পচা গন্ধ অনুসরণ করে তাঁর লাশ খুঁজে পান, যেখানে শরীরের দুই অংশের উপর মৌচাকের মতো মাছির বাসা বেঁধেছিল।

৩৮ বছর বয়সে কোনও একটা অজানা রোগে জানকির মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ দিনগুলোতে তাঁর বাপের বাড়ির লোকজন তাঁকে ত্যাগ করেন। এমনও নাকি শোনা যায় তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁকে এক কুয়োর মধ্যে ঠেলে ফেলে দেন আর তাঁর ভাইরা কয়েক দিন পর কুয়ো থেকে লাশ উদ্ধার করে তাঁর সৎকার করেন। এর কয়েক বছর পর আমার পিতামহ বিওনিশ শেকাবকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। এর দুই বছর পর পিতামহ বাত ব্যারামে পা ফুলে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছয় গ্রাম দূরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর কন্যা পিওশানির বিয়ে দিয়ে যান। আমি যখন শেষবার পিতার সাথে পিওশানিকে দেখতে যাই, তখন তিনি কাকে যেন গালি দিচ্ছিলেন। নাজিফের থেকে এ কাহিনী শোনার পর বুঝলাম, তিনি তাঁর ভাই বিওনিশকেই ঝাড়ছিলেন।

আমার পিতামহ তাঁর সব জমি আমার পিতাকে দিয়ে যান। পিতার বয়স তখন ২১। তখন তিনি অনেক সম্পত্তি আর টাকাপয়সার মালিক। ফলে তিনি প্রেমের সন্ধানে নেমে পড়েন। নাজিফের মতে, তিনি তিন বার প্রেম পেয়েছিলেন : ১৬ বছর বয়সে বোর্ডিং স্কুলে পড়ার সময়, ২৫ বছর বয়সে এক সুন্দরী নারীর কাছে, আর সর্বশেষ আমার জননীর কাছে। নাজিফ আমার পিতার প্রেমকাহিনীগুলো জানতেন। তবে ততটা নয়। যেমন, তিনি জানতেন না যে, যে বালক গরু চোর আমাদের বাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করত, সে ছিল আমার পিতার ঔরসে জন্ম নেয়া তাঁর দ্বিতীয় প্রেমিকার বড় সন্তান। আসলে লোকমুখ থেকে শুনে আর কতটা জানা যায়। সেই বালক চোর ছিল আমার অর্ধেক-ভাই। চুরি সে করত ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাড়ির পাশে সে

ঘোরাফেরা করত তার পিতাকে এক নজর দেখার জন্য। মৃত্যুর পূর্বে আমি যখন আমার এই ভাইয়ের পরিচয় পাই, তখন মনে হয়েছে, কেন যে মানুষ সন্তান জন্ম দিয়ে পালিয়ে যায়। ভাই তখন দেশের সবচেয়ে বড় অভিনেতা। চলচ্চিত্র কর্পোরেশনে চাকর এর চাকরি নিয়ে ভাই সবচেয়ে বড় নায়ক হয়ে বের হন। তখনকার দিনে একটা সিনেমা করতে লাগত আশি লাখ রোনা। তার অর্ধেক, অর্থাৎ চল্লিশ লাখ, দিতে হত আমার ভাইকে। লৌহান দৌমত থাকলেই ছবি সফল। আমার দুঃখের দিনে ভাই আমাকে আলিঙ্গন করেছেন। আমাকে সিনেমায় নামাতে চেয়েছেন। যে মেয়ে আমার সর্বনাশ করে, সে মেয়ে দেখে ফেলবে বলে আমি সিনেমায় নামিনি। ভাই থেকে সাহায্য না নেয়ার জন্য আমি তার গণ্ডি থেকে পালিয়ে যাই। সে আমাকে খুঁজে বের করে। আমার ভাই খুব ভাল ছিল। কিন্তু সে আমাকে বাঁচাতে পারেনি। আর সে কথা এখানে ততটা প্রাসঙ্গিকও নয়।

এক সময় বিওনিশ শেকাব তাঁর মাতুলদের গড়া ডাকাতদলে যোগ দেন। এক বার তিনি জেলে যান। আমার পিতা তাঁকে জামিনে মুক্ত করেন। পিতা তাঁর পিতার সম্পত্তি ভাগ করে বিওনিশ আর পিওশানিকে দেন। সম্পত্তি ভাগাভাগির পর জানা যায়, বিওনিশের মামারা যে দলিলটা আমার পিতামহকে ফেরত দেন, তা আসলে মূল দলিলটার নকল। মূল দলিলটা চলে যায় বিওনিশের হাতে। সেই দলিল অনুযায়ী আমাদের সব কিছুর মালিক বিওনিশ শেকাব।

আমাদের দেশে জায়গাজমির মামলায় সব সময় দুবৃত্তরা জয়ী হত। নকল দলিল করে যে কারও জমি দখল করা যেত। খাল, বিল, নদী আর জঙ্গল দখলের জন্য রাস্তায় রাস্তায় নকল দলিল বিক্রি হত। বিওনিশের তখন পোয়াবারো। ডাকাত দলের সর্দার হয়ে তিনি টাকার পাহাড় গড়েন। তিনি আমার পিতাকে আমাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করতে চান। রাতের বেলা হামলা করে আমাদের মেরে ফেলা তাঁর অন্যতম পরিকল্পনা। এ জন্য পিতা আর নাজিফ রাত জেগে বাড়ি পাহারা দেন। এই প্রেক্ষাপটে পিতা বিওনিশ শেকাবকে চিঠি লেখেন।

জীবনে ওই একটি মাত্র সময়ে, নাজিফ যখন আমাকে এ কাহিনী বলেন, তখন আমি আমার পিতাকে ভালবেসেছিলাম। ঘটনাগুলি শোনার পর আমার ভয় হয়। রাতের বেলা আমি শুয়ে শুয়ে পিতার জন্য কাঁদি। আমার মনে হয়, আমাদের বাড়ির পেছনের সেতুটার উপর দিয়ে পিতা হেঁটে যাওয়ার

সময় সেতুটা ভেঙ্গে পড়েছে। কিংবা শয়তানরা তাঁকে ইটের ভাটার চুল্লিতে ফেলে দিয়েছে; পিতা নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। ভাবতে ভাবতে আমারও নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হত। ছোট বেলার এ-সব আতঙ্ক আমার কখনও কাটেনি। ধীরে-ধীরে চিরদিনের জন্য আমি বদ্ধাতঙ্ক আর শূন্যাতঙ্কে আক্রান্ত হই। তবে পাশাপাশি আমি পিতার উপযুক্ত পুত্র হওয়ার কথাও ভাবি। ভাবি কুংফু আর ক্যারাটে শিখে ডাকাতদের সাথে লড়ব। তাদের পরাজিত করব। কিন্তু এ সব চিন্তা আমার মধ্যে কখনও স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

পিতার চিঠি লেখার কিছু দিন পর নাজিফ আমার কাছে আর একটা চিঠি নিয়ে আসেন। বিওনিশ শেকাব লিখেছেন : "মহামহিম ভ্রাতা,

আপনার চিঠি পড়িয়া আমার বিবেক ফিরিয়া আসিয়াছে। এই বার আমি ভাল হইয়া যাইব। আপনার সব দয়া আমার স্মরণে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এমন কোনও পাপ নাই, যাহা আমি করি নাই। আপনাকে খুন করিলে নরকেও আমার স্থান হইবে না। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আমার, আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমি আপনার জমি চাহি না। শুধু আপনার শুভকামনা চাহি। ঈশ্বরের কৃপায় আমি অনক অর্জন করিয়াছি। আপনার টাকা দিয়া আমি কী করিব? ইতি আপনার অপবিত্র ভ্রাতা। বিওনিশ শেকাব।"

নাজিফের মুখ দেখে বুঝেছিলাম, এবার তিনি ভাল খবর এনেছেন। পিতার চিঠি আমাকে দিয়ে আমার ভীতসন্ত্রস্ত্র ভাব দেখে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। বিওনিশ শেকাবের চিঠি পড়ার পর আমরা সুসংবাদটি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করি। আর গরুর মগজ ও গরম রুটি দিয়ে সুসংবাদটি উদযাপন করি।

১৫

ঘরে শান্তি ফিরে আসার পর আমার মন আবার নারীর দিকে ছুটে যায়। এর মধ্যে অনেকে আমার হাতের উপর দিয়ে চলে গেছে। তারা কেউ আমার জীবনের নারী ছিল না। তাদের জন্য আমার একটাই প্রার্থনা ছিল: জগতের সকল নারী সুখী হোক।

চারিদিকে তখন আনন্দ। জীবন ছিল স্বাভাবিক। সব চেয়ে বড় কথা, রাতে ভাল ঘুমাতাম। ঘুমের মূল্য আমি তখনও বুঝিনি। বুঝিনি, জীবনে সুনিদ্রার সময় কত দ্রুত কেটে যায়। এমন কি পাঁচ মিনিটের দিবা-নিদ্রা জীবনের জন্য কত অমূল্য। তবে ব্যর্থ প্রেমিকের জন্য দিবানিদ্রা ক্ষতিকর। ব্যর্থ প্রেমিক রাতভর বিষণ্ন আর নিদ্রাহীন কাটায়, দুপুরবেলা রাজ্যের ক্লান্তি তার উপর ভর করে, তখন সে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেও স্নায়ুগুলো জেগে থাকে। ব্যর্থ প্রেমিকের দিবানিদ্রা যত দীর্ঘ হয়, রাতে নিদ্রাহীনতার কষ্ট তার তত বাড়ে। আমার যখন দুঃখের দিন চলছিল, তখন আমি দিবানিদ্রার সময় দাঁড়িয়ে থাকতাম। হাতের তালুতে আলপিনের খোঁচা দিয়ে দিবানিদ্রা ঠেকানোর চেষ্টা করতাম। চেটালো খোঁচায় দিবানিদ্রা ভাঙত ঠিকই কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর তা আবার ফিরে আসত। তখন আমি আলপিনকে ত্বকের গভীরে প্রবেশ করিয়ে হাড়ে আঘাত করতাম। এই শিনশিনে ব্যথায় দিবানিদ্রা ভাঙলেও হাড়ের ব্যথায় কষ্ট পেতাম। ফলে এই নিপীড়নের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আমি কবরখানা, বস্তি, আর হাসপাতালের জরুরি-বিভাগে গিয়ে মানুষের দুর্ভোগ আর মৃত্যু দেখে দিবানিদ্রার সময়টা কাটাতাম।

কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় আমি হতাশ প্রেমিক ছিলাম না। তবে তার থেকে একেবারে দূরেও ছিলাম না। আমি হতাশ প্রেমিক হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আমার প্রস্তুতি চলছিল ঘূর্ণিস্রোতের মতো। মাঝে মাঝে পাক খেতে খেতে থেমে যেত; তখন প্রেম ছাড়া অন্য বিষয় নিয়েও ভাবতাম। কিন্তু বেশিরভাগ সময় চোখের উপর প্রেমিকার চেহারা ভেসে উঠত। কল্পনা করতে করতে তার সত্তার পুরো চিত্র আমার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই বুঝি তার আবির্ভাবের আগেই আমি তার দেখা পাই।

বিদায়ী বর্ষাকালের সেই অপরাহ্নে আমি দিবানিদ্রা উপভোগ করছিলাম। এক বন্ধু এসে জানালা দিয়ে আমাকে ডাকে। সে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাজিফ তাকে বাড়িতে ঢুকতে দিতেন। পিতা তাকে দেখেও না দেখার ভান করতেন। আমার বন্ধু কবিতা লিখত, ছবি আঁকত। সে ছিল আসল শিল্পী। কামনা তাকে কখনও উত্ত্যক্ত করেনি। বাড়ির বার হবার পর বন্ধুর সাথে আমার আর কখনও দেখা হয়নি। অথচ ওইসব দিনে বন্ধুটা যখন-তখন আমার জানালায় এসে দাঁড়াত। ওই অপরাহ্নে বন্ধু বলে, "বাইরে এত সুন্দর পৃথিবী। আর তুমি ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করছ।"

কথাগুলি ধরতে পারা মাত্র আমি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠি। আমার জীবনের তখন পর্যন্ত গাছপালা ছিল আমার প্রিয় দৃশ্য। ঘুম থেকে উঠেই গাছের দিকে তাকাতাম। তখন অবশ্য তার উপকারিতা ততটা বুঝিনি যতটা পরে বুঝেছিলাম। এখন বুঝি আমার জীবনের প্রকৃত দুঃখ সে দিন থেকে শুরু হয় যে দিন থেকে আমি ঘুম থেকে উঠে সবুজের দিকে তাকাতে ভুলে গেছি। সেই অপরাহ্নে আমি কবি বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাই। বৃষ্টিধোয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বাতাস এসে আমার বুকে লাগে। সে বাতাসের শোশো আওয়াজ ঘুমের জড়তা কেড়ে নেয়। ওই আওয়াজ আমার দেহকে রক্তপ্রবাহে সমৃদ্ধ করে। মনে হয়েছিল নিজেকে তার স্রোতে ছেড়ে দিই। মহাকাশে হারিয়ে যাই। বুকে যখন এমন শিহরণ তখন আমি শিরিষ গাছের শাখায় তাকে দেখতে পাই, প্রথমে ছায়ামূর্তির মতো। যা আমার সব মনোযোগ কেড়ে নেয়। ঘোরের মধ্যে আমি বন্ধুকে বিদায় জানাই। বৃক্ষ শাখা থেকে আমার চোখ সরে না। ছায়ামূর্তিটা স্পষ্ট হয়। কী দেব তার তুলনা? হোরেব পর্বতে ঝোপের আড়ালে মুসা নবি ঈশ্বরের দেখা পান। জিশু কবুতরের বেশে ঈশ্বরকে জর্ডান নদীর দিকে ডানা মেলে নেমে আসতে দেখেন। মেষপালক ইব্রাহিম তাঁর গোলান পার্বত্য উপত্যকার বাড়ির বাইরে ঈশ্বর ও তাঁর বার্তাবাহকদের সাথে বৈঠক করেন। আর আমার মানসনারী আমার পূর্বপুরুষদের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঘন পত্ররাজির আড়ালে এসে আমাকে দেখা দেয়।

তার সেই আবির্ভাব বিস্ময়কর হলেও তার নিদর্শনে সন্দেহ করার সুযোগ থাকে না। আমি তার সবুজ পোশাক, বুকের ঢেউ, লম্বা পা, আর জলপাইয়ের মতো চোখ দেখি। তার জুঁইগন্ধ বাতাসে সব কিছু দোল খায়। তাকে ঘিরে রয়েছে শান্তির ছায়া, যা মৃত মানুষ তার কবরে পেতে চায়। জীবনে আগে কখনও এমন প্রাঞ্জল কিছু অনুভব করিনি। আমি তাকে খুঁটেখুঁটে দেখি। তার পায়ের পাতা গাছের পাতায় ঢাকা। তা ছাড়া সব দেখি; কানের লতি থেকে বাহুর নিচে পোশাকের অংশ, কিছুই বাদ যায় না। সে অবশ্যই মানবজাতির অর্ধেক, যার সাধারণ নাম নারী। পার্থক্যের উপজীব্য শুধু আমার দেহের সুখগুলি : চোখের সুখ, অস্থির সুখ, পেশির সুখ। আমি নড়ার সাহস পাই না, পাছে সে শুন্যে মিলিয়ে যায়। আমি তার দিকে তাকিয়ে জীবনের মূল্য উপলব্ধি করি, যার দুর্বলতম সংস্করণ, একটি ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া, ঈশ্বর ছাড়া কেউ কখনও তৈরী করতে পারেনি।

ওই মুহূর্ত থেকে আমি তার পিছু নিই। তখন থেকে কয়েক বছর পর তাকে সশরীরে পাওয়া পর্যন্ত সে প্রতিদিনই হয় গাছের চূড়ায়, নয় জানালার ওপারে, নয়তো নির্জন রাস্তায় মুখোমুখি, কিংবা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এসে দেখা দেয়। আমি তার সাথে কথা বলি, আর প্রেমিক-প্রেমিকারা যা করে, তার সব কিছু করি। এ ঘটনাগুলি রুনিতার থেকে আলাদা। কারণ রুনিতার বিষয়ে আমার কোনও উচ্চাশা ছিল না। আর এতো আমার জীবনের নারী। তখন জীবন আমার সুখের চরম শিখরে পৌঁছে।

ওই সুখে আমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল। যদি আমার চাওয়া-পাওয়া সেখানে থেমে যেত, আমি সুখী মানুষ হিসাবে গর্ব করতে পারতাম। কিন্তু আমার বাসনা সেখানে থামেনি। আমি যা পাই, তার বেশি চাই। আমি তাকে হাতেনাতে ধরতে যাই। শুরু হয় আমার জীবনের নারী খোঁজার পালা। পরবর্তিতে আমি বহু মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা কখনও আমার মতো আর কাউকে নারীর পিছে এ ভাবে ছুটতে দেখেছে কি না। তারা বিরক্ত হয়েছে, তিরস্কার করেছে, কিন্তু সকলে এক বাক্যে বলেছে, না, তারা তা দেখেনি। আমি নিরন্তর তার পিছে ছুটে চলি। কয়েক বছরের মাথায় আমি তার খোঁজে বাড়ির বার হই।

১৬

আমি বের হই ছাত্রের বেশে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বসন্তের সে-দিন পিতার সাথে শহরের উদ্দেশে যাত্রা করি। তখন বুঝিনি, ঘরবাড়ি ছেড়ে আমি চিরতরে চলে যাচ্ছি। পূর্বপুরুষদের বাড়িতে আমি মাত্র আর দুই বার এসেছিলাম। প্রথম বার এসে আমি পিতা আর খ্যাপাবুড়ির গোপন কাণ্ড আবিষ্কার করি। শেষ বার আসি বিওনিশ শেকাব আর তার ছেলেদের খুন করতে। কারণ, তারা পিতা আর খ্যাপাবুড়িকে খুন করে লাশ দুটি নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। খুনাখুনি করা বা পিতার প্রেয়োবাদ ধরার জন্য বাড়ি আসাকে কি আর বাড়ি আসা বলে? তাই বলতে হয়, ওটাই ছিল আমার

শেষ বারের মতো বাড়ির বাহির হওয়া। ওই সময় আমার বুকে শুধু আমার নারী। আর চারিদিকে শস্য ক্ষেত। সবজির বাগানের ফাঁকফোকরে আমি তার ছায়া দেখি। দক্ষ চোখ আমার। রেলগাড়ি এগিয়ে চলে। পিতা গণিতের কথা বলেন। গণিত তার প্রিয় বিষয়। মনে আমার প্রচুর আনন্দ। যদি জানতাম, জীবনে সুখের ওটাই চরম উচ্চতা, তবে অকালিক কামনা আমাকে গভীর রাতে ঝড়বৃষ্টিতে খালি পায়ে রাস্তায় ফেলে দিতে পারত না। আর আমিও নিজের হাতে তৈরী মরীচিকার মাঝে ওভাবে মিলিয়ে যেতাম না।

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যা কিছু ঘটুক না কেন, অধ্যয়ন থেকে বিচ্যুত হব না। ধরে নিয়েছিলাম, আমার বাসনা পুরনের জন্য অধ্যয়নের সাফল্যই ছিল সহজতম পথ। সে ভাবেই শুরু করি। কয়েক বছর পর জ্যোতিষ ধ্রোন আমাকে যে চরমবাদী বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের ফলগুলিতে তার প্রমাণ ছিল। সত্য কথা হল, কোন কিছুর প্রথম বছর বা প্রথম দিন আমি খুব ভাল করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের ফল আমার অতীতের সব রেকর্ড ম্লান করে দেয়। তিনটা ভিন্ন ট্রাস্ট থেকে তিনটা বৃত্তি পাই। ওই তিন বৃত্তির টাকায় মাস চলত। সমপরিমান টাকা পেতাম পিতার কাছ থেকে। সবচেয়ে বড় পাওয়া ছিল দু'টি রাজকীয় ইউকেলিপ্টাস এর নিচে সবচেয়ে ভাল হোস্টেলটির একটি নিরালা কক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বছরের শুরুটা ছিল আমার সমগ্র ছাত্রজীবনের সোনালী সময়। তার প্রথম কয় মাস কাটে আলেক্সান্দ্রিয়ার রাজপ্রাসাদে রানী ক্লিওপেট্রার বাহুতে রাজ্যজয়ী সিজারের মতো। বসার জায়গা পেতাম এক জটলা সুন্দরী মেয়ের মাঝে। তাদের বন্ধু হওয়ার জন্য আমার কোনও গুণের অভাব ছিল না। তাদের বাহুতে নানান জাতের আতরের গন্ধ আর তাদের মুখে নানান জাতের হাসি। এ ছাড়া অবশ্য তাদের আর কিছু দেয়ার ছিল না। যে-সব জিনিস আমি তাদের মধ্যে খুঁজে বেড়াতাম, তার কিছুই তাদের মধ্যে ছিল না। না প্রেমের আকুলতা, না সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা।

আমি হোঁচট খাই। প্রথম বছর পড়াশোনার পাশাপাশি আমি তাকে খুঁজেছি। আর এখন সব কিছু ছেড়ে তার সন্ধানে নেমে পড়ি। যেখানে ছেলেমেয়েরা বসে আড্ডা মারে, সেখানে যাই। যেখানে তারা ফিসফাস করে সেখানে যাই। গাছের তলা, ছাদের পিঠ, কোথাও সে নাই। আমি প্রেম খুঁজি, তারা হাসে। তারা খোঁজে অন্য কিছু : ভাল ফল। চিকিৎসাবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, ভূবিদ্যাসহ

যে-সব বিষয় পড়লে ভাল রোজগার করা যেত, ভর্তি পরীক্ষায় ভাল না করাতে কর্তৃপক্ষ তাদের সে-সব বিষয় পড়তে দেয়নি। গণিত তাদের ভাল লাগে না; তবু তারা ভাল করার চেষ্টা করে। তাদের সাথে আমার দর্শন আলোচনা করতে গেলে তারা বলে :

"তোমার যা বুঝতে এক ঘন্টা লাগে, আমাদের তা বুঝতে লাগে এক দিন। তোমার জন্য বিলাসিতা, আমাদের জন্য না।"

তারা সবাই এক রকম ছিল, এটা বলা ঠিক হবে না। কেউ কেউ অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিল। তবে তা ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন রাহিব চাইত নারীর কোমলাঙ্গ। আবলুশ চাইত টাকা আর সুন্দরী স্ত্রী। রাশমনো চাইত শুধু ভাল একটা চাকরি।

"ভালবাসা তাহলে তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়?" আমি রাশমনোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"না। আমি এত ব্যস্ত যে আমার যে এখানে কিছু আছে তাই আমি ভুলে যাই," জিন্স পরা রাশমনো তার কোলের কাছে হাতের তালু রেখে বলেছিল। "পানি আর রক্ত ছাড়া আর কিছুর ছোঁয়া এখানে এখনও লাগেনি। রোমাঞ্চ কেমন, তা-ই আমি জানি না।"

বহু দিন বহু সহপাঠীর সাথে আমি কথা বলেছি, আর হতাশ হয়েছি, কারণ তাদের সবাই রাশমনোর মতোই জবাব দিত। যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় আমার মন জ্বলে যাচ্ছিল, কারও কাছে তার কোনও আবেদন ছিল না। অনেকে তা চাইতোই না। আর যারা বা কিছুটা চাইতো, তারা তা এমনি-এমনিই পেয়ে যেত। বস্তিবাসি থেকে রাজা-রানী, কারও জীবনে সে কামনা অপূর্ণ থাকেনি। ফলে, জীবনের নারীকে পাওয়ার আত্মবিশ্বাসে আমার বার বার চিড় ধরেছে। কখনও মনে হয়েছে, কালই আমি তার দেখা পাব; কখনও মনে হয়েছে, কখনওই আমি তার দেখা পাব না। এক সময় ভাবি, দাতব্যের কাজে ব্যস্ত হব আর কবিতা পড়ে অবসর কাটাব। কিন্তু এ সবের কোনও কিছুতেই আমি উৎসাহ পাইনি। ফুটবল খেলতে গিয়ে একবার বুকে আর একবার অণ্ডকোষে আঘাত পেয়েছি। তারপর আর কখনও ফুটবল খেলতে যাইনি। দাবার বোর্ড, তাসের আড্ডা, সব জায়গায় তার নিরন্তর উপস্থিতি। তার চিন্তা দমন করে গল্পের বই হাতে নিয়েছি, আধ পৃষ্ঠা পড়তে না পড়তে সে আবার মাথায় ঢুকেছে, আর আমি যে তারই চিন্তা করছি, এ কথা বুঝতে বুঝতে সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক চিত্রপরিচালক, সাংবাদিক আর গাড়িচালক মারা গেছে।

একবার ঠিক করি, নারী ছাড়া জীবন কাটাব। বড় বড় সন্ন্যাসীদের জীবনী নিয়ে বসি। স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীরের কাহিনী পড়ে প্রায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাই, আর তখন দুষ্ট রাহিব এসে তার গোপন সমকামের কথা ফাঁস করে দেয়। ফলে সেখানেও আমার সমস্যার সমাধান মেলেনি। আর আমার সমস্যা যেহেতু অন্য কারও ছিল না, তাই আমার চরম দুঃখের দিনেও কেউ সহানুভূতি দেখায়নি। নিজের কথা বলতে গিয়ে আজও তাই বিব্রত হই, আর সমুদ্রগর্ভের নির্জনতার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

82

দ্বিতীয় খণ্ড

83

84

১৭

আমি যখন অনার্স ক্লাশের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন কিছু ছাত্র-ছাত্রী আমার কাছে পড়তে আসে।

সে সময়ে গৃহশিক্ষকতা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় উপাদান ছিল। যে-সব গরিব মানুষ তিন বেলা খাবার জোগাড় করতে পারতেন না, তাঁরাও গৃহশিক্ষক রেখে ছেলেমেয়ে পড়াতেন। ধনীরা গৃহশিক্ষকের সংখ্যা আর যোগ্যতা নিয়ে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। এক সময় প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-সংস্কৃতি উৎসবে আমরা আমাদের সংস্কৃতির প্রথম ও দ্বিতীয় উপাদান, দারিদ্র্য ও গৃহশিক্ষকতা, প্রদর্শন করা শুরু করি। তখন যানবাহনের মালিক রাষ্ট্রপতির বন্ধুরা সড়ক দুর্ঘটনাকে আমাদের সংস্কৃতির তিন নম্বর উপাদান ঘোষণা করার জন্য তাঁর উপর চাপ দেন। তাঁরা কবিদের দিয়ে সড়ক-দুর্ঘটনার উপর কবিতা লেখান, সভা-সেমিনারে বিদগ্ধজনদের দিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করান। রাষ্ট্রপতির অফিসাররা রাষ্ট্রপতিকে বোঝান, যদি দুর্নীতিকে এর সাথে ঢুকিয়ে দেয়া যায়, তবে শীর্ষ-দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের রাষ্ট্রপতির হিসাবে তাঁকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে মাথা নিচু করে আর বসে থাকতে হবে না। রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টারা বলেন, দুর্নীতি যদি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ না হবে, পবিত্র রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই তা দূর করতে পারতেন। "ক্ষমতা গ্রহণের সময় এটাই কি আমাদের মহান নেতার এক নম্বর প্রতিশ্রুতি ছিল না?" পরিষদের বৈঠকে উপদেষ্টারা প্রশ্ন তোলেন।

পরিতাপের বিষয় বিশ্ব-সংস্কৃতি উৎসব কমিটি আমাদের এই প্রস্তাবগুলি নাকচ করে দেয়।

আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল দোকানঘরের মতো। ব্যাংকের কার্যালয়ের মতো করে সাজানো বড় একটি ঘরে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য

শিক্ষকরা বসে থাকতেন। ভর্তি-ফি নিয়ে কেরানিগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে একটি করে স্লিপ দিতেন। স্লিপে যে শিক্ষকের নাম উঠত, সেই শিক্ষক ওই ছাত্র বা ছাত্রীকে বাড়ি গিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে সপ্তায় সাত থেকে দশ ঘন্টা পড়াতেন। অনেকে নিয়ম ভেঙ্গে স্কুল বা কলেজের বাইরে থেকে গৃহশিক্ষক জোগাড় করতেন। অনেক ছাত্রছাত্রী চলে আসত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে, যাদেরকে অভিভাকরা অর্থলোভী শিক্ষকদের চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। সবার মধ্যে গণিতের শিক্ষকের কদর চিল সবচেয়ে বেশি। আমি ছিলাম গণিতের ছাত্র। এই ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে হয়ে গেলাম গণিতের শিক্ষক।

আমার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল আট, পাঁচজন তরুণী আর তিনজন তরুণ। আমার হতাশা যখন চরমে, তখন তারা আমার কাছে আসে। তরুণীগুলো আমাকে উজ্জীবিত করে। তবে এটা বুঝিনি, তাদের একজন আমার গন্তব্য নির্ধারণ করে ফেলবে। তাদের পেয়ে আমার বুকে আশা অংকুরিত হয়; জীবনের নারীকে খুঁজে পাওয়ার বুঝি এটাই উত্তম পথ। রাহিব, আবলুশ, রাশমনোসহ যারা প্রেমকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত তাদের সবাইকে শাপশাপান্ত করি। মনে মনে ভাবি, শিক্ষকতা হবে আমার প্রিয়তমাকে খুঁজে পাওয়ার মিশন; দরকার শুধু শিক্ষক হিসাবে নাম করা। প্রথম ব্যাচকে ভাল করে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিই, যাতে আমার নাম ছড়ায়, আর নতুন নতুন ব্যাচ আমার কাছে পড়তে আসে। তারপর আমি তাদের একজনকে পছন্দ করব। গৃহশিক্ষক হিসাবে ব্যর্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হব। সবার প্রিয় শিক্ষক হব, যাতে আমার সুনাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আর আমার স্বপ্নের নারী খুঁজে খুঁজে আমার কাছে চলে আসে।

সুযোগ-মতো ফ্যাকালটির খালি ঘরগুলোর একটাতে আমি তাদের সপ্তায় তিন দিন করে পড়াই। তরুণ-তরুণীদের ওই সমাবেশকে আমি সক্রেটিসের স্কুল বানাতে চেয়েছিলাম। প্রথম দিনের বক্তৃতায় যোগ করি গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস, গণিতে প্রাচীন ভারতীয়দের অবদান, আরবদের পাণ্ডিত্য, গণিতের অপরিহার্য বহুমূল্যবান ব্যবহার, লিবনিজ ও নিউটনের দ্বন্দ্ব, হকিংয়ের গবেষণা, রামচন্দ্রের কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কার, ইত্যাদি তথ্য। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা সবেমাত্র হাইস্কুল পাশ করেছে, কেউই আঠারো বছরের উপরে নয়; নতুন কিছু শোনার জন্য তাদের প্রবল আগ্রহ। তারা আমার পাণ্ডিত্যের আস্ফালন খেয়াল

করেনি, কারণটা এখন বুঝি, ভবিষ্যতে নিজেদের ব্যবহারের জন্য তারা আমার পদ্ধতিটি শিখে নিচ্ছিল। শ্রোতারা, আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন, তরুণ-তরুণীদের সমাবেশে বাতাস কামনা আর রোমাঞ্চে সিক্ত হয়। আমার ছোট স্কুলটিতে সে একই বাতাস ঢেউ খেলে। সে বাতাসে মেয়েদের ওড়না পতপত করে ওড়ে, ছেলেদের শার্টের কলার কাঁপে। স্পাইক করেও তাদের চুল খাড়া রাখা যায় না। সে বাতাসে দাঁড়িয়ে আমি বসে থাকা ছেলেমেয়েগুলোকে ভাল করে খেয়াল করি। তাদের অল্প কয়েকজনই শুধু আমার দীর্ঘ-প্যাঁচানো বক্তৃ তার তাল ধরে রাখতে সক্ষম হয়। একটি মাত্র মেয়ে আমার সব কথা বোঝে আর সব প্রশ্নের উত্তর দেয়।

সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী। আমি খেয়াল করেছি, আমি যা শেখাতাম, সে তা তার সহপাঠীদের শেখাত। তার মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। তাকে দেখে মনে হত, মানুষের উচিত মানুষকে সাহায্য করা। তার কাছ থেকে পড়া বুঝে নেয়ার সময় ছেলে তিনটার মুখ দেখে মনে হত, তারা বলছে, 'তুমি আমাদের চেয়ে এত ব্যতিক্রম এত উদার আর এত সদয় যে, আমরা তোমাকে কামনা করি না, জাগরণেতো নয়ই, স্বপ্নেও না।' মেয়ে চারটির মনের ভাষা আরও পরিষ্কার : 'তুমি আমাদের চেয়ে এত উদার এত সদয় আর এত ব্যতিক্রম যে, আমরা তোমাকে ঈর্ষা করি না। ঈশ্বর তোমাকে যা দিয়েছেন, আমাদের তা দেননি। মেয়েরা মেয়েদের মধ্যে যে-সব জিনিস ঈর্ষা করে, তোমার প্রতি ঈশ্বরের দান সে-সব জিনিসের মধ্যে পড়ে না।'

আমি বোর্ডে অংক লিখে তাদেরকে তা সমাধান করতে বলি, আর গোপনে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকি। সে জানে না, আমি তাকে দেখছি, কারণ সে একমনে অংক করে। কিন্তু আমার নিরীক্ষণ বেশি দিন গোপন থাকে না। এক দিন সে আমাকে ধরে ফেলে। হতবিহ্বল হয়ে সে আমার দিকে দু'চোখ তুলে ধরে। আর সহসা কী যেন বেদনা তার চোখ দু'টি ভারী করে। তারপর সে তার চোখ দু'টি আমার উপর থেকে সরিয়ে নেয়। যেন ওরা আমাকে তিরস্কার করে গেল। কিন্তু এর মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেছে। মেয়েটি ইতিমধ্যে আমার ইহজীবন আর পরজীবন কিনে ফেলেছে। একই সাথে বুঝি আমি জন্মগ্রহণ আর মৃত্যুবরণ করলাম। ওই অভিজ্ঞতার জন্য আমি গর্ববোধ করি। আমি জানলাম জন্ম কেমন, মৃত্যু কেমন, যা কেউ জানতে পারে না। পরে, আমার তেত্রিশ বছর বয়সে, শত্রুরা যখন আমার মাথায় বাড়ি দিয়ে দিয়ে আমার মৃত্যু

নিশ্চিত করে, আমি তখন ওই অপরাহ্নটির কথা স্মরণ করে হেসেছি, আর ওদের বলেছি, মারবি? মার। লুনাভা মিনিতো ওর চোখ দু'টি দিয়ে আমাকে বারো বছর আগেই মেরে ফেলেছে। তোদের জন্য কিছু বাকি রাখেনি। দে, আবার বাড়ি দে। এ কথা বলে আমি ওদের দিকে আমার মাথা ঠেলে ধরি। শেষে এক জন আমার বুকে বাড়ি দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত চলাচল বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমার মৃত্যু নিশ্চিত করে। আমি তার বিবরণ যথাস্থানে দিব। এখন লুনাভা মিনিকে পাঠদানের কথায় ফিরে আসি।

পরের লেকচারগুলোতে আমার উন্মাদনা বৃদ্ধি পায়। আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, কারণ আমি চাই লুনাভা মিনিকে মুগ্ধ করতে। তার গতিশীল হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে আমি পরের দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ভেবে নিই। লুনাভা মিনির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আমি তাদের সামনে কথা বলে যাই। কথা বলার জন্য তখন যে শক্তি পেতাম, সে-শক্তি কাজে লাগিয়ে জীবনে যে কোনও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সে সময় ওই নিভৃত মেয়েটি ছাড়া আমার চোখ আর কিছু দেখে না, আর কোনও কিছু আমার ভাবনার মধ্যেও আসে না। যে আকাঙ্ক্ষার জন্য পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়, সে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমি কাজে নেমে পড়ি। দুঃসাহসিক সে কাজের প্রতি স্তরে সফল হব বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম। প্রেমে পড়ার ব্যাপারে আমার ধারণা ভিন্ন ছিল। অথচ কত সহজে তা হয়ে গেল।

অতি দ্রুত আমি আমার পরিশ্রমের ফল পাই : লুনাভা মিনির মনোযোগ; যা আমাকে তার সাথে বেঁধে ফেলে। আর তা এমন এক সময়ে ঘটে, যখন আর কোনও কিছু আমাকে বাঁচাতে পারত না। অবাক করার বিষয় হল, অতি শীঘ্র তাকে নিজের করে পাওয়ার পরিস্থিতি তৈরী হয়। আমার জটিল পাঠদানের আবেদন স্থায়ী না হওয়ায়, ফিরে আসব বলতে বলতে, একে একে আমার ছাত্রছাত্রীরা কেটে পড়ে। এক-একটা অজুহাত দেখিয়ে তারা চলে যায়। ভদ্র যারা তারা সরস মিথ্যার আশ্রয় নেয়। একজন বলে, তার পিতা শহরের অন্য মাথায় নতুন বাড়ি ভাড়া করেছে। আর একজন বলে, তার পড়াশোনা কিছু দিন ব্যাহত হবে, কারণ পাড়ায় নতুন এক দল মাস্তান আস্তানা গাড়াতে, তাকে তার ছোট বোনকে স্কুলে দিয়ে আসতে হয় ও স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হয়। একটি মেয়ে বলে, সে আর পড়বে না, সে তার পিতাকে বলেছে, একটা দোকানদার ছেলে দেখে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতে। প্রায় সবাই বলে, আমি

খুব ভাল শিখাচ্ছিলাম, ব্যক্তিগত সমস্যাদি সমাধান করে তারা শীঘ্রই ফিরে আসবে। তারা কেউ জানত না, আমি চাচ্ছিলাম তারা চলে যাক। তাদের একজনকে আমার একান্তে পাওয়া দরকার ছিল। আরও অবাক করার বিষয়, অচিরেই আমার চাওয়া পূরণ হয়। শেষ পর্যন্ত শুধু লুনাভা মিনি রয়ে যায়।

অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও, শুরুতেই আমি ভাবিনি, লুনাভা মিনিই আমার মানসনারী। আমি যাচাইবাছাই করেছি, চেনাজানা মেয়েদের সাথে তার তুলনা করেছি। আবেগকে দমন করে ভাল করে ভেবে দেখেছি। কিন্তু বেশি দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না। কিছু দিনের মধ্যেই আমার মনের ব্যথা সব কিছু স্পষ্ট করে দেয়। যত ভাবি, তত তার জগতের মধ্যে আমার জীবনের গণ্ডি সীমিত হয়ে আসে। দৃষ্টি যত হ্রস্ব হয়, তত আমি প্রেমের সুখ অনুভব করি। সকালে পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে সূর্য নয়, লুনাভা মিনি আমার জন্য ঘুম থেকে উঠে। দুপুরে আমি আহারের কথা ভুলে যাই। বিকালে সে আমার কাছে অবস্থান করে। সন্ধ্যাবেলা সে আমার অতি-কাঙ্ক্ষিত আহার হয়ে সামনে আসে, মায়ের সাহচর্যে যে আহার গ্রহণ করার জন্য পরিব্রাজক ছেলে পথে একশ বার আহার পরিত্যাগ করেছে। শেষ বর্ষার এক বিকালে পূর্বপুরুষের জানালার বাইরে গাছের পাতায় যে মানবীকে দেখেছিলাম, আমি তাকে তার সাথে মিলিয়ে দেখি। সব কিছু মিলে যায়। সুস্থির উরু; সমতল উদর; উদ্ধত খাড়া পিঠ, বুকের ভার যাকে কখনও কাবু করতে পারে না; মসৃণ জলপ্রপাতের মতো নেমে যাওয়া দু'টি গাল, তাদের গোলাপি রং; স্ফটিক ছোট নাক; কাঠবাদাম চোখ; হালকা ঢেউ খেলানো কণ্ঠাস্থি, চকচকে ত্বক দিয়ে ঢাকা। সে-দিন তার পায়ের পাতা দু'টি দেখিনি। সে-দিন তা গাছের পাতায় ঢেকে রেখে ঈশ্বর আমার বড় উপকার করেছিলেন। সে-দিন যদি তা দেখতাম, তবে সেই পা দু'টির জলপাই ত্বক রসনা দিয়ে সিক্ত না করে এত দিন বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। আমি এক বিন্দু বাড়িয়ে বলতে চাই না। আর তা ছাড়া এই কাহিনী বোঝানোর জন্য আমার অতিরঞ্জনের দরকার নাই। আমি এখন জীবনের অন্য দিকে, আর যে অর্থ দিয়ে আপনারা বাড়ি, গাড়ি, খাদ্য আর সম্ভোগের সুখ কিনেন, সে অর্থ এমনকি আমার পিদিম ধরানোর কাজেও আসে না। সুতরাং আমি কেন মিথ্যা বলব, যখন আমার এই সত্য বিক্রি করার দরকার নাই যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত নারী এসেছে, তাদের আর কারও পায়ের পাতা লুনাভা মিনির পায়ের পাতার মতো এত সুন্দর ছিল না। না,

আমার রুচি বিকৃত ছিল না। জিশুর জন্মদানের আগে ভাল মানুষ ইউসুফ যে দৃষ্টিতে মরিয়মের পায়ে চোখ ফেলে, তার চেয়েও নিষ্কাম দৃষ্টি দিয়ে আমি লুনাভা মিনির পায়ের পাতা দু'টি দেখেছি। আর বিপ্লিত হয়েছি তাদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা দেখে। সেই পা দু'টির দিকে তাকিয়ে মৃত পশু আর পচা ডিমের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছি। আর কামনা করেছি, মানুষ যেন অপাচ্য খাবার ও পানি ঘামের মাধ্যমে বের করে দেয়, স্বর্গের বাসিন্দাদের মতো, যাতে লুনাভা মিনি পরিষ্কার পৃথিবীতে খালি পায়ে হাটতে পারে। আর তাদের অভিশাপ দিয়েছি, যারা রেতপাত করে গোলপাফুলের পাপড়ি ভিজায়। গোলাপ দিয়ে আমি সারা পৃথিবী ঢেকে দিতে চেয়েছি, যাতে লুনাভা মিনি দিগন্তে হেঁটে চাঁদ দেখতে গেলে, পায়ের নীচে গোলাপের ছোঁয়া পায়।

তার দেহ সুন্দর, ভাল কথা। মন কেমন? আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি। পরের দিন সে জানায়, তার ইচ্ছা যাযাবর হয়ে পৃথিবীটা ঘুরে দেখা। এতেই আমার সব জানা হয়ে যায়। আর কী তাকে প্রমাণ করতে হবে? এবার আমি নিজেকে অভিশাপ দিই। আমি খুঁতখুঁতে। আমি খারাপ। আমি এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সন্দেহ করি। জীবনের নারী আমার সামনে, আর আমি তাকে এখনও হৃদয় দিলাম না। এভাবে তা ঘটে যায়। আমি তাকে হৃদয় দিই। আমি তা চিরদিনের জন্য দিই। কারণ, ওভাবেই আমি পরিকল্পনা করেছিলাম, বারো বছর ধরে, সত্যি কথা বলতে কি, একুশ বছর ধরে, কারণ এ ছাড়া ওই একুশ বছর আমার আর কোনও কাজ ছিল না।

ওটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। আর কোনও মানবের নিকট কোনও মানবীকে ঈশ্বর তার মতো করে পরিবেশন করেননি। এত বেশি প্রীতি নিয়ে আর কখনও কোনও মেয়ে কোনও ছেলের সামনে আসেনি। দুই জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এ কথা শপথ করে বলতে পারি, লুনাভা মিনিকে চিনতে পেরে সে-দিন আমার যে অনুভূতি হয়েছিল, তা আমার ইহকাল আর পরকালের সেরা অনুভূতি। কেউ কখনও বুঝতেই পারেনি, তার জন্য আমি কীভাবে অপেক্ষা করে ছিলাম। লুনাভা মিনিও কখনও জানতে পারেনি, তার জন্য আমি কীভাবে অতীত জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড আঙ্গুলের কড়ায় গণনা করেছি। প্রীতি আর উষ্ণতা দিয়ে সে আমার আত্মবিশ্বাস নির্মাণ করে। তাকে চিনতে পেরে আমি আমার প্রবৃত্তির কৃতদাসে পরিণত হই।

তাকে কীভাবে পেলাম, এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। পেয়েছি, তা-ই বড় কথা।

প্রেম নিয়ে এত বেশি দুশ্চিন্তা করার জন্য আফসোস হয় তখন। প্রেমের চিন্তায় বিভোর থেকে জীবনে তখনও কিছু করতে পারিনি।

তবে আর দুশ্চিন্তা নয়। শুধু সুচিন্তা। আমার নারীকেতো আমি পেয়েই গেছি। এখন দরকার ভবিষ্যৎ নির্মাণ। সে সাথে থাকবে। আমি পৃথিবী জয় করব। একটা একটা ইট গেঁথে বৃহৎ অট্টালিকা বানাব। এক রোনা এক রোনা করে জমিয়ে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলব। হিরা দিয়ে তাকে মুড়িয়ে দিব। সোনার থালায় সে আহার করবে, রূপার বিছানায় ঘুমাবে। পান্নার ঘরে গোসল। প্রথম দিন তার জন্য একশটা স্কার্ট আর একশটা জামা কিনব। একশ রঙের একশ রেশমের অন্তর্বাস, যেন সে নরম ত্বকে কোমল পরশের আরাম পায়। একশটা ব্যাগ, একশ জোড়া জুতা। পৃথিবীকে দেখিয়ে দেব, আমার চেয়ে বড় প্রেমিক এ জগতে আর আসেনি। সারা দিন কাজ করব। আর রাতে তার বিছানায় ঘুমাব। আহা। কী সুখ যে আমি অনুভব করি। নিকটতম উপাসনালয়ে গিয়ে আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। পৃথিবীতে আমার বিষণ্নতা কেটে যাওয়ায়, যারা তখনও বিষণ্ন থাকে তাদের জন্য মন খারাপ হয়। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় দেহ আপনাআপনি ন্যুব্জ হয়ে যায়। যতটুকু ভেবেছিলাম, লুনাভা মিনি আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জীবিত করেছে। ওই সময় আমি লুনাভা মিনির পাশাপাশি ঈশ্বরকেও ভালবাসি। আমি আফসোস করি। ঈশ্বর কত পথে তার সৃষ্টির ভালবাসা চায়? সহজতম পথটো ওটাই। সবার মনে প্রেমের সুখ ঢুকিয়ে দেয়া। তারপর কত সহজেই না ঈশ্বরের জন্য মানুষের প্রেমে মহাবিশ্ব কানায় কানায় ভরে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর তা করেন না। আর ঈশ্বরের রহস্যও তখন আমার জানা ছিল না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি নিজের বিষয় ছাড়া অন্যের বিষয় নিয়ে নাক গলাব না। আমি শুধু আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাই। পাদ্রি তার কোঠরে ঘুমায়; আমি রাত জেগে ঈশ্বরের বন্দনা করি। এ সময় লুনাভা মিনির অসংখ্য সত্তা আমাকে ঘিরে রাখে। ঘোর অন্ধকারে তারা বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। লুনাভা মিনির উষ্ণতা আর সুগন্ধ আমাকে জগতের দুশ্চিন্তা থেকে আড়াল করে রাখে। আমি ভালবাসার শক্তি অনুভব করি। অনুভব করি শিহরন আর সাহস, বল আর বীর্য, এমনই তা অদম্য যে, পরবর্তীতে বছরের পর বছর নির্ঘুম কাটানোর পরও আমার জীবনে আর কখনও প্রাণশক্তির অভাব ঘটেনি।

১৮

রক্তমাংসের শরীরে তাকে পাওয়ার পর তার প্রতি আমার কৌতূহল লাফ দিয়ে বাড়ে। তাকে দেখে আমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়; আমার জানতে ইচ্ছে করে, ফুলের দৃশ্য, বস্তু বা মানুষের স্পর্শ, শীতের কুঞ্চন বা গরমের ভাপ তার দেহ-মনে কী অনুভূতি জাগায়। জানতে ইচ্ছে করে, ভালবাসায় সে কাউকে আলিঙ্গন করার কথা ভেবেছে কি না, বিশেষ করে কোন প্রেমিকের আলিঙ্গন। আমি জানি, আমার সব কৌতূহল এক দিনে মিটবে না। কাজেই আমি শুধু তাকে দেখি। দেখি অনেক কিছু : তার নিপুণ শরীর, শিরা-উপশিরা, রক্ত প্রবাহ, উচ্চতা, ব্যাপ্তি, চোখের মণি, হাতের তালু, পায়ের আঙ্গুল, গ্রীবা, সব কিছু, এমনকি পোশাকে আবৃত কোনও অংশ বাদ যায় না, বরং তা আরও গভীরভাবে দেখি, কল্পনায় যা জাজ্বল্যমান : বুক, বাহুমূল, পাঁজরের উতরাই, পিঠের চড়াই, কোমরের ঢেউ, গোলাপের অংকুর, পেটের নিচের উষ্ণ বাঁক, গোলাপের পীবর পাপড়ি, প্রজাপতির জীবন আর কামনার প্রবাহ, পেশী আর হাড়ের স্তম্ভ, যা তার দাঁড়ানোর অবলম্বন, যা আমার মনের শক্তির উৎস। আমি সন্তুষ্ট হই, কারণ আমার নারী সুন্দরী।

আমার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ। প্রতিটি চাহনি ছিল আপন পুরুষের প্রতি নারীর চাহনি। মনে হয়, শুধু একটি বার বলার অপেক্ষা। তারপর সে আমার হবে। এর অন্যথা হওয়ার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাই না। এ যাবৎ সব কিছু আমার মনের মতো হয়েছে। আমার কথা সে মনোযোগ দিয়ে শুনে, আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। তার গলায় আমি প্রণয়ের সুর শুনি। নিরানন্দ দুনিয়ায় আমার সুখী হওয়ার জন্য আর কিছুর দরকার ছিল না। একে একে আমার সব ছাত্রছাত্রী চলে যায়। আর যখন কেউ রইল না তখন সে আমাকে তার বাড়ি গিয়ে পড়াতে বলে।

জীবনে আর কোনও কিছুতে এত খুশি হইনি। বার বার ভেবেছি, সে আমাকে এক দিন তার বাড়ি যেতে বলবে। কল্পনায় আমি তার বাড়ির বসার ঘর, আসবাবপত্র, পড়ার টেবিল, সব কিছু দেখতে পেতাম, এমনকি তার খুলে রাখা পোশাকও। এখন তা আর কল্পনা নয়, এখন সব কিছু বাস্তব, এখন তার

লুটানো পোশাকের ওম, তার বুকের উত্তাপ, সরাসরি চোখের কাছে নাকের কাছে চলে আসবে। কামনার লোভে আমার শরীরে রক্তস্রোতের গতি বেড়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়েচড়ে বসে।

মনের এই উচ্ছ্বাস আমি গোপন করি। নানান ওজর দেখাই। সে কোনও ওজর শুনতে চায় না। কর্তৃত্বের সুরে সে বলে, তাকে আমার পড়াতে হবে। খুশিতে আমার মন ভরে যায়। ভাবি কয়টা দিন শুধু পড়াশোনার ভান করা। তারপর একাকি তার সাথে মন খুলে কথা বলব। আর এভাবে জীবনের পথে আমাদের দু'জনের একক যাত্রা শুরু হবে, চিরদিনের জন্য।

প্রথম দিন সে পাড়ার মাথায় এসে আমার জন্য অপেক্ষা করে। তাকে রাস্তায় পেয়ে জীবনের সব কিছু পেয়ে যাই। শত ভাবনার প্রভাব আমার দেহে। শিহরণ আর শিহরণ। সে আমার জন্য এসেছে। আমাকে নিজের করে পেতে সে আমার চেয়ে বেশি তৎপর। আমি দেখি আমার আবির্ভাবে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়, দুই গাল কেঁপে উঠে। কী যে আপন লাগে তাকে। ধৈর্য ধরে সে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, একাকি রাস্তায়। বুঝি চাইলে এখনই আমি তাকে আলিঙ্গন করতে পারি। প্রেমের সুখ আমাকে তরল করে। মুখে আমি কিছু বলতে পারি না। সুখে দম বন্ধ হয়ে আসে যখন সে আমার গা ঘেঁষে হাঁটে। আমার শরীরের সাথে লেগেও সে লাগে না। মনে হয় তার জাদুর শরীর। তুলার মতো কিছু একটা আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, আর আমাকে তুলা বানিয়ে ফেলে। আমি বুঝতে পারি না, কোথায় আমার ৭২ কেজি উড়ে চলে গেল। যদি হালকা ঘাম না হত, আমি যে দেহধারী প্রাণি, তা-ই বুঝতে পারতমা না। আহা শীতের ভিতর ঘাম। কিসের প্রভাবে? নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য আমি তাকে কিছু বিরক্তিকর প্রশ্ন করি। সে তার স্বতঃস্ফূর্ত জবাব দেয়। প্রেমিকার সাথে প্রথম দিন পথ চলার সময় কী কথা বাল উচিত, আমার তা জানা ছিল না। এক সময় তাই বলে ফেলি :

"এ পাড়ায় কি রাস্তার কোনায় বাজে ছেলেদের আড্ডা বসে?"

প্রেমে পড়ার পর থেকে পাড়ার মাস্তান, নারীর প্রতি অপমান, সড়ক-দুর্ঘটনা, ছিনতাই, আর ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হতে থাকে। লোটাসের স্মৃতি মুছে যাওয়ার পর কখনও ভাবিনি, জীবনের এসব ছোটখাট সমস্যা আমাকে আবারও বিচলিত করবে।

আমার কথা শুনে সে হোঁচট খায়। "কি বললেন?" সে বলে। "আমাদের

সাতজন বড় ভাই আছে যারা কখনও বাড়ি যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি তাদের দেখা পাবেন।"

মনে পড়ে, কত স্নেহভরে সে সতীর্থদের পড়াত। এখন দেখি, পাড়ার মাস্তানদেরকেও সে স্নেহ করে। আর সেটা ছিল চিরন্তন নারীর স্নেহ, যা আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, যার জন্য আমার জন্ম হয়, যার জন্য আমি পুরুষ; আমি না চেয়েছি রাষ্ট্রপতি হতে, না অফিসার, না চেয়েছি নোবেল প্রাইজ, না কোনও মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিতে। আমি চেয়েছি শুধু নারীর প্রেম। সে নারী আমার পাশে। সে বলে :

"আমি সকাল পর্যন্ত তাদের হাসির আওয়াজ শুনি।"

তার কথা আমার ধুকধুক করা বুককে জোরে একটা ধাক্কা দেয়। আতশবাজির মতো তার চোখ থেকে স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলে। চোখ দিয়ে সে কথা বলে : *তোমার হাত দু'টি বাড়াও, আমাকে শক্ত করে ধরো। এ জায়গা থেকে দূরে কোথাও আমাকে নিয়ে যাও। আর কখনও আমি এখানে আসতে চাই না।*

তরুণীর অবোধ্য জগত। শুধু বুঝি, ডাকাতে ভরা পৃথিবী। আর বুঝি, আমার হৃদয়ে লুনাভা মিনির জন্য ভালবাসা। আমার এক আহাম্মক প্রশ্নের জবাবে সে আমাকে তিন-তিনটা ভিন্ন অনুভূতির স্বাদ দেয়। শেষেরটা ভয়ানক : ঈর্ষা। সে প্রেমের সন্ধানে আছে। পূর্বরাগে ভরা তার রাত-জাগার কথা ভাবি। তার চোখের স্ফুলিঙ্গ আমার হৃৎপিন্ডের অনেকখানি এর মধ্যে ঝলসে দিয়েছে, এমনকি ফুসফুস, ট্রাকিয়া, লিভারসহ আশপাশের প্রত্যঙ্গগুলোতেও স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। মাস্তানদের সম্বন্ধে তার অসচেতনতা দেখে লোটাসের মৃত্যুর কথা মনে আসে। মাত্র পাঁচ জন মাস্তান মিলে লোটাসকে খেয়ে ফেলেছে। সাত জন মাস্তান কী না করতে পারে? অসার আমি, জমিদার স্বিদ্রিগাইলভের মতো লুনাভা মিনিকে অনুসরণ করি।

আহা! লুনাভা মিনির বাড়ি। জীবনে বহু জায়গায় গিয়েছি। বছর কয়েক পর এক রাজার মেয়েকে বিয়ে করে অনেক রাজার অন্দরমহলে ঢুকেছি। নামি-দামি ইমারত, ঐতিহাসিক স্থাপনা, পবিত্র কি অপবিত্র অবস্থায় বিভিন্ন উপাসনালয় ও তীর্থস্থান, আর পৃথিবীর সব বিখ্যাত জাদুঘরে গেছি। সিসটিন চ্যাপেলে বমি করেছি, আলহামরাতে কুলি। সাদা মরুভূমিতে ডায়রিয়ার আর ফালাসারনা বালুচরে প্রশ্রাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছি। কিন্তু লুনাভা মিনির বাড়ির

মতো এমন আগ্রহ নিয়ে, সুখে এমন অবশ হয়ে, জীবনে আর কোথাও কখনও ঢুকিনি।

ঢুকে অবশ্য হতাশই হলাম। কারণ বাড়িতে ঢোকার সময় কেউ আমার প্রেমিকাকে কুর্নিশ করেনি। দুইজন পরিচারিকা এসে তার পোশাক ধরে টানাটানি করেনি। শরবতের গেলাশ হাতে নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে নাই। সে যে ওই পৃথিবীর রানী নয়, তা আমি কোনও দিনই মানতে পারিনি।

ছিমছাম ঘর, উদ্ধত শহরের বিনয়ী আবাস। বৈঠকখানায় অনেক আসবাবপত্রের মাঝে পিয়ানোর স্থানটা বড় সঙ্কুচিত। আমার মনে সেই ব্যথা জাগে, যেই ব্যাথা জাগে অসহায় পিতার মনে, যে পিতা রাগ করে বাড়ি ছাড়া মেয়েকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ক্ষুধা, আর মাস্তানদের মাঝে লাঞ্ছিত-নিপীড়িত অবস্থায় খুঁজে পায়। হাত দিয়ে চেপে অশ্রু থামাই, তারপরও কয়েক ফোঁটা বের হয়ে যায়। লুনাভা মিনির মা যেন পুরনো জিনিসপত্রের দোকান খুলে দাঁড়িয়ে আছে, যে দোকানে বেচার কিছু নাই। লুনাভা মিনির পিতা বাড়ি নাই। একটা ঘর থেকে তার বোনদের খেলার আওয়াজ ভেসে আসে। আমি লুনাভা মিনির দেহের কাছাকাছি থাকার সুখ অনুভব করি। আর ভাবি, এই ভাল। কল্পনা করে করে আমি বখে গেছি। এখন থেকে কল্পনা কম করব। বাস্তবে ঢুকে যাই আমি। লুনাভা মিনির বাসস্থানকে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে আদর্শ জায়গা, যেখানে অর্থের দাপট নাই, আছে শুধু শান্তি আর শান্তি। শান্তির ধারা আমার মাথা থেমে বুক বেয়ে পায়ের দিকে নামে। আমি বুক ভরে শ্বাস নিই। লুনাভা মিনি বোধি লাভের উপকরণ ছড়ায়। আমি নিশ্চিত হয়ে যাই, লুনাভা মিনির গায়ের বাতাস যার গায়ে লেগেছে, সে কখনও বটগাছের নিচে না খেয়ে, না দেয়ে, শান্তি খুঁজে দেহকে কংকাল বানাবে না। গৌতম বুদ্ধের প্রতি আমার করুণা হয়।

আমি লুনাভা মিনির ঘরে ঢুকি। সে আমাকে একটা কাঠের চেয়ার এগিয়ে দেয়। যার সামনে ছোট্ট একটা টেবিল। বইখাতার পাশাপাশি কিছু মেয়েলি জিনিস : মাথার ক্লিপ, হাতের ব্যান্ড, কলমদানি, মরা রজনীগন্ধ্যা। কালো একটা ড্রেসিং টেবিল, লম্বা একটি আয়না, একটি ওয়াড্রোব আর একটি পরিপাটি বিছানা। আমি কোনও কিছু থেকে চোখ ফিরাতে পারি না।

আমার ত্বকে শান্তির পরশ। বুঝি আমি অমর হয়ে গেলাম। অন্তত পাঁচ-ছয়শ বছরতো বেঁচে থাকব। তত দিন লুনাভা মিনি বেঁচে থাকবেতো? ও আমাকে যত দীর্ঘ জীবন দিল, তত দীর্ঘ জীবন কি আমি ওকে দিতে পারব?

যদি না পারি তবে কী করে আমি লুনাভা মিনি মরে গেলে একা একা বেঁচে থাকব? তবে আমি এটাও বুঝি আমার এই অমরত্ব শুধু এই ঘরে। বাইরে গেলে আমি মরে যাব। ক্ষণিকের জন্য আমার মৃত্যুভয় তখন চলে গিয়েছিল। আমি হিসাব করে দেখেছি লুনাভা মিনির ঘরে কাঠের চেয়ারে বসে যে আরাম আমি পেয়েছিলাম তার দাম একটি-দুটি মৃত্যু দিয়ে পরিশোধ করা যায় না। হাজার হাজার মৃত্যু দিলেও তার দাম পরিশোধ হয় না। আমি মনে মনে বলি, আহা কী আরাম। কী শান্তি। আর অনুভব করি আমার ত্বক আরাম শুষে নেয়। সুখের পরশ আমার কলিজা ঠাণ্ডা করে। আমি অনুভব করি রক্তপ্রবাহের সুখ। আর ভাবি লুনাভা মিনির ঘর কী অসম্ভবই না সম্ভব করতে পারে। জীবনে যে একবার লুনাভা মিনির ঘরে প্রবেশে করেছে, সে আর সন্ত্রাস করবে না। সে কাউকে গালি দিবে না। টুইন টাওয়ার উড়াতে যাবে না আর নিজেকেও উড়িয়ে দিবে না। নিজের জীবনের থেকে দেশ, ধর্ম, হঠকারিতা কোনও কিছু তার কাছে বেশি মূল্যবান মনে হবে না। লুনাভা মিনির ঘরে বসে আমি নিশ্চিত হই, এক লুনাভা মিনিকে দিয়েই জগতের সব অশান্তি দূর করা যায়। দরকার শুধু যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রপতি, মূর্খ রাজা আর পশুর মতো নিষ্পাপ সন্ত্রাসী আর পাদ্রিদের একবার লুনাভা মিনির গায়ের বাতাস দিয়ে গোসল করানো। টেনেহিঁচড়ে তাদের ধরে এনে এ ঘরে পাঁচ মিনিট বসিয়ে রাখা। তা হলেই সাত মহাদেশ আর পাঁচ মহাসাগরে শান্তি ফিরে আসবে। গোলাগুলি বন্ধ হবে। চুরি-ছিনতাই হবে না। জাল-কবলা বন্ধ হবে। শত শত লাশ নিয়ে ডুবো জাহাজগুলিকে আর সাগরের পিঠে ভেসে উঠতে দেখা যাবে না। এ ঘরে ঢুকালে গোলআলুর চামড়া আর কাটার দরকার হবে না। এ ঘরে ঢুকানো মাংস চড়ানোর আগে মজে যাবে। এ ঘরের শান্তি দিয়ে শুধু পারমাণবিক বোমার সংখ্যা নয়, ছুরি-কাঁচির সংখ্যাও অনেক কমানো সম্ভব। দরকার শুধু লুনাভা মিনির ঘরের শান্তি পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া।

লুনাভা মিনি আমাকে তার বিছানার কথা বলে। জিজ্ঞেস করে, আমি আন্দাজ করতে পারি কি না, যে খাটে সে ঘুমায় সে খাটের বয়স কত?

"এটার উপর আমার জন্ম হয়।" খাটটি দেখিয়ে লুনাভা মিনি বলে।

এই ছোট্ট একটা বাক্যে আমি লুনাভা মিনির ফেলে আসা প্রতিটি সেকেন্ড আর মিনিট খুঁজে পাই। আমারও ও রকমই মনে হয়েছিল। তার কথা শুনে আমি বুঝেছিলাম, খাটটি সব কিছু দেখেছে, সব কিছু জানে। ১৮ বছর আগের

এক জানুয়ারির ২৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করা নারী শিশু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। তার মুখের গোলাপী রঙ, বাতাসে তার হাত-পা ছোঁড়া, মাথার লাল চুল, তার চোখ, তার কান্না। সবচেয়ে অনাকর্ষণীয় যা দেখি, তা হল তার নাড়ি। আর বেশি কিছু আমি দেখি না; গোসলের পানি দিয়ে পুষ্ট হয়ে ১৭ বছর ১১ মাস ২১ দিন পর যে ফুল ফুটবে, তা দেখার আনন্দ কুঁড়ি দেখে হারাতে চাই না।

জানালা দিয়ে বিকালের আলো ঘরে ঢোকে, জানালার বাইরে সিনকোনা আর মিনজিরি গাছ। নিরালা ঘরটিতে আমার বাস করতে ইচ্ছে করে। যেখানে বসেছি সেখানে অনন্তকাল বসে থাকা যায়। লুনাভা মিনির ছোট ঘর, সে ঘরে তার ঘুম, তার জাগরণ, তার সুখ আর অভিমানের প্রতিটি মুহূর্ত, তার প্রাত্যহিক জীবন, অলস আর কর্মব্যস্ত সময়, গোসল করে ভিজা চুলে এসে বুকে জড়ানো তোয়ালাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ানো। কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, গোলাপী শিশুটি এই খাটটির উপর শুয়ে কেঁদেছে, এই ঘরটিতে বড় হয়েছে, এতগুলো বছর কাটিয়েছে, শিশু থেকে নারী হয়ে ফুটেছে; তার রজস্রোতে তোশক ভিজে গেছে। পৃথিবীর কোথায় গেলে সে তোশক এখন পাওয়া যাবে? ঘরটির এক ইঞ্চি জায়গা নাই, যেখানে তার খালি পায়ের ছাপ নাই। বড় বড় দুইটি হলুদ ফুল তোলা সাদা বিছানার চাদর। সে চাদরের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত তার বুকের ঘষা লেগে আছে। সুগন্ধি চাদরটি আমি গালে মাখতে চাই। আর চাই ঘরটিতে গড়াগড়ি খেতে। বাস্তব জীবনকে ধিক্কার দিই। বাস্তব জীবনের চেয়ে বাজে জিনিস আর কিছু নাই। আমি শুধু লুনাভা মিনিকে চাই। এই ঘরটিতে তার সাথে বসে থাকতে চাই, এক এক মুহূর্ত করে, অনন্তকাল। আর তা করতে পারলে, আমরা কেউ মরব না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই; তার কাছে আর কখনও কিছু না চাওয়ার প্রতিজ্ঞা করি।

মনের আলোড়ন ঢাকা দিয়ে আমি শিক্ষকতার ভান করি। প্রতি দিন সে আমাকে অনেক দূর এগিয়ে দেয়। আমরা মাস্তানগুলো পার হয়ে আসি। কীভাবে সে তাদের পাশ কাটিয়ে বাসায় যাবে, তা ভেবে উদ্বিগ্ন হই। আর এ জন্য পরবর্তী দিন তাকে না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাই না। তবে এটা এমন কোনও বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল না। বছরের পর বছর মাস্তানগুলি রাস্তার মাথায় আড্ডা মেরে চলেছে। কখনও লুনাভা মিনির কোনও ক্ষতি করেনি। আসলে কোনও মাস্তানের

হাত লুনাভা মিনির দিকে বাড়ানোরই কথা না। কাজেই আমি কিছুটা নিশ্চিন্তে তার সাথে পরের দিন দেখা করতে যাই। আর যত তার কাছে যাই, তত সুখ পাই। তত অতীতের কথা ভাবি, ভাবি আমার সাধনার পুরস্কার : লুনাভা মিনি। তার জন্য আমি বাস্তববাদী, নারীবাদী আর কামুককে অভিসম্পাত করেছি; পাগল, ছেনাল আর সর্বহারাকে নিরীক্ষা করেছি; আর মেহন করে শরীর ক্ষয় করার জন্য অনুশোচনা করেছি। ঈশ্বরের নিকটা নিরন্তর কৃতজ্ঞতা জানাই। লুনাভা মিনিকে ছাড়া জীবনের আর এক মুহূর্তও টেনে নেয়া সম্ভব ছিল না।

১৯

মাসখানেক ধরে প্রতিদিন সেখানে যাই। প্রতিদিন নতুন কিছু করে লুনাভা মিনিকে আমার মনের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করি। যে কৌশলে এগুলে আপনাআপনি প্রেম হয়ে যাওয়ার কথা, সে কৌশলে এগিয়ে যাই। আমি দরজায় টোকা দিই। সে দরজা খুলে দেয়। আমি হাসি। সে হাসে।

"কেমন আছো?"

"ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন।"

আমি আমার চেয়ারে বসি। সে তার চেয়ারে বসে। আমি তার হাতের পশম খুঁজি, তার বুকের উত্থান দেখি। বোঁটার ইশারা দেখে বুকে ঢেউয়ের উষ্ণতা আর মুখে লিপ্সার আর্দ্রতা অনুভব করি। ঠোঁটের কমনীয়তা দেখে নিজের ঠোঁট ভিজাই। সে জ্বলজ্বল চোখে আমার দিকে তাকায়। সে বলে আমার শার্টের রঙ বাদামি না হয়ে ধূসর হলে ভাল হত, কিংবা আমি গণিত না পড়ে আরও কঠিন বিষয় যেমন পদার্থবিজ্ঞান বা অণুজীববিজ্ঞান পড়লে সঠিক কাজ হত। আমি কিছু বলার জন্য নিশপিশ করি। শেষ পর্যন্ত কথা খুঁজে না পেয়ে বলি, "শুনেছো? দোনালি এলাকায় গাড়ি উল্টে আবার সাত জন মারা গেছে।"

সে বলে, "শুনেছেন? ওই যে মেয়েটার কথা বলেছিলাম, সে ফ্রান্সে গিয়েছে, বৃত্তি নিয়ে।"

বৃত্তি পাওয়া মেয়ের প্রতি আমার কোনও আগ্রহ নাই।

"আস, শুরু করি।"

"প্লিজ।"

"বিন্যাস আর সমাবেশ, খুব কঠিন। ভীষণ কঠিন। তাতে কী হয়েছে? আমিতো আছি। এইসব কঠিন বিষয় বোঝার সহজ পথ আমার জানা আছে।"

দশ-বারো মিনিট বক্তব্য দেয়ার পর, যেখানে আসলে পাঠ ছিল দুই কি তিন মিনিটের, আমি বলি :

"তুমি খুব সুন্দর।"

সে বলে, "ঠিক আছে, আমি সুন্দর। এখন বিন্যাস আর সমাবেশ, প্লিজ।"

সে আমাকে অধ্যয়নের দিকে টানে। আমার তা সহ্য হয় না। আমি তাকে সহবাসের দিটে টানি। সে পাথরের ওজন ধারণ করে যাতে এক চুলও নড়তে না হয়। জানি এমন কঠিন জিনিসে দংশন করলে দাঁত ভেঙ্গে যাবে, তবু আমার তখন ইচ্ছে করে তার গলায় কামড় বসিয়ে দিতে, দেখার জন্য লুনাভা মিনি কী দিয়ে তৈরি। ততক্ষণে আমার মুখের বাহির এবং ভিতর দুই অঞ্চলই শুকিয়ে বালুচর হয়ে গেছে। কথা বলার জন্য মুখ খুলি। শুকনো জিব নড়ার সাথে সাথে খসখস করে উঠে। বুঝুন কেমন কর্কশ তখন আমার কণ্ঠ। বাধ্য হয়ে আমি বলি :

"বিন্যাস 'ক্রম' হিসাব করে, সমাবেশ তা করে না।"

আমি নিশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করি। পড়ানোতে মনোযোগ দিই। পড়ানো শেষ হলে বলি, "কখন আবার আমরা মিলিত হচ্ছি?"

"বুধবার।"

আমি আহাম্মকের মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকি। তাতেও কাজ হয় না। আমার গা জ্বলে। আমি ঘাড়ের উপর ঘাম অনুভব করি।

একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনায় কোথায় কত হোমরাচোমরা মারা গেছে, এ কথা বার বার বলে লুনাভা মিনিকে বিরক্ত করার জন্য পরে আমি অনেক আফসোস করেছি। আমার মনে দুরভিসন্ধি ছিল, ফলে আমি নতুন কোনও কথা খুঁজে পেতাম না। লুনাভা মিনির মনে কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না, ফলে প্রতিদিন সে নতুন কিছু বলতে পারত। আমি ভাবতাম, আগে প্রেম হোক, তারপর সব কথা বলা যাবে।

আমরা অনেক কথা বলি বটে। তার কিছু কিছু রোমান্টিকও ছিল। কিন্তু প্রেমের অনুমোদন ছাড়া সে-সব কথা অর্থহীন মনে হত। ভাবি, প্রেম হয়ে

গেলে সে-সব অন্তরঙ্গ কথা কত মধুর হবে। সে-সময় প্রেমের শপথের নিচে বসে লুনাভা মিনির সাথে নিরন্তর কথা বলে যাওয়া আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পরিকল্পনা ছিল আমরা কয়েক বছর শুধু কথা বলে পার করব। মানে লুনাভা মিনি বলবে আর আমি শুনব। অন্তত দুই বছর প্রাণ ভরে লুনাভা মিনির মুখের কথা শুনে তারপর প্রথমবারের মতো তার হাত ধরব আর তার কব্জিতে রোমহর্ষ দেখব। দুই বছর মনে মনে সময় দিয়ে থাকলেও সেই রোমহর্ষ দেখার জন্য আসলে আমি একদিনও অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

তারপরও আরও কিছু দিন যায়। আমার দেহ ঘিরে থাকা অধৈর্যের শিখা লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ে। মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই শিখায় কাঁচা বাঁশ পুড়ে ফটাশ ফটাশ শব্দ করছে, খড়ের ঘর ধ্বসে যাচ্ছে, গাছের পাতা উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি সে আগুনে কোনও মতে টিকে থাকি। আমি ভাবতে বাধ্য হই। আমি লুনাভ মিনির অজান্তে তাকে ভালবেসেছি। সে তার কিছুই জানে না। এক বার হঠাৎ আমার বুক চিপে : কারণ আমার মনে হয় কী হবে যদি সে রাজি না হয়। আমার জীবনে এ যাবৎ এমন কিছু আসেনি, যার সাফল্য-ব্যর্থতায় আমার কিছু এসে যেত। কিন্তু লুনাভা মিনির বিষয়টা ভিন্ন। তার উপর আমার জীবনের সব কিছু নির্ভর করছে। সে রাজি হবে কি হবে না, এ কথা কল্পনা করাই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে রাজি হবে। এই বিশ্বাসকে আমি আমার বাপের তালুক মনে করেছি। কারণ আমার জন্য প্রেমতো আর পাঁচটা ছেলের প্রেমের মতো ছেলেখেলা ছিল না।

দুশ্চিন্তায় আমি নিজেকে সেই বানর হিসাবে দেখতে পাই যে এক পিছলায় গাছের আগা থেকে গোড়ায় পড়ে চার পা ভেঙ্গেছে। এই পতনে একটা বোধের উদয় হয়। আমি ভেবেছিলাম আমার মনে লুনাভা মিনির জন্য যে প্রেম, জগতে তার চেয়ে শক্তিশালী কিছু নাই। কিন্তু আমি কী আবিষ্কার করলাম জানেন? আমি আমার মধ্যে লুনাভা মিনির জন্য যে প্রেম তার চেয়েও শক্তিশালী একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। আপনারা জানেন লুনাভা মিনির জন্য আমার প্রেম কেমন। যদি আমি দেখি তার চেয়েও শক্তিশালী কিছু আমার মধ্যে আছে, তা হলে আমার সে অহঙ্কার কোথায় যায়? আমার দুই চোখ ফেটে পানি পড়ে। যেন অশ্রু নয়, ওটা ছিল আমার অহংকারের পতন। অথচ ঘৃণাভরে আমার আবিষ্কার আমি প্রত্যাখ্যানও করতে পারছিলাম না। কারণ তা জে সত্যি তা-ই ক্ষণে ক্ষণে প্রমাণিত হচ্ছিল।

আমার মনের প্রেমের চেয়ে আমার মনের নেতিবাচক চিন্তাগুলি অধিকতর শক্তিশালী এ কথা আমি মানতে পারছিলাম না। লুনাভা মিনি রাজি হবে না, আমার মাথায় ঘুরেফিরে এই চিন্তাটাই আসছিল। বার বার মনে হচ্ছিল আমি কিছু একটা ভুল করেছি। নিজেকে দুই হাত দিয়ে মাথার উপর তুলে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলতে ইচ্ছে করে যখন ভাবি এসব কিছু আগে ভাবিনি কেন। এসব কথাতো আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। আসলে জীবনে কখনও ভাবিনি, আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ব, আর সে মেয়ে আমার প্রেমে পড়বে না। নিরন্তর উদ্বেগে আমার শরীর গরম হয়ে যায়। ইচ্ছে করে লুনাভা মিনির চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলি। হাত-ঠ্যাং লুলা করে দিই। মরিচ ঘষে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলির মাথা জ্বালিয়ে দিই, যাতে কোনও দিন মিলনের সুখ না পায়। কিন্তু সেতো তখন আমার সামনে নাই। আর থাকলেই বা এমন কিছু করা কি সম্ভব? আমার গা পুড়তে থাকে। নিজের মধ্যে কোনও যুক্তি কাজ করে না। অস্থিরতা-রোগ আমাকে বলতে থাকে :

তুমি অনেক ধৈর্য ধরেছ। এখন তুমি তোমার স্বপ্নের নারীর সাথে প্রেমের আলোচনা শুরু কর। তাকে রাজি করাও। প্রতিদিন তাকে আলিঙ্গন কর।

অস্থিরতা আমাকে সামনে ঠেলে দেয়। ফলে আমি অনেক ভুল করি। প্রেমের জন্য আমার প্রস্তুতি ছিল, লুকোচুরি খেলার জন্য কোনও প্রস্তুতি ছিল না। আমাদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্বের আর প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ বন্ধুত্ব আমি ঘৃণা করি। প্রেমের স্বীকৃতি ছাড়া আমি লুনাভা মিনির সাথে মনোজ্ঞ কিছু আলোচনা করতে পারি না। আর তা কী করে সম্ভব, যখন আমি প্রেমের এত গভীরে ডুবে গেছি? আমি তার মুখের প্রতিটি শব্দ বিশ্লেষণ করি। আমি চাই তার হৃদয় থেকে একই অনুভূতি নিংড়ে বের করে আনতে। হয়তো সে অনুভূতি তার ভেতর সিদ্ধ হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না। বোঝার জন্য আমি সহপাঠীদের কাছে যাই। তারা বলে, "মেয়েদের পটানোর চেয়ে সহজ কিছু আছে নাকি?" তাদের কথা শুনে আমি লজ্জা পাই। চিন্তা করি, কারও সাহায্যে নয়, নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করব।

অথচ আমার সমস্যার বীজ অন্য জায়গায় বোনা ছিল। আর তা এত দিন ধরতে না পারা প্রমাণ করে আমি কত বড় মূর্খ ছিলাম। আমি বুঝি কেবল মূর্খরাই অসচেতনভাবে দিবাস্বপ্ন দেখে। যখন বুঝি তখন আমার আর কিছু করার ছিল না, দিবা স্বপ্ন দেখে যাওয়া ছাড়া। তাই আমি বার বার ফেল করি।

যে জিনিস সবার আগে চোখে পড়া উচিত ছিল, সে জিনিস চোখে পড়ল সবার পরে। হায়রে কপাল। যে মরে তার চোখে মৃত্যু-ফাঁদ পড়ে না। আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আপনার মাথার উপর ভাঙ্গা একটা ইট পড়ে, আর আপনি সেখানে মরে যান। ইলেক্ট্রিক সকেটে তার ঢোকানোর সময় কেউ কেউতো এক ঝাঁকুনিতে শেষ হয়ে যায়। আমারও ভাই তা-ই হয়। মাত্র এক তরঙ্গ বিদ্যুতের আঘাতে আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাই। ঈশ্বরের নির্মম দুনিয়ায় বাকি জীবন আমি সে ছাই দিয়ে রুদেবিশ শেকাব নামে এক উন্মাদের মনুষ্যদেহ পুনর্গঠনের বৃথা চেষ্টা করি। তা ছিল এক দীর্ঘ ও কষ্টকর ব্যর্থ প্রক্রিয়া। কিন্তু এর শুরুটা লুনাভা মিনি নিজ হাতে করেছিল। তবে তারপর সে তাতে আর কখনও হাত লাগায়নি।

কী হয়েছে শুনুন। সে-দিন বিকালবেলা কিছু ছেলেমেয়ে লুনাভা মিনির বাড়ি আসে। তারা তাকে ড্রয়িংরুমে ডেকে নিয়ে যায়। আমি তার ঘরে একা পড়ে থাকি। আমি ভাবতাম, দুনিয়াতে এমন কেউ নাই, যার সাথে কথা বলার জন্য লুনাভা মিনি আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যাবে। আমি ভাবতাম, সে তাদেরকে আমার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলবে।

সে তা করেনি। নিরুপায় হয়ে আমি তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করি। আমি হাতের আঙ্গুলে সময় গুণি; এক, দুই, তিন; বিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ে ষাট পর্যন্ত গুণে ফেলি। তারপর দেয়ালঘড়িতে সময় দেখি। তিন মিনিটের মাথায় মনে হয়, আমার মাথা ছিঁড়ে যাবে। আমি চাই না আমার মাথা ফেটে যাক বা মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ষ-ক্ষরণ ঘটুক। না চাওয়াতে কাজ হয়। কিন্তু লুনাভা মিনি আসে না। লুনাভা মিনি আসে না কেন? অবশেষে সে আসে। পাঁচ মিনিট পরে। ওই পাঁচ মিনিট রাস্তার গাড়িগুলো থেমে থাকে। সমুদ্রের ঢেউ মরে যায়। রাষ্ট্রপতির গলায় মাছের কাঁটা ঢোকে। পৃথিবীর যে যেখানে ছিল সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি মিলনরত নারী-পুরুষের যার যার ঝর্না মাঝ পথে আটকা পড়ে স্ফটিক হয়ে যায়। পশুপাখি আর শিশুরা হত বিহ্বল হয়ে একে অন্যের দিকে চায়, বুঝি কেয়ামত এসে গেল। আর ওই পাঁচ মিনিট আমার কী হল? আমার অনেক দাড়ি পাকে, অনেক চুল সাদা হয়ে যায়। অথচ আমার বয়স কত অল্প। লুনাভা মিনি আসার পর আমি অত্যাচারী পুরুষের মতো বদ আচরণ করি। মমতাভরা চোখে সে আমার দিকে চায়। আমি দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শরীরের কাঁপন থামাই। দাঁতের মাড়ি একটার

সাথে একটা খিঁচে ধরে বুকফাটা আর্তনাদ গিলে ফেলি। আর আমি তাকে আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি ভালবাসি। এত ভালবাসি যে, আমার এর আগে বা পরে আর কখনও লুনাভা মিনিকে জড়িয়ে ধরার এত আকাঙ্ক্ষা হয়নি। লুনাভা মিনি তখন আমার এক বেলার পরিমিত আহার। অথচ আমি তখন এক হাজার বছরের ক্ষুধার্ত দানব। যদি তখন শুধু তার চুলগুলো মুখে পেতাম। না, আমি তা পাইনি। সে সময় আমাদের দু'জনের মাঝে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর মাটি ফুঁড়ে উঠে। সে প্রাচীরের উল্টা দিকে পড়ে গিয়ে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। এবার আর আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। তার অনুতপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কেঁদে ফেলি। কান পেতে তাদের কথাবার্তা থেকে আমি যা আঁচ করেছি, তা বিশ্বাস করার সাহস আমার নাই। সে কথা বিশ্বাস করা মানে আমার ধ্বংস বা মৃত্যু। জীবনে আর কখনও এতটা আশাহত হইনি।

ঈশ্বর! আমরা দুই জন দুই ধর্মের অনুসারী।

২০

ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আমাদের দেশের এমন দু'টি ছেলে মেয়ে কখনও একে অপরকে ভালবাসার সাহস দেখায়নি।

"বিশ্বাস করা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তুমি জান তুমি মৃত্যুবরণ করবে, কাজেই তুমি বিশ্বাসও করবে। কীভাবে তুমি বিশ্বাস কর, সেটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" এটা আমাদের পবিত্রগ্রন্থের বাণী।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মানুষ সে সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু আমরা ভিন্ন ছিলাম। প্রেম-ভালবাসা-বিয়ে সংক্রান্ত স্ব-স্ব ধর্মীয় নির্দেশগুলো আমরা মেনে চলতাম। এ ব্যাপারে আমাদের পবিত্রগ্রন্থ ছিল সবচেয়ে কঠোর। তাতে বলা হয়েছে, ভিন্ন ধর্মের অনুসারীকে বিয়ে করা, নিজের মা'কে বিয়ে করার চেয়ে খারাপ।

"আপনাদের মধ্যে কে মা'কে বিয়ে করতে চান?" আমাদের পাদ্রিরা

সাপ্তাহিক ধর্মীয় সমাবেশেগুলোতে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতাকে জিজ্ঞেস করতেন।

জনতা চিৎকার করে বলতেন, "কেউ না, কেউ না। আমরা কখনও তা চাই না। কখনও না, কখনও না। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।"

"তা হলে বিধর্মীকে বিয়ে করবেন না।"

পাদ্রিরা এই নিষেধাজ্ঞার উপর বিস্তারিত আলোচনা করতেন। লুনাভা মিনিদের ধর্মের বিরুদ্ধে তারা সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন, কারণ মিলনের সময় একে অন্যের শরীরের কমনীয় অঙ্গগুলির দিকে তাকানোতে তাদের পবিত্রগ্রন্থ বাধা দিত না। অথচ আমাদের পবিত্রগ্রন্থে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আমাদের পাদ্রিরা বলেন, "একই ধর্মে বিশ্বাসী স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময়ই আপনারা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন। স্ত্রী যদি ওই ধর্মে বিশ্বাসী হয়, তবে কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন?"

এ কথা শুনে জনতার এক জন আর এক জনের কাছ থেমে মুখ লুকাতেন।

লুনাভা মিনিদের পাদ্রিরাও কোনও অংশে কম ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় সমাবেশে বলতেন, "ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞার কথা বাদই দিলাম। বিধর্মীকে বিয়ে করে কীভাবে তোমরা সুখী হবে, যেখানে তোমাদের সব কিছু আলাদা, এমনকি প্রশ্রাব বা গোসল করার নিয়মও।"

প্রশ্রাব আর গোসল করার নিয়ম এক-এক ধর্মে এক-এক রকম হওয়াতে, আমাদের ছেলেরা কখনও বিধর্মী মেয়েদের প্রেমে পড়ত না। আর কেউ কখনও ভুল করে পড়লে, জানাজানি হওয়া মাত্র ফিরে আসত।

লুনাভা মিনিকে সামনে বসিয়ে রেখে আমি এসব কথা ভাবি আর দুর্বার ক্রোধে কাঁপতে থাকি। আমি ঈশ্বরের কাছে এই সমস্যার সমাধান চাই। আমার বিশ্বাসী আত্মার সব শক্তি নিয়ে আমি ঈশ্বরেরর কাছে করুণা চাই। কাঁদতে কাঁদতে আমি তাঁকে বলি, "ঈশ্বর, তুমি এটা সমাধান করো। বহু বিপদে তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। আর একবার আমাকে তোমার রক্ষা করতে হবে।"

আমার চোখের জল লুনাভা মিনির কাছে ধরা পড়ে যায়। আমরা দু'জন তখন একই কথা ভাবছি, আমাদের স্বস্ব ধর্মের রোষ, যা অদৃশ্য, কিন্তু যা তখন আমাকে কাঁটার মতো বিধছে। এবং ধারণা করি লুনাভা মিনিকেও তা-ই করছিল।

"আপনি জানতেন না? কেউ আপনাকে কিছু বলেনি?" লুনাভা মিনি আকুল হয়ে বলে।

আসলে আমি জানতাম না, আর না জানার জন্য আফসোস হয়। তার নাম থেকে কিছু আন্দাজ করতে পারিনি। পারলে সে-ভাবে প্রস্তুত হওয়া যেত। আমি বলি, "আমার কিছু জানার দরকার নাই। যা ঘটার তা ঘটে গেছে। এখন আমি আর কিছু বুঝতে চাই না।"

"কিন্তু তারপরও।"

কিন্তু তারপরও, এ কথা বলে তখন আমার জীবনের নারী আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। আমার বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল যদিও। লাগবেই না বা কেন? আপনি এক কোপে আপনার তর্জনি ফেলে দিন। দেখুন আপনি সাথে সাথে ব্যথা পান কি না। না পাবেন না। দশ সেকেন্ড পরে কিন্তু আপনি ব্যথায় নাচতে থাকবেন। আমারও তেমনটা হয়েছিল। আমি তখন খাদে পড়ে আছি। লুনাভা মিনি আমার শরীর মাড়িয়ে চলে যায়। লুনাভা মিনি নিজেকে সরীসৃপে ভরপুর কাদা-মাটি থেকে মুক্ত করে। আর আমি সে কাদায় পড়ে থাকি। বেশ কয়েক বছর পরের কথা। অসুখে পড়ে আমি তখন আজমিরি বেগম দাতব্য চিকিৎসালয়ে শুয়ে আছি। এক দিন খবরের কাগজে দেখি, রাষ্ট্রপতির সাবেক এক জনপ্রিয় উপদেষ্টাকে এক ছিনতাইকারি রাতের বেলা খুন করেছে। আমাদের দেশে উপদেষ্টাদের বদনাম ছিল। কিন্তু এই উপদেষ্টার সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন জমিদারের সন্তান, অথচ জমিজমা সব দরিদ্র মানুষদের বিলিয়ে দিয়েছেন। কলেজের শিক্ষক স্ত্রীর গৃহশিক্ষকতার পয়সায় তাঁর সংসার চলত। আমজনতা তাঁর জন্য চোখের পানি ফেলেন : স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ হয়ে নয়, জটিল কোনও অসুখ বা বড় কোনও সড়ক দুর্ঘটনা বা বার্ধক্যে নয়, এমন মানবদরদী একজন মানুষ মারা গেলেন মামুলি ছিনতাইকারির মাছের দোকান থেকে চুরি করা ভোতা একটা ছুরির আঘাতে; যদি আঘাতটা বড় হত, তা-ও মনকে না হয় তাঁরা কিছু সান্ত্বনা দিতে পারতেন। পিচকে ছিনতাইকারী দশ টাকা না পেয়ে, নিহত করার ন্যূনতম ইচ্ছা ছাড়া, শুধু সামান্য আহত করার জন্য, তলপেটে ছোট একটা ঘা দেয়। আর তাতেই মাননীয় উপদেষ্টা শেষ হয়ে যান। 'পিকউইক পেপারস' লেখার আগে চার্লস ডিকিন্স আকাশ থেকে বাজ পড়ে মরে গেলে কেমন হত? আলেক্সান্ডার যদি ইরানের পাহাড়গুলি পার না হতেন তা হলেতো তিনি একশ পঞ্চাশ বছর বাঁচতেন। অথচ তিনি এমন একটা বয়সে মারা গেলেন যখন নর-দেহের আনন্দ-ঝর্না একশ মাইল বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়। আসলে কত সহজেই মানুষের

কত আশার ধন দূরে সরে যায়! কত তুচ্ছ কারণেই না আপনার সকল সুখ আশেপাশে উড়ে বেড়ালেও আপনি তা ধরতে পারেন না। ব্যথা আপনার আরও গভীর হয়, যখন আপনি দেখেন, আপনার পথের কাঁটা সামান্য, অথচ বিষাক্ত, আর অলঙ্ঘ্য।

আপনার সেই বাসনার কোনও বিকল্প নাই, ফলে আপনার জীবনে সুখেরও কোনও আশা নাই। আপনি এমনকি পিতামাতাকেও বুঝাতে পারবেন না, সেই বাসনা পূরণ না হওয়া মানে আপনার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়া। লুনাভা মিনির 'তারপরও' কথাটির মধ্যে আমার জন্য যে কষ্ট ছিল, পার্থিব জীবনের কোনও কষ্টের সাথে তার তুলনা চলে না। তার বাণী আমাকে শুধু ফাঁসিতে ঝুলিয়ে থেমে যায়নি, তা আমার ফাঁসির দড়িতে হেঁচকা টান মেরে আমার মাথাটিও কেটে ফেলে। অথচ আমি চেয়েছিলাম ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে, যাতে বেঁচে থাকার ন্যূনতম কিছু সুযোগ পাই, যাতে আমি কিছু চেষ্টা করে যেতে পারি, কিছু অধ্যবসায়। গলা ফাটা রক্ত পান করে আমি শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম। লুনাভা মিনির কোনও ধারণাই ছিল না, আমি তাকে ততদিনে কতটা ভালবেসেছিলাম, আর কত কষ্ট পেয়েছি তার সেই কথা শুনে। সে আমার দুঃখ বোঝে, কিন্তু পুরোটা নয়, কারণ সে আমাকে তার অন্য প্রেমিকদের থেকে আলাদা করে ভাবতে পারে না।

এই একটুখানি বোঝার অপরাধের জন্য আমি লুনাভা মিনিকে কখনও ক্ষমা করিনি। সে ইলেক্ট্রিক পাখার গতি বাড়িয়ে দেয়, আর জিজ্ঞেস করে, কেন আমি এমন সাদা হয়ে গেলাম। আমি রাগ করি। বুঝতে পারি না, কেন সে ভদ্রতা করছে। ভদ্রতা করে সে আমার ঘা বাড়িয়ে দেয়। ওটা ছিল লুনাভা মিনির ক্ষুদ্র আচরণ। বিতৃষ্ণা আমাকে আক্রমণ করে। সে তার চোখ নামিয়ে নেয়। কারণ, তার চোখের করুণা সে আমাকে দেখানোর সাহস পায় না। সে চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়। কিছু সময় চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকার পর সে আমার দিকে স্নেহভরে তাকায়, আর দেখতে থাকে মুমূর্ষু প্রেমিকের শেষ মুহূর্তগুলো। আমাকে ওই অবস্থায় রেখে সে ঋতু পরিবর্তনের কথা বলে। তার ভাষা প্রীতিময়; সে পরিবেশ হালকা করতে চায়। এর মধ্যে বৃষ্টি পৃথিবীকে ধুয়ে ফেলে, গাছের পাতা নরম করে রেখে যায়। শেষ বিকেলের রোদে পাতারা ঝিকমিক করে। সেই আলো আমার ভালবাসায় প্রতিফলিত হয়ে আমার প্রেমিকার নরম গালে আর সবুজ পোশাকের উপর গিয়ে পড়ে। আঠারো বছরের লুনাভা মিনি

আমার হৃৎপিণ্ড দুই হাতে শক্ত করে ধরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। জাহাজডুবী মায়ের কাছে আপন হৃষ্টপুষ্ট শিশুর মুখ, সমুদ্রের ঢেউয়ে ছেড়ে দেয়ার আগে শেষবার দেখে নেয়ার সময় যেমন হাজারগুণ বেশি সুন্দর লাগে, ঠিক সে-মুহূর্তে, সে নিরাশার সময়, লুনাভা মিনিকে আমার হাজারগুণ সুন্দরী মনে হয়। আমি তাকে লক্ষগুণ বেশি কামনা করি। তার পাথর-কঠিন চরিত্রে বন্দি হয়ে আমি তার নীল শিরাগুলো থেকে আমার প্রাণের রক্ত চুষে নিই, তার পাথর চোখের স্ফুলিঙ্গ আমার ভাঙ্গাচোরা দেহ জোড়া লাগায়, আর তার ছোট সূচালো নাক আমাকে অক্সিজেন দেয়। সে যে আমার নয়, আমি তা ভুলে যাই। আমি শুধু বুঝি, তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আর মৃত্যুর জন্য সে সময় আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। সেই অপরাহ্নে আমার জীবনের ইতিকথা রচিত হয়। আমি আর স্বাভাবিক মানুষ থাকি না। ঐতিহাসিক প্রেমিকরা যে সব সংগ্রাম করেছেন, তার কোনওটি বাদ দিব না বলে প্রতিজ্ঞা করি। নিজেকে আমি আগে কখনও এত ভালভাবে চিনতে পারিনি।

২১

লুনাভা মিনির দরজায় এক মহিলা উঁকি মারে। অপরিচিতা নারী ছোট ঘরটাতে ভিড় সৃষ্টি করে আর আমার চিন্তায় বাধা দেয়। ইচ্ছে করে দেয়ালের সাথে বাড়ি দিয়ে তার মাথা থেঁতলে দিই। আর লুনাভা মিনির শান্তশিষ্ট ভাব দেখে আমার লুনাভা মিনির পিঠে গরম লোহার সেঁক দিতে ইচ্ছে করে। অথচ ঢোক গিলে আমি ক্রোধ চাপা দেয়ার চেষ্টা করি। মনে হয় আমি আগন্তুককে কোথাও দেখেছি। ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য সে আমার কাছে ক্ষমা চায়, আর লুনাভা মিনিকে বলে :

"তুমি আসো, আমি অপেক্ষা করছি।"

"অধ্যাপিকা রোদালিকা," লুনাভা মিনি বলে। "আপনি মির্চার কথা শুনেননি, যিনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে ধনী হয়েছিলেন।"

বান্ধবির উপস্থিতিতে আমার প্রেমিকার শরীর-মন বুঝি শিথিল হয়। আর

তা দেখে কাঁচা ব্যথা আমার হৃদয়ে দগদগ করে উঠে। রাগ কমানোর জন্য আমি আমার শখের সানগ্লাসটি পকেটের মধ্যে চেপে ধরে চূর্ণবিচূর্ণ করি। একদিনের মধ্যে আমি এই আর এক চমকের শিকার হই। বহু কেলেংকারির নায়িকা এবং প্রায় দ্বিগুণ বয়সী রোদালিকা, যে এক সময় দেশের প্রতিটা পুরুষের রক্তে আগুন ধরিয়েছিল, আমার প্রেমিকার বান্ধবী।

"সে আমাদের সাহিত্য পড়ায়," লুনাভা মিনি বলে। "এক দিন বিকালে আমি তার কাছে যাই একটা শব্দের অর্থ জানতে। তখন থেকে আমরা একে অন্যের। আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শুনুন। আপনার তা জানা দরকার। আমি তার একমাত্র সহমর্মী। ভিখারীর মতো দুই মাইল হেঁটে সে এখানে আসে আমার সাথে কথা বলার জন্য। তার জীবনে অনেক দুঃখ। তার কাছ থেকে আমি আমার জীবনের শিক্ষা নিয়েছি।"

আমি যতটা সহ্য করতে পারতাম, লুনাভা মিনি তার বেশি ব্যাখ্যা করে। সমকালীন পৃথিবীর সব অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ আমাদের দেশের যে দু'জন মানুষের নাম জানত, রোদালিকার জনক মির্চা সে দু'জনের একজন। সমকালীন বিশ্বের আর কোনও নাগরিক এত বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাননি, যা এঁরা দু'জন পেয়েছিলেন। এঁদের দু'জনের জন্য-আর একজন হল নারীবাদী মাহিনা সেলেনা-আমাদের দেশ পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ধর্মপালনকারি রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। দু'জনের মধ্যে উজ্জ্বলতর ও চতুরতর মির্চা পরিচিতি পেয়েছিলেন তাঁর কালের সবচেয়ে বড় জনহিতৈষী ব্যক্তি হিসাবে। সে সময়ে অবশ্য আমাদের সংবাদপত্রগুলো, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত মির্চার একচল্লিশটি জীবনী এক সময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে, রোদালিকার কথা লেখা বন্ধ করে দেয়, যে রোদালিকা এক সময় সব রকম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। আমার নারী লুনাভা মিনি রোদালিকার ব্যর্থ প্রেমগুলোর কথা ইঙ্গিত করে। ফলে আমার পক্ষে চোখের পানি ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এক বিকালে নির্লজ্জের মতো আমি আর কত কাঁদতে পারি। আমার শুধু মনে হয়, পৃথিবীতে এত নারী থাকতে নগরীর বেশ্যা রোদালিকা কেন আমার প্রেমিকার বান্ধবী আর পরামর্শক হতে গেল। ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন সমকামী আঁতাত বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নিয়েও আমি রাশিচক্র আর অগ্রবোধে বিশ্বাস করতাম। লুনাভা মিনির উপর আমি রোদালিকার নষ্ট ছায়ার আছর দেখতে পাই।

আমি সরে পড়তে চাই যাতে দুই হতভাগিনী আপন ঝর্নায় গোসল সারতে পারে। কিন্তু আমার নারী তখন পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল নারী। সে আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়, আর আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে। ওই দশ মিনিটে সে আমাকে তার জীবনকাহিনী বর্ণনা করে। "আমি ছেলে নই বলে আমার মা কাঁদে।" এ ভাবে সে ব্যাখ্যা করে বলে, তার আকাঙ্ক্ষাগুলো কত অবদমিত। এ যাবৎ আমি শুধু তার ধর্মের কথা ভেবেছি; এবার সে আমাকে আরও জটিল বিষয়ের কথা বলে। একে একে বাধাগুলো তুলে ধরে সে বলে, কোন ভালবাসাই তার সবচেয়ে দুর্বলটিও অতিক্রম করতে পারবে না। সে সব কিছু খোলাখুলি বলে। আমি শান্ত হয়ে শুনি। কিন্তু ভিতরে আমার অশ্রু গরম পানির মতো গর্জন করতে থাকে। সে অশ্রুপাত করার জন্য আমার তখন পুরো রাত দরকার।

২২

লুনাভা মিনির সব কিছু আমি ভালবাসি। তার মা দয়ালু ছিলেন। তার বাবা এক পশ্চিমা কর্পোরেশনে ছোট একটা চাকরি করতেন। তাদের বাড়ির সব কিছুতে রুচির ছোঁয়া। আয়ের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারা যে আত্মমর্যাদা ধরে রেখেছিল, তার জন্য আমি তাকে আরও ভালবাসি। লুনাভা মিনি তার অবস্থা বিবেচনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করে আমাকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়। তাকে ভুল বোঝার জন্য আমার মনস্তাপ হয়। কিন্তু আমি উপযুক্ত কোনও জবাব দিতে পারি না। সে আমার কয়েক বছরের ছোট হলেও মানব-মানবীর সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে সে ছিল কয়েক বছর এগিয়ে। সেই সচেতনতার কারণে, নিরন্তর চাপের মুখেও তার আত্মসংযম অবিচল ছিল। এর মধ্যে সে অনেক প্রেমপত্র পেয়েছে। কিন্তু প্রেমের পথে সে এক কদম হাঁটেনি। কারণ অল্প বয়স থেকেই সে শান্তিপূর্ণ জীবন চেয়েছে। আর সে কারণেই সে ছিল আমার মানসনারী।

আমাদের মাঝে ধর্মবর্ণের ঊর্ধ্বে যে বাধার প্রাচীর, তা আমার প্রেমিকাকে পাথর করে রেখেছে; সে পাথর ভেতরে ভেতরে গলে চলেছে, আমি শুধু

তার বাইরের কঠিন রূপটি দেখছিলাম। এ সব কথা যত ভাবি তত মনে হয়, আমি তার নরম হৃৎপিণ্ডটি আমার হীন স্বার্থ দিয়ে পিষে চলেছি। তাকে জটিল জীবনের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য আমি ঈশ্বরকে দোষ দিই। সে জটিলতার কথা বলতে হলে আমাকে পৃথিবীর শীতলতম পানিগুলোর মধ্য দিয়ে আর একবার সাঁতার কেটে আসতে হবে। প্রতি মুহূর্তে সে-দিন লুনাভা মিনি আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করে, আর আমার বুকের গভীরে একটা করে দাগ কাটে। আমি শুধু একটা নীরব প্রতিজ্ঞা করি : লুনাভা মিনিকে আমার পেতেই হবে। কারণ আমি বুঝে যাই, বাকি জীবন আমাকে সে দাগগুলো অনুসরণ করে চলতে হবে।

শুধু যদি লুনাভা মিনি আমার সাথে সে-দিন এত ভাল ব্যবহার না করত! সে-দিন ভাল ব্যবহার করে লুনাভা মিনি তার জীবনের সবচেয়ে বড় অমার্জনীয় অপরাধ করেছিল; সে অপরাধ জিঘাংসু, সে অপরাধ শুধু নারী করে, সে অপরাধের জন্য ঈশ্বর তাদেরকে সন্তানপ্রসবের ব্যথা আর রক্তপ্রবাহের অস্বস্তি দিয়ে শাস্তি দেন। সেই অপরাধ করে আমার জীবনের নারী ইডেন বাগানের জ্ঞান আর শয়তানী গাছের পাকা ফল হয়ে আমার মুখের উপর দোল খেতে থাকে। বাবা আদম শিরায় সন্তের রক্ত নিয়ে সে ফল খাওয়ার লোভ সামলাতে পারেনি। রক্তের মধ্যে অসংযম আর ভোগসুখের দোষ নিয়ে আমি কীভাবে সে ফল খাওয়ার লোভ সামলাতে পারি।

"ঈশ্বর, তুমিই তাকে সৌন্দর্য, নারিত্ব আর হৃদয় দিয়েছ, যা পাওয়ার লোভ পোপ বা দেবদূত কেউ সংবরণ করতে পারে না।" নীরব প্রার্থনায় আমি বলে যাই। আমি তখন শুধু ঈশ্বরের কাছে হাত বাড়াতে পারতাম।

সে-দিন চলে আসার সময় লুনাভা মিনি আমার চোখে চোখ রেখে বলে, "সব কিছুতে আপনি এত ভেঙ্গে পড়েন কেন?" তার কথা আমার প্রাণরসে আগুন ধরিয়ে দেয়। "ভেঙ্গে পড়বেন না, প্লিজ।" যে ভাবে সে 'প্লিজ' বলে, তাতে আমার কবর খোঁড়া হয়ে যায়। তরল আনন্দ হয়ে আমি রাস্তায় বের হই। যানবাহনের জন্য অপেক্ষা না করে আমি আমার হোস্টেলের দিকে হেঁটে রওয়ানা দিই। যে সত্য আমি চিরদিন হৃদয়ে ধরে রেখেছি তা অনুভব করি। নিজেকে নিজে বলি :

ভালবাসায় বাঁচো। আর কোথাও তুমি এমন অর্থপূর্ণ জীবন খুঁজে পাবে না।

২৩

সে-দিন আমি দ্রুত আমার হোস্টেলকক্ষে প্রবেশ করি। জামাকাপড় না ছেড়েই আমি কাঁদতে বসি। আমি জানি কাঁদতে আমার লজ্জা লাগে। তাই দরজা বন্ধ করেছিলাম। কান্নার বেগ বেড়ে গেলে আমি উঠে গিয়ে দরজা পরীক্ষা করি। দরজা বন্ধ। আমি অবাধে কাঁদি। নিয়ন্ত্রণহীন কান্নার মধ্যে এক সময় গলা দিয়ে আর্তচিৎকার বের হয়ে আসে। এরপর নাকমুখ দিয়ে কয়েকটা জোরালো আর্তনাদ বের হয়ে যায়। আমি রুমাল দিয়ে মুখ বন্ধ করি। গলা দিয়ে বিলাপ বের হতে না পেরে তা পেটের দিকে চলে যায়। আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি। আমার অবস্থা তখন আধা-জবাইকৃত পশুর মতো। মোচড় খেতে খেতে ব্যথায় বুকের পাঁজর কটমট করে। তবু কান্না থামাতে পারছিলাম না। যখন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তখন মনে হল ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে যাবে। তখন আমার কাঁচা বয়স। খুনাখুনি করে নয়। আত্মহত্যা করে নয়। শুধু রুদ্ধ কান্নার অভিঘাতে মরে যাব? বিষয়টা ভাবতে বেশ লজ্জা লাগছিল। শুধু অন্য মানুষই নয়, নিজেই হয়তো এক সময় হাসব এমন ভাবে মরে যাওয়ার জন্য। লজ্জায় আমার মাথা গরম হয়। তাই আমি একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিই। সিদ্ধান্ত নিই লুনাভা মিনির সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত কিছুতেই মরব না। আমি কান্না থামানোর দরকার অনুভব করি। অন্ধকার ঘর। বিজলি বাতি জ্বালাইনি। বিজলির সেঁকা খেলে কান্না থামবে। কিন্তু তাতে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। আমি একটা মোমবাতি জ্বালাই। মোমের শিখায় বাম হাতের তর্জনি সেঁকি। আঙ্গুল পোড়ার ব্যথা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। নাকে ত্বক পোড়ার গন্ধ পেতে সময় লাগে যদিও। আর তখন মনে হয় আমার দগ্ধ আঙ্গুলের ব্যথা আমার মনের ব্যথার চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। তখন লুনাভা মিনির জন্য আমার কান্না থামে।

দরজা খুলে উপাসনালয়ের দিকে হাঁটতে থাকি। এ সময় অঙ্গ পোড়ার ক্ষত আবার মনের ক্ষতের কাছে হার মানে। দ্বিতীয়টা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আমার শরীরের বাতাসে পথের দুই পাশের রজনীগন্ধ্যার ঝোপে ঝড় উঠে। দশ মিনিটের পথ দুই মিনিটে হেঁটে শেষ করি। উপাসানালয়টা খালি পাই। তখন অনেক রাত

হয়ে গিয়েছিল। ওই রাতে উপাসনালয় খালি পাওয়াটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। সে রাতে ওখানে যাতে আর কেউ ঢুকতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমি ভিতর থেকে উপাসনালয়ের দরজা বন্ধ করে দিই। যা হবার হোক। অন্তত আমি যেন একা থাকতে পারি। আর উপাসনালয়ে সশব্দে কান্না অনেক নিরাপদ ছিল। আমাদের দেশে উপাসনালয়গুলিতে হামেশা কান্নার রোল উঠত। যদিও ঈশ্বর কখনও কারও ফরিয়াদ মঞ্জুর করেছেন এমন প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল না। তবে উপাসনালয়ের কান্নার শব্দ স্বাভাবিক ছিল, তাই ওটাতে কেউ কান দিত না।

খালি উপাসনালয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি ইশ্বরকে সশব্দে জিজ্ঞাসা করি, কেন লুনাভা মিনি এমন সামাজিক সমস্যার অধীন? কেন তাকে আমার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে দুনিয়াতে পাঠানো হল না, যাতে আমি আঙ্গুলের এক টোকাতে তার রাগমোচন ঘটাতে পারি। কী করে এমন ভুল হল। কোনও মা বুক চাপড়ে যেমন করে ঈশ্বরকে বার বার জিজ্ঞেস করে, কেন তার ছেলেকে এত সুন্দর করে পৃথিবীতে পাঠানো হল, যদি তার ইচ্ছা এই ছিল যে, ছুটন্ত ট্রাকের সাথে বাড়ি খেয়ে সেই ছেলের খুলি উড়ে যাবে, তেমন করে বারবার আমি ঈশ্বরকে একই প্রশ্ন করতে থাকি। কাঁদতে গিয়ে পাদ্রির ঘুম ভাঙল কি ভাঙল না, এ নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না। কারণ দরজা বন্ধ ছিল। পাদ্রি চাইলেও ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া, পরকালের ভয় না থাকাতে পাদ্রিদের ঘুম গভীর হত। তাই পাদ্রিকে নিয়ে আমার তেমন দুশ্চিন্তা ছিল না। আমি ইশ্বরের কাছে আমার নালিশ জানাতে থাকি।

বার বার নালিশ করতে গিয়ে আমার ক্লান্তি নামে। তখন আমার ক্লান্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না। আমি নালিশ জানানো বন্ধ করি।

আমি তখন উপাসনালয়ের মাঝখানে বসে লুনাভা মিনিদের ধর্ম আর সে ধর্মের অনুসারীদের কথা ভাবি। আমার চিন্তা বিক্ষিপ্ত কিন্তু অশ্রু বিরামহীন। লুনাভা মিনি যা-ই বলুক না কেন, ধর্মের ব্যবধানই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা, আমি তা-ই ভাবছিলাম।

২৪

লুনাভা মিনিকে আমি এমন এক সময়ে ভালবাসি, যখন ধর্মীয় ঘৃণা শুধু আমাদের দেশকেই নয়, সারা পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সন্ত, সন্ত্রাসী, যাজক, রাষ্ট্রপতি, ব্যভিচারী সবাই ধর্মের কসম খেয়ে বিধর্মীকে খুন করার প্রতিজ্ঞা করে। পৃথিবীতে আর কখনও মানবজাতি এতটা ধার্মিক হয়ে উঠে না, আর কখনও তারা একে অপরকে এতটা ঘৃণাও করে না।

একদা লুনাভা মিনিদের সমাজের ভেতরটা আমার ভাল জানা ছিল না। তাদের ধ্যানধারণা রীতিনীতি আর শিষ্টাচার ছিল আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে উপরে। তাদের পাদ্রিরা অপেক্ষকৃত বেশি সহিষ্ণু ছিলেন। তাদের ধর্মগ্রন্থ তাদের পাদ্রিদের পবিত্র বাণিসমূহ সময়-আর-পারিপার্শ্বিকের সাথে খাপ খাইয়ে ব্যাখ্যা করার অনুমোদ দিয়েছিল। সেই অনুমোদনের ফলে তাদের পাদ্রিদের সুবিধা হলেও অন্য ধর্মের পাদ্রিরা বেকায়দায় পড়েন। রাগ করে অন্য ধর্মের পাদ্রিরা বলেন, এই অনুমোদন প্রমাণ করে, তাদের ধর্ম মানুষের বানানো, ঈশ্বরের প্রেরিত নয়, কারণ ঈশ্বরের বাণীর দুই রকম অর্থ হতে পারে না। কিন্তু এই অনুমোদন তাদের নারীদের লাভবান করে। পুরনো যে-সব মতবাদ নারীদের নিপীড়ন করত, পাদ্রিরা সে-সব মতবাদ সংশোধন করে। ফলে তাদের নারীরা কোনও পুরুষ তাদের উরু, নাভি আর বুক দেখে ফেলল কি না, এই ভয়ে কাঁপত না। আমাদের সময়ে সে ধর্মের অনুসারীরা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ অর্থ, খাদ্য, আরামআয়েশ আর ভোগবিলাস তখন তাঁদের আয়ত্তে। নারীদের মুক্তি দেয়ার কারণে এ সাফল্য এসেছিল বলে তাদের নেতারা দাবি করেন। তারা বলেন, তাদের নারীদের উন্মুক্ত সৌন্দর্য তাদের পুরুষদের দিনভর অবিরাম কাজ করার প্রেরণা দেয়। পুরুষরা সুখী হন, কারণ তারা নারীদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন; নারীরাও সুখী হন, কারণ তাঁরা তাঁদের পুরুষদের প্রেরণার উৎস হতে পেরেছেন। ফলে একসময় নারীপুরুষ সবাই মিলে দিনরাত কাজ করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন। তাঁদের এ দাবি সত্য কি না তা প্রমাণ করা কঠিন ছিল। তবে তাঁরা এত সফল হয়েছেন যে, যে কোনও কিছুকে তাঁরা

তাঁদের সাফল্যের কারণ হিসাবে উল্লখ করতে পারতেন। ওই সময়ে সব ভাল জিনিস শুধু তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটছিল। আর অন্য ধর্মের লোকরা পেছনের দিকে পিছলে পড়ছিলেন। কিছু কিছু বিধর্মী নিজেদের পতন ঠেকানোর জন্য ওই ধর্মের অনুসারীদের অনুসরণ করে দ্রুত নারীদের উপর আরোপ করা পুরনো বিধিনিষেধ তুলে দিতে থাকেন। শুধু আমাদের পাদ্রিরা চিৎকার করে বলেন, নারীর উন্মুক্তকরণ হল চূড়ান্ত ধ্বংসের লক্ষণ।

আমি যখন লুনাভা মিনিকে পাই, তখন এই বিতর্ক সারা পৃথিবীতে ঝড় তোলে। আন্তর্জাতিক চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায় দুই ভাগে ভাগ হয়ে একে অন্যকে কেয়ামত ঘনিয়ে আনার দায়ে অভিযুক্ত করেন। বিরোধ দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দুই পক্ষের পাদ্রিদের ভিয়েনাতে মিলিত করে স্ব স্ব যুক্তি তুলে ধরতে বলেন। এ প্রচেষ্টার ফল হয় উল্টা। ভিয়েনার সেই সভা উক্ত বিরোধকে ঘৃণার পর্যায়ে নিয়ে যায়। ঘোমটার পক্ষে যাঁরা, তাঁরা বলেন, ঘোমটা ঈশ্বরের নির্দেশ, তা পুরুষের মগজ ঠাণ্ডা রাখে, কামনা দমিয়ে রাখে। তা ছাড়া, ঘোমটা নারীদের ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে, ফলে ধর্মের অনুমতি নিয়ে পুরুষ নারীর ঘোমটা খুলে নারীকে সদ্য ফোটা ফুলের মতো তাজা পায়। ঘোমটাবিরোধীরা তাঁদের প্রতিপক্ষকে উপহাস করেন। তাঁরা বলেন, ঘোমটা হল ওই ধর্মের অনুসারীদের সব দুর্দশার কারণ। ঘোমটা তাঁদের সর্বদা কাফনের কথা মনে করিয়ে দেয়, ফলে তাঁদের নারী-পুরুষ সবাই অলস আর ভীরু হয়ে যায়। ঘোমটা নারীর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে, আর নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা নষ্ট করে, ফলে পুরুষদের কামনা বিকৃত হয়, অনেকে সমকামী হয়ে যায়।

প্রথম দফায় হেরে যাওয়াতে ঘোমটার পক্ষের পাদ্রিদের আর এক বার কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। তখন তাঁরা বলেন, জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী তা যাপন করা। ঈশ্বর তার ইচ্ছার কারণ দর্শাতে বাধ্য নন। ঈশ্বর যেহেতু বলেছেন নারীকে ঘোমটা দিতে হবে, সেহেতু এর গুঢ় কোনও কারণ আছে, যা বোঝার ক্ষমতা মানুষের নাই। তারপর তাঁরা এক আঁটি জলপাইয়ের শাখা তাঁদের প্রতিপক্ষের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, ঘোমটা নিয়ে আর বিতর্ক নয়। এটা যার যার ধর্মের নিজস্ব ব্যাপার।

কিন্তু বিতর্ক থামে না, বরং তা নতুন নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করে, যা সুরাহা করার জন্য আর একটা সভা ডাকতে হয়। সভার আয়োজকরা বলেন, ধর্মীয় বিষয়গুলো এতটাই স্পর্শকাতর যে, তাদের সরাসরি সমাধানের চেষ্টার ফল

বিপরীত হয়। তাই এবার বিতর্কের বিষয় করা হয় : সৌন্দর্য প্রকাশ করা ভাল না গোপন করা ভাল। পাদ্রিদের না ডেকে এ বিতর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের ডাকা হয়। যাঁরা সৌন্দর্য গোপন করার পক্ষে মত দিতে আসেন, তাঁরা বক্তব্য না দিয়ে একের পর এক কফির কাপ খালি করেন। তাঁদের দলনেতা প্রতিপক্ষের দলনেতাকে বলেন, "আমরা খুব একটা সিরিয়াস না। আপনারা বলুন, আমরা শুনি। শুধু রিপোর্টে লিখে দিবেন, আমরা আমাদের পক্ষে অনেক জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছি।"

যাঁরা সৌন্দর্য প্রকাশের পক্ষে, তাঁরা বলে, সৌন্দর্য প্রকাশ করার দরকার আছে। যদি তা না হয়, তবে কেন তোমরা পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখো; কেন তোমরা পর্বতমালা দেখো, দেখো বৃক্ষ আর বনভূমি। কেন তোমরা সূর্যোদয় আর গ্রীষ্মের বৃষ্টি দেখে নেচে ওঠো? কেন ঘুম থেকে জেগে জানালায় দাঁড়িয়ে ঘাস দেখো? কেন তোমরা সমুদ্র, পর্বত, প্রভাতের সূর্য, গ্রীষ্মের বৃষ্টি, আর ঘাস ঢেকে রাখো না? এ সব ঢেকে রাখা পাগলামী, তা নয় কি? আর তা-ই যদি হয়, তবে কেন তোমরা সব সৌন্দর্যের উৎস, নারীর সৌন্দর্য, ঢেকে রাখো?

"তোমরা কি তার নিতম্বের নিখুঁত প্রস্ফুরণ দেখোনি? তার অন্তর্বাসের ধার দেখে কি তোমার পৃথিবী এর চেয়েও বেশি শিহরিত হয়নি, যে শিহরন তুমি পেয়েছ সমুদ্রের নীল, জঙ্গলের সবুজ, প্রভাতের সূর্য, বা বৃষ্টির শীতলতা থেকে? তবে কেন এই পরিহাস? কেন এই ঘোমটা? এর কারণ কি এই যে সে নারী, কারণ সে তোমার দেশের রাষ্ট্রপতি নয়?" বৃটিশ-ইতালিয়ান সৌন্দর্যবিদ এড্ডু পম্পিলি প্রশ্ন তোলেন। "যৌনতার অনুভূতির অবস্থান," মিস্টার পম্পিলি বলেন, "সকল মানবিক অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দুতে। এই জন্য দুষ্ট শাসকরা তা নিষিদ্ধ করে, আর অধিকতর দুষ্টরা তাকে আক্রমণ করে, আর কেবল অরুচিকর পথে তার অনুমোদন দেয়।"

পম্পিলি তাঁর আলোচনা শেষ করতে পারেন না। একটি দেশের ডেলিগেটরা হাতে হাতে তাঁর নিকট একটি চিরকুট পাঠান, যাতে লেখা আছে : "দয়া করে থামুন। আপনার এই পাপ-আলোচনা থেকে এখনই যদি আমরা ওয়াকআউট না করি, দেশে ফেরার পর আমাদের পাদ্রিরা পরিবারের সাথে দেখা করার আগেই আমাদের হত্যা করবেন।"

সৌন্দর্যবিদ এড্ডু পম্পিলি! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাকে আমার এই কাহিনীর

সাথে আশ্চর্যজনকভাবে যুক্ত করেছেন, যেমন আশ্চর্যজনকভাবে আমি নদীর পানি দিয়ে সমুদের তলদেশে বসে এই কাহিনী লিখছি আর তোমাদের পড়ে শুনাচ্ছি। ওই সভার আয়োজকরা আশা করেছিলেন, তাঁরা একদিন পৃথিবীকে সংশোধন করতে পারবেন। তবে অনেকে বলেছেন, তার আগেই বোমার বিস্ফোরণ, ছুরির আঘাত, গর্দানকর্তন, যৌনাঙ্গব্যবচ্ছেদ, বন্দীর মুখে মলত্যাগ ইত্যাদি অনাচারে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

শ্রোতারা, ওই সব বিতর্ক আমাকে উৎসাহিত করত। কারণ, আমার হীন স্বার্থের জন্য, লুনাভা মিনিকে পাওয়ার জন্য, আমি চাইতাম, শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে ধর্মীয় বিভেদ ঘুচে যাক। দুঃখের কথা হল, ওই বিতর্কের ফলে সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমাদের দেশে, ধর্মীয় টানাপড়েন আরও বেড়ে যায়। আমাদের পাদ্রিরা আমাদের প্রতিনিধিদের দেশেই ঢুকতে দেন না। পাদ্রিরা সমাজবিজ্ঞানীগুলোকে গালিগালাজ করে বলেন, 'যেখানে গিয়েছিলি সেখানে থাক, আর কফি খা।" তাঁরা রাস্তায় মিছিল নিয়ে নামেন। মিছিলগুলো লুনাভা মিনির আর আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায়।

২৫

আমার সেখানে থেমে যাওয়া উচিত ছিল। এ জন্য নয় যে লুনাভা মিনি তার সীমাবদ্ধতার কথা খুলে বলেছিল; বরং এই জন্যে যে, তার খুলে বলার আত্মমর্যাদাশীল কৌশল যে কোনও প্রেমিককে নিবৃত্ত করত। কিন্তু আমাকে তা নিবৃত্ত করেনি। করলে আমি সুখী হতাম। অথচ সুখ আমার কপালে লেখা ছিল না। ফলে মূঢ়তা আমাকে পেয়ে বসে। আমি আমার হৃদয়ের পক্ষ নিই, আর তা করে আমি সংকীর্ণতার পরিচয় দিই, অথচ আমি ভাবি আমি উদারতার পরিচয় দিচ্ছি। আমি অসম্ভবকে সম্ভব মনে করি, বাধাবিপত্তি ভুলে যাই, আর মুহূর্তের অনুভূতিগুলোকে মহিমান্বিত করি। ফলে আমি সব কিছু ভুল বুঝি। উপদেশদানকারীরা আমাকে তিরস্কার করে। প্রেমের নির্দেশ মেনে চলে আমি তাদের তিরস্কারের জবাব দিই।

সব কিছুতে আপনি এত ভেঙ্গে পড়েন কেন? ভেবেছিলাম এ কথা থেকে আমাদের প্রেমের শুরু হবে। আমি তার ওজর-আপত্তিগুলোকে হালকা করে দেখি। ভাবি, লুনাভা মিনিও কিছু দিনের মধ্যে তা-ই করবে। পরের দিনগুলো কেমন হওয়া উচিত, তা-ও ভেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হয় না। মনে হয় সে আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমি তার উপর কর্তৃত্ব করি। সে আমাকে পাত্তা দেয় না। আমি বুঝতে পারি না, সে কি ব্যাপারটা রহস্যময় করতে চায়, নাকি ভয়ে সে পিছিয়ে আছে, নাকি আত্মবিশ্বাসহীনতা, অথবা, কিছু উপদেষ্টা যেমন বলল, নারীর সচেতনভাবে প্রেমিককে কষ্ট দেয়া। আমি তাদের বিশ্বাস করি, আর সব কিছুর ইতিবাচক ব্যাখ্যা দাঁড় করাই।

আমার সব চেয়ে বড় সমস্যা ছিল লুনাভা মিনির নীরবতা। নীরবতা ছিল অসম্মতির লক্ষণ। অথচ গরুর দল বলত নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। আমি গরুর দলকে বিশ্বাস করি। ফলে আমি লুনাভা মিনির নীরবতা ভাঙ্গানোর জন্য তোড়জোড় শুরু করি। মূল বিষয় নিয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই আমরা আলোচনা করিনি, যদিও আমি ইশারা-ইঙ্গিতে অনেক কিছু বলেছি। আমি ভাবি, লুনাভা মিনির সাথে খোলামেলা আলোচনা করে বরফ গলাব।

খোলামেলা আলোচনা কী করে শুরু করতে হয়, তার সম্পর্কে আমার কোনও ধারনা ছিল না। গোপনে এক হাজার বার বলি, আমি তোমাকে ভালবাসি, আর প্রতিবারই বুঝতে পারি, এ কথা বলার সময় আমার মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, আর আমাকে আহাম্মকের মতো দেখাচ্ছে। যখন মনে হয় আমাকে আহাম্মকের মতো দেখাচ্ছে তখন ভাবি, ছেড়ে দিব। কিন্তু বুঝি, ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়। ছেড়ে দেয়া হয়তো যেত, যদি আমি আত্মহত্যা করতে শিখতাম। আমার যে আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল না, তা আমি ছোটকাল থেকেই জানতাম। তবুও এ পর্যায়ে এসে আমি আঙ্গুল দিয়ে শ্বাসনালী চেপে পরীক্ষা করে দেখি। আর দেখি আসলেই আমি আত্মহত্যাকারী সম্প্রদায়ের কেউ নই। প্রেমের প্রস্তাব মামুলি বিষয় মনে হয় বলে আমি ক্ষুব্ধ হই, কারণ আমার মনের অবস্থা তখন চরমে। পরে শুভাকাঙ্ক্ষীরা অধৈর্যের জন্য আমাকে ভর্ৎসনা করেছে। তখন একটা করে দিন যেতে থাকে, আর আমি লুনাভা মিনিকে দিয়ে জোর করে আমাকে ভালবাসিয়ে না নিতে পারার জন্য ছটফট করি। শেষ পর্যন্ত প্রেমের প্রস্তাব করার নামে আমি সব কিছু নষ্ট করি।

ওটা ছিল পুরোপুরি লজ্জার একটা বিষয়। প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে আমি চোখ

দিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করতে চাই। প্রেমের জন্য চোখের ভাষা উপকারী বলে শুনেছিলাম। অথচ আমার চোখের ভাষা আমার কোনও উপকার করেনি। প্রেমে আমি এত দুর্বল ছিলাম যে, আমি লুনাভা মিনির সামনে আমার চোখ দু'টি তুলে ধরতে ব্যর্থ হই। ফলে আমার চোখ লুনাভা মিনির উপর কোনও প্রভাবই ফেলেনি। যদি জানতাম আমার চোখ আমারই ধ্বংস ডেকে আনবে, আমি লুনাভা মিনির দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা ইতরের মতো তাকিয়ে থাকতাম না আর লম্পটের মতো ঠোঁট ভিজাতাম না।

নিজে দুর্বল প্রকৃতির ছিলাম বলে লুনাভা মিনির চারিত্রিক দৃঢ়তাকে আমি ভক্তি করতাম। অথচ উপরে উপরে আমি তাকে উত্ত্যক্ত করে চলি। যে দিন কেউ বলে মেয়েরা অসুখী ছেলেদের প্রেমে পড়ে, সে-দিন আমি অসুখী ভাব করি। যে দিন কেউ বলে মেয়েরা হাসিখুশি ছেলেদেরে প্রেমে পড়ে, সে-দিন কোন কারণ ছাড়াই ছাগলের মতো হাসতে থাকি। অনেক সিরিয়াস কাজ করব বলে ভাবি। কিন্তু কোনও কিছু করা হয় না। কোনও কিছু তাকে বলাও হয় না। যা করি তা হল, লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখা, সেই অভ্যাস, যা আমি ছোটকাল থেকে রপ্ত করেছি। প্রেমিক হিসাবে এটাই আমার একমাত্র ট্রেনিং : গোপনে মেয়েদের শরীর দেখা। এ ক্ষেত্রে আমার চেয়ে পারঙ্গম সে পৃথিবীতে আর কেউ ছিল বলে এখনও জানতে পারিনি। আর লুনাভা মিনিতো সেই মানবী, ঈশ্বর যাকে পরিশুদ্ধ করে তৈরি করেছিলেন। লুনাভা মিনির সামনে বসে থাকতে পারাটাই ছিল পরম সৌভাগ্যের। তার একটুখানি উন্মুক্ত ত্বক দেখতে পারা তা হলে কতখানি সৌভাগ্যের তা অনুমান করুন। লুনাভা মিনির মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এমন কিছু নাই, যার দিকে আমি কামনার দৃষ্টিতে তাকাই না। যা চোখে দেখি না, তারও রূপ, রস, গন্ধ টেনে তুলে আনি। সব কিছুর সাথে ভিন্ন ভিন্ন খুশবু আর ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ যুক্ত করি।

মাঝে মাঝে সে সাড়া দেয়। কোমলতা আর উদাসিনতা দিয়ে সে আমাকে গ্রহণ করে। বুঝি, এটা তার ভদ্রতা মাত্র। সে জানে না, তার জন্য কী দুর্ভোগ আমার যাচ্ছে। ভাবি, শুধু যদি সে জানত, কত সুখী না সে হত। আমি চাইতাম সে রানীর মতো মাথা উঁচু করে চলুক। কাউকে কখনও বুঝিয়েই বলতে পারিনি, লুনাভা মিনির মনে ভালবাসা জাগানোর আকাঙ্ক্ষা আমার কত তীব্র ছিল। ঈর্ষা আর করুণা আমার রক্তকে দুষিত করে। রক্তের সে দোষ

আমার কখনও সারেনি। সে দোষ নিয়ে আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি পরকালে আসার পরও ইহকালে আমার রক্তে লুনাভা মিনির সৃষ্টি করা বিষ পাঁচ মহাসাগরের পানিকে বিষাক্ত করতে থাকে। সেই বিষ অনেক জাহাজের তলা ফুটা করেছে। নদীর পাড়ের জঙ্গল পুড়িয়েছে। সেই বিষ খেয়ে এখন পর্যন্ত অনেক তিমি বেঘোরে তটের দিকে চলে গেছে। সৌভাগ্যবান হলে আপনিও আমার রক্তের সেই বিষে মরে যাওয়া কোনও তিমিকে আপনার দেশের তটভূমিতে রোদে শুকাতে দেখেছেন। এই সব কথা পরে কখনও বলব। এখন লুনাভা মিনির কথা বলি। লুনাভা মিনির জন্য নিজেকে সংশোধন করতে গিয়ে আমি মরিয়া হয়ে উঠি।

দিন দিন আমার আচরণ বালখিল্য হয়। আর আমাদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। সারারাত পরিকল্পনা করি, আর সকালবেলা হাঁটতে বের হই। সব কিছু মুক্ত আর সতেজ মনে হয়। সাফল্যের আশায় মন ভরে উঠে। কিন্তু বেলা যত বাড়ে, আমার সুখ তত কমে আসে। শেষে যখন লুনাভা মিনির বাড়ি যাওয়ার সময় হয়, তখন তাকে কিছু বলা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তাদের বাড়ির আশপাশে ঘুরে, দু'একটা ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে, ফিরে চলে আসি। এ ভাবে এক মাস কাটাই। লুনাভা মিনিদের বাড়িতে আমার যাতায়াত অনিয়মিত হয়ে আসে।

মাঝে মাঝে সে জিজ্ঞেস করে, আমি কেন আসিনি। আমি বলি, এক রোগিকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি বা একটা দাতব্যের কাজ করেছি। তখন আমি দাতব্যের কাজে অংশগ্রহণ করা শুরু করি। ভাবি, ঈশ্বর অন্তত দাতব্যের কাজের জন্য আমাকে করুণা করবেন, আর আমাকে লুনাভা মিনির মন পেতে সাহায্য করবেন। যত না দাতব্যের কাজ করি, লুনাভা মিনিকে বলি তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই প্রার্থনার সময় মনে হয়, ঈশ্বর আমাকে মিথ্যা বলার জন্য শাস্তি দিচ্ছেন। ফলে তখন আবার চুপ মেরে যাই, যতক্ষণ না লুনাভা মিনি নিজেই তামাসাচ্ছলে আমার দাতব্যের কাজের খোঁজখবর নেয়। আর একবার সে খোঁজ নিলে, আমি অনেক মিথ্যা কথা বলি।

এ সময় আমি আগের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি ধর্ম পালন করি। এক মাস ধর্মগ্রন্থের সব নির্দেশ মেনে চলি। আমি দুইগুণ বেশি প্রার্থনা করি। আগে অভিবাদন জানাই। পোশাক না খুলে গোসল করি। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজি। মেহন থেকে বিরত থাকি। আর কৌতুক করেও মিথ্যা বলি না।

সেই এক মাস আমি লুনাভা মিনিদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখি। সেই ধর্মগ্রন্থ পড়তে গিয়ে আর এক সমস্যায় পড়ি। সত্য কথা বলতে কী, প্রেমের জন্য আমি অনেক শাস্তি পেয়েছি। ওই ধর্মগ্রন্থটা পড়াও একটা শাস্তি ছিল। তখন আমার মন এত খারাপ যে, কেউ যদি আমাকে ছোট একটা সংবাদপত্রের শুধু প্রধান শিরোনামগুলো পড়তে বলত, তা শেষ করতেও আমার এক দিন লেগে যেত। অথচ অত বড় গ্রন্থটা আমাকে খুব কম সময়ে পড়ে শেষ করতে হয়। সেখানে কী না ছিল? পৃথিবী কীভাবে, কত দিনে, সৃষ্টি হল; কে মাছের পিঠে চড়ল, কে গাছের আগায় উঠল; কে বন্যায় ভেসে গেল। কে বোন বিয়ে করল। কে মায়ের পেটে সন্তান জন্ম দিল। আমি পাতার পর পাতা পড়ে যাই। অথচ আমার কথা কিছু পাই না। ফলে আমি ধরে নিই, সেই গ্রন্থে আমাদের প্রেমের বিরুদ্ধে কিছু নাই।

এক দিন শপথ করি, আমি লুনাভা মিনিকে সব কথা খুলে বলব। সিদ্ধান্ত নিই, তাকে আমার কথা এতটা জোর দিয়ে বলব, যাতে সে বাধ্য হয়ে 'হ্যাঁ' বলে ফেলে। সে-দিন সে বুঝেছিল, আমার আর এক মুহূর্তও দেরি সহ্য হচ্ছিল না। এর মধ্যে আমার মনে হতে থাকে, যদি আমি দেরি করি, অন্য কেউ হয়তো তার মনে জায়গা করে নিবে। আমি সব কিছু সহ্য করতে পারি, কিন্তু কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারি না। সে বাস্তব হোক কি কল্পনার হোক। আহার, পোশাক, আর প্রার্থনা ছাড়া সব কিছু আগেই বাদ দিয়েছি। কিছু দিনের মধ্যে প্রার্থনাও একঘেয়ে লাগে। ফলে আমার দিন কাটে শুধু এই ভয়ে যে, এর মধ্যে কেউ লুনাভা মিনির হৃদয়ে ঢুকে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তা আমাকে দিয়ে তার সম্বন্ধে নানান গল্প বানিয়ে নেয়। আমি ভাবতে থাকি, কীভাবে লুনাভা মিনি আমার শত্রুকে অনুভব করছে, কীভাবে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা মারছে। আমার অনুপস্থিতিতে অনেক ছেলে তার কাছে যেত। আমার সামনেই কেউ কেউ তাকে টেলিফোন করত। সে আমার অনুমতি নিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে যেত, যদিও সে তাড়াতাড়ি ফিরে আসত। আমার ধারণা তাই একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

খোলামেলার আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু সে-দিন বিকেল বেলা যখন কথা বলার সময় আসে, আমি শুধু নানান ভাবে তার খোঁজখবর নিতে সক্ষম হই; আর নানান দিক থেকে তার দিকে তাকাতে।

আর এক দিন; সে আমার সাথে ভালভাবে কথা বলছিল। সে দিন আমি

কিছু সূচনা মন্তব্য করি। জানতাম তাতে কোনও কাজ হবে না। কিন্তু প্রেমের প্রস্তাব দেয়াতো সহজ কাজ নয়। এ কাজ শীতের ভোরে ঠাণ্ডা পুকুরে ঝাঁপ দেয়ার মতো। কিন্তু গোসলতো করতেই হয়। শেষ পর্যন্ত আমি মুখ ফসকে কিছু একটা বলে ফেলি। কিন্তু যা বলি, তার মানে সে বা আমি কেউ ধরতে পারি না। পরীক্ষায় বসে আমি সব ভুলে যাই। সে সময় লুনাভা মিনির মনে কোনও মায়াদয়া ছিল না। সে সময় লুনাভা মিনি মধু থেকে বিষে পরিণত হয়। আর আমার দিকে কঠোর চোখে চায়।

আমাকে কিছু বলতেই হবে, না হলে ব্যাপারটা খুব হাস্যকর হবে। আমি বলি, "তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"

"বলেন, বলেন," লুনাভা মিনি বলে। মনে হয় ট্রেন তখনই ছেড়ে দিবে।

আমি দ্বিতীয় কোনও কথা খুঁজে পাই না।

"বলেন, কী আপনাকে অশান্তি করছে?" লুনাভা মিনি বলে।

"তুমি কি শুনবে?"

"শুনব, যদি শোনার মতো কিছু হয়।"

আমি আর উৎসাহ পাই না। আমি ভাবতাম, তার হৃদয় থেকে ভালবাসা উপচে পড়ছে। সামান্য ডাক পেলেই সে সাড়া দিবে। মনোযোগ দিয়ে সে আমার কথা শুনবে; ঘেমে কপাল ভিজাবে; আর বাকি জীবনের জন্য সে আমার হবে। আমি শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম : কোনও নারীই কোনও পুরুষের পুনঃপুন প্রেমনিবেদনে অবিচল থাকতে পারে না। এমনকি প্রাত্যহিত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও না। ভালবাসা সব বোঝা টেনে তোলে, এমনকি তা যদি পৃথিবীর সমান ভারীও হয়। সে দিন আর বেশি কথা না বলে আমি সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে বের হয়ে চলে আসি। লুনাভা মিনি বিচলিত হয়ে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় দেয়।

সে দিন কাঁদতে কাঁদতে আমি আমার নির্জন হোস্টেলকক্ষে প্রবেশ করি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি, কেন সে বিচলিত হল। প্রথম দিকে আমি যখন তাদের কাছে আমার ভালবাসার কথা বলতাম, তারা আশ্চর্য হত, কারণ তারা জানত, বিশ্বাসের প্রভেদের কারণে আমাদের প্রেম টিকবে না, তারা আমাকে ফিরে আসতে বলত। এখন তারা আমাকে সে-ভাবে উপদেশ দেয়, যে-ভাবে আমি তাদেরকে বলি আমাকে উপদেশ দিতে। এর মধ্যে তারা বুঝে গেছে, কী বললে আমি খুশি হব। সে-দিন তারা বলে :

প্রেমের এমন নির্লজ্জ প্রকাশে যে কোনও মেয়েই রূঢ় হতে বাধ্য, যদিও এক দিন কেঁদেকেটে সে তার দ্বিগুণ প্রতিদান দিবে। তারা বলে, মেয়েদের আরও সাবধানে নাড়াচাড়া করা উচিত। তাদের কথা শুনে আমি দেয়ালে মাথা কুটি। কেন আমি জীবনে এক মুহূর্তও ধৈর্য ধরতে শিখিনি?

২৬

এক দিন এক জুতার দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দোকনদার আমাকে বলে, "আপনি ভালবাসায় কষ্ট পাচ্ছেন।"

আমি বলি, "সত্যি।"

"তার নাম কী? আমি কি কোনও সাহায্য করতে পারি?"

আমি নাম বলি, তবে ধর্মের ব্যাপারটা গোপন করি। দোকানিও তা জিজ্ঞেস করে না। সে বলে, তার নানা থেকে পাওয়া জ্ঞান সে এক সময় অনুশীলন করে মানুষকে ভালবাসার কষ্ট থেকে বাঁচাত। সেই বড় ঝড়টির পর-যা তাদের লোকালয়ের সব গাছ উপড়ে ফেলে আর তরুণদের ক্ষুধা ছাড়া অন্য সব কামনা ছাড়তে বাধ্য করে-প্রিয় কাজটি সে ছেড়ে দেয়। খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে সে জুতার দোকানে চাকরি নেয়। সে বিনামূল্যে ব্যর্থ প্রেমিকদের চিকিৎসা করে। তার আশা, এক দিন সে তার পুরনো পেশায় ফিরে যেতে পারবে। সে বলে, খদ্দেরের পায়ে জুতা ঠেলে ধরার সময় যে গন্ধ ভেসে আসে তা সে সহ্য করতে পারে না।

ওই সময় আমার ভিতর কোনও যুক্তি কাজ করত না। তা ছাড়া, ঝড়ের কথাটা সে বাড়িয়ে বলেনি। আমি দরদাম না করে তিন জোড়া জুতা কিনে পরের দিন নির্দেশমতো তার সাথে দেখা করি। নীল কাগজে মরিচের গুঁড়া, চিনি, আর মধুর মিশ্রণ দিয়ে পবিত্র বাণী লিখে সে আমার জন্য দশটা তাবিজ তৈরী করে রেখেছিল।

দোকানি ক্যাশবাক্সের সামনে বসা। আমি তার উল্টা দিকে একটা টুলে বসি। খদ্দেররা হাসাহাসি করে। আমি কাঁচুমাচু হয়ে শুনি। সে বলে,

"আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। আজকে কাস্টমারের চাপ বেশি।" এক-একটা তাবিজে আলাদা করে ফুঁ দিয়ে সে বলে, "নয়টা তাবিজ লাল সূতা দিয়ে বেঁধে নয়টা গাছের শাখায় ঝুলিয়ে দিবেন। প্রতিটা তাবিজের সাথে আপনার প্রেমিকার হৃদয়ের সংযোগ দেয়া হয়েছে। এগুলো যখন বাতাসে দুলবে, তখন আপনার প্রেমিকা স্থির থাকতে পারবে না। সে আপনার কাছে ছুটে আসবে। এখন ঠিক করেন, তাকে আপনি কোথায় রাখবেন। হোস্টেল ছেড়ে দিন। বাসা ভাড়া করুন।"

তার কথা শুনে কী যে ভাল লাগে। আমি গাছে চড়তে পারি। সুপারি গাছে উঠতে গিয়ে জীবনে প্রথম ঘর্ষণের সুখ অনুভব করি। শহরে গাছপালা কম। যা-ও কিছু ছিল, তা আবার দশাশই গোছের। নয়টা গাছ এক জায়গায় খুঁজে পাব কি না, এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করি।

"চিন্তার কিছু নাই," দোকানি বলে। "প্রধান পার্কে যান। সেখানে অনেক গাছ আছে।"

আমি লুনাভা মিনির হৃদয় দোলানোর জন্য ব্যাকুল হই। তাবিজগুলি ভাঁজ করার সময় দোকানির চোখের পাতা নড়ে না। তার মনোযোগ দেখে আমার মাথা হালকা হয়ে যায়। দশম তাবিজটি হস্তান্তর করে সে বলে, "এবার সাবধানে শুনুন। সন্ধ্যার সময় ওগুলো গাছের ডালে ঝুলাবেন। সূর্যাস্তের পর হোস্টেলে চলে আসবেন। জুতা খুলে রুমে ঢুকবেন। গোসল করবেন। গোসলের সময় পরপর তিন কোশ পানি গিলবেন, প্রতি কোশ পানি গেলার আগে 'লুনাভা মিনি' স্পষ্ট করে উচ্চারণ করবেন। রাতে খাবার গ্রহণ ও হাতের ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। পবিত্র অবস্থায় বিছানায় পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে তার উপর বসবেন। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তার সামনে বসে এই তাবিজটা ডান হাতের মুঠিতে নিয়ে ধীরে ধীরে তাকে ধ্যান করবেন। ধ্যানের সময় আপনার প্রেমিকার নাম বিশুদ্ধভাবে জপ করবেন। কি, পারবেন না?"

আমি জানতাম, ওতে কোনও কাজ হবে না। তারপরও যা সে এক সপ্তাহ করতে বলে, আমি তা এক মাস করি। কিন্তু কাজটা আমি ভাল করিনি। তাবিজগুলো ব্যর্থ হওয়ার পর আমার হতাশা বেড়ে যায়। এর মধ্যে এক সফল প্রেমিকের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়, যে প্রতিদিন বিকালে তার প্রেমিকাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে তারা একে অন্যকে খামচে ধরে। এতে নাকি এমন মজা, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা সংসার পাতার

আগে অন্তত পঁচিশ বছর শুধু ঝোপের আড়ালে যাবে। চুল পাকার আগে বিয়ে করবে না। আর আমার প্রেমিক বন্ধুর বংশে বয়স পঞ্চাশ হওয়ার আগে কারও নাকি চুল পাকে না। প্রেমিক বন্ধু আমাকে বলে, তোমার প্রেমিকার জন্য ফুল নিয়ে যাও।

আমি সারা শহর ঘুরে লুনাভা মিনির জন্য সবচেয়ে বড় আর তাজা গোলাপ ফুলটা কিনি।

লুনাভা মিনি তা প্রত্যাখ্যান করে।

তাবিজ আর গোলাপ ফুল ব্যর্থ হওয়ার পর আমি বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। আমি আর নীরব থাকতে পারি না।

"দেখো না, তোমার জন্য আমি কত দুর্বল?" এক দিন আমি সাহস করে বলে ফেলি।

লুনাভা মিনি চাপা হাসি হাসে। "এ কথা আমি অনেক শুনেছি।"

দুই দিন পর সে আমাকে একটা স্লিপ দেয়। স্লিপটা তার নিজ হাতে লেখা :

"যাকে আপনি খুব পছন্দ না করলেও অপছন্দ করেন না, তার জন্য কি আপনি কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন?"

'খুব পছন্দ না করলেও' কথাটা আমার চোখে পড়ে সবার আগে।

আমরা শ্রোতারা, ভেবে দেখুন, লুনাভা মিনির মুখ থেকে এমন কথা শুনলে আমার কেমন লাগতে পারে? তখন আমার মনে হয়েছিল, সত্যি কি লুনাভা মিনি আমার মনের কথা, আমার আকুলতা, জানে না। তা হলে আমি কি তাকে কিছুই বোঝাতে পারিনি? সে কথা জানলেই সে কি আমাকে ভালবেসে ফেলবে? তাকে জানানোর বিদ্যাটা শিখলেই কি আমার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে না? তার স্লিপের ওই অংশের উত্তর দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। তবে আমি তার স্লিপের মধ্যে আরও গুরুতর বিষয় আবিষ্কার করি। সে-আবিষ্কার আমাকে আরও কঠিন দুশ্চিন্তায় ফেলে। বুঝতে পারি না, কী চাচ্ছে সে আমার কাছে। সে কি চাচ্ছে আমি আমার ধর্মগ্রন্থ ত্যাগ করে তার ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ করি? তা করার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মন কিছুতেই সায় দেয় না বিধর্মী হতে। আমি ভয়ে সারা। নিজের ধর্ম ত্যাগ করার সাহস আমার নাই। প্রেমের দাবিও আমি ছেড়ে দিতে পারি না। আমি লুনাভা মিনির উপর রাগ করি। আমি তার আস্পর্ধার কথা ভাবি। সে মেয়ে। আমি ছেলে। তারইতো উচিত আমার ধর্ম গ্রহণ করা। তা ছাড়া, ওটা ছিল আমাদের ধর্মের অধিকার। ছেলে বা মেয়ে

যেই হোক, তারা যদি আমাদের প্রেমে পড়ত, তাদেরকে আমাদের ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ করতে হত। পৃথিবীর যে কোনও দেশে, আমরা ম্যাজরিটি কি মাইনরিটি, এটা ছিল আমাদের ধর্মগত অধিকার। লুনাভা মিনি নিশ্চয়ই অভিসন্ধি করেছে। সে নিশ্চয়ই নিয়ম ভঙ্গ করে দিতে চায়। আমরা যে নিয়ম চালু করেছিলাম, সে নিয়ম সে তাদের ক্ষেত্রে চালু করতে চায়। লুনাভা মিনি সম্পর্কে এমন খারাপ চিন্তা করার পরও তার জন্য আমার প্রেম কমে না। নিরুপায় হয়ে আমি মনে মনে ধর্মগুলোকে গালি দিই। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অনন্ত-অসীম পরকাল নিয়ে চর্চা করে, পৃথিবীতেতো তার মাত্র একটা থাকা দরকার ছিল। অথচ ছিল ৩০০০ টা। ৩০০০ ধর্মের ৩০০০ ঈশ্বর নিয়ে ৩০০০ শ্রেণির পাদ্রির রশি টানাটানি। কারও চেয়ে কেউ কম যায় না। সবার দাবি, আমাদেরটাই সঠিক। তা হলে, সঠিক কোনটা? ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আমি রাগ কমাতে পারি না।

আমি সারা রাত ভাবি। এক সময় মাথা ঝিঁঝিঁ করে। ঘুমঘুম লাগে। আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি, যাতে আর ভাবতে না হয়। কিন্তু ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ পর উঠে বসে থাকি। ভাবি, গোপনে ধর্ম ত্যাগ করলে কেমন হয়। বিধর্মী হয়ে লুনাভা মিনিকে বিয়ে করব। ঘরের মধ্যে তার ধর্ম পালন করব। ঘরের বাইরে আমার পুরনো ধর্ম। কেউ জানবে না। তখন আমি বিশ্বাস করতাম, আমরা আমাদের ধর্মের অনুসারীরা চিরকাল স্বর্গে বাস করব। লুনাভা মিনিসহ পৃথিবীর বাকি সব ধর্মের অনুসারীরা চিরকাল নরকের আগুনে জ্বলবে। অল্প কয় বছরের প্রেমের জন্য চিরকাল নরকের আগুন কিনে নিব? সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। বেচারা লুনাভা মিনি নরকে যাবে। তার নরকের আগুনে জ্বলা আমার মনে তেমন রেখাপাত করে না। এখন, মৃত্যুর পর, আমি বুঝি, আমি কত স্বার্থপর ছিলাম। আমি শুধু আমার কথা ভাবছিলাম। মনে মনে আমি চাইছিলাম, লুনাভা মিনি আমার ধর্ম গ্রহণ করুক। পরকালের নরক থেকে মুক্তির জন্য নয়; ইহকালের লোকলজ্জা থেকে আমি যাতে বাঁচতে পারি, আমি যাতে আমার পাদ্রিদের সামনে মাথা উঁচু করে বলতে পারি, আমি এক বিধর্মীকে আমাদের ধর্মে এনেছি, এনে তাকে আমার ক্রীতদাস বানিয়েছি। আপনার ঘোষণা দিন : এ মহৎ কাজের জন্য পরকালে আমার প্রাপ্য প্রাসাদের সংখ্যা। আমি উদাহরণ সৃষ্টি করেছি।

আমি সারা রাত আকাশকুসুম কল্পনা করেছি। কিন্তু সত্য কথা হল লুনাভা মিনিকে ধর্ম ত্যাগ করার প্রস্তাব দেয়ার আমার কোনও সুযোগই তৈরি হয়নি,

সাহসতো পরের কথা। আমি চালাকি করি। অনেক ভেবেচিন্তে ভোরের দিকে আমি আমার স্লিপ লিখি।

বিকালে আমি তাকে আমার স্লিপটা দিই :

"সত্য আর ন্যায়ের সীমা অতিক্রম না করে আমি তোমার জন্য যে কোনও কিছু ত্যাগ করতে পারি।"

অতি আগ্রহ নিয়ে সে আমার ভাঁজ করা স্লিপটা খোলে। স্লিপটা পড়তে গিয়ে তার মুখ কুঞ্চিত হয়, যদিও সে চেষ্টা করে তার গাল দু'টি ভাঁজহীন রাখার। আমার স্লিপ থেকে সে আর চোখ তোলে না। দীর্ঘ সময় ধরে সে তা পড়ে, ঠাণ্ডা মাথায়। কত বার যে পড়ে, ঈশ্বর জানেন। তখন আমি বুঝতে পারিনি যে, ততক্ষণে সে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। খাতা থেকে এক টুকরা কাগজ ছিঁড়ে সে লিখতে থাকে। একটা অক্ষর লিখতে গিয়ে সে এক মিনিট করে সময় নেয়। আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি; আমি তার হাত থেকে টেনে নিয়ে কাগজটা পড়ি :

"আমি চাই আপনি আমাকে পড়িয়ে যান।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "বিনিময়ে আমি কী পাব?"

সে বলে, "কিছুই না।"

"তুমি আর আমার দেখা পাবে না।" এ কথা বলে রূঢ়ভাবে আমি তার ঘর থেকে বের হয়ে যাই।

আমি সে দিন যে ভুল করেছিলাম, তা আমার জীবনের পরিণতি ডেকে এনেছিল। পরে বহু বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছে, 'সত্য আর ন্যায়ের সীমা অতিক্রম না করে' লিখে আমি আমার সমূহ ক্ষতি করেছি। এবং 'আমি কী পাব' লেখাতে সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু তাদের কথা শোনার পর আমি বুঝতে পারি, আমি আমার কী ক্ষতি করেছি। না বুঝে আমি আমার হাত দু'টি কেটে ফেলেছি। এ জন্য কখনও আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি। অশ্রুকে করুণা করে, প্রেমকে মহিমান্বিত করে, আমার চির-অসহিষ্ণু হৃদয়ে সে ব্যথা লালন করে, আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সে তোমার হবে, যদি তুমি তার মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছ, সে ক্ষত ধীরে ধীরে সারিয়ে তুলতে পার।

আমি অধ্যবসায়ে নেমে পড়ি।

২৭

পরের দিন আমি লুনাভা মিনির কাছে যাই। সে এমন শীতল আচরণ করে, আগের দিনের ব্যাপারে কোনও কথাই বলা সম্ভব হয় না। তারপর কিছু দিন আমরা এমন ভাব করি, যেন কিছু ঘটেনি।

আমি আবার তাকে নিপীড়ন শুরু করি। আমি তাকে হুমকি দেই, আমি আর আসব না। সে কিছু বলে না। কিছু দিন যাতায়ত বন্ধ রাখি। কিন্তু বেশি দিন নয়। পাঁচ-ছয় দিন পর আবার তার কাছে গিয়ে হাজির হই। সে-দিন সে আমাকে কিছুটা উষ্ণতা দিয়ে গ্রহণ করে, তবে আমার কাছে আর পড়তে চায় না। এর ফলে আমার সর্বনাশ হয়। তার কাছে যাওয়ার আমার আর কোনও অজুহাত থাকে না।

তারপরও কোনও একটা ছুতা পেলেই আমি তার সাথে গিয়ে দেখা করি। যদি কাছে যাওয়া সম্ভব না হয়, কাছাকাছি কোথাও গিয়ে ঘোরাফেরা করি। আর তাতেই অনেক আনন্দ পাই। একদিন সকালবেলা রাস্তায় বের হই। দোকানে ঝুলানো খবরের কাগজে দেখি, তাদের পাড়ায় মারপিট হয়েছে। খবরটি দেখে এক দিনের ঘটনা মনে পড়ে। সে দিন বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার জ্বলার আওয়াজ শুনে সে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। সে কথা মনে আসতেই আমি তার বাড়ির দিকে ছুটে যাই, ফিডিপিডিসের মতো, যে পারস্য বাহিনীর আগমনের খবর দেয়ার জন্য ম্যারাথন থেকে এথেন্সে ছুটে গিয়েছিল। আমাকে তিনবার বাস বদলাতে হয়,আর অলিগলিগুলি আমি লাফ দিয়ে দিয়ে পার হই। গিয়ে দেখি সে ভাল আছে। আমার মন ভাল হয়ে যায়। সে আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে। আমি লাফাত লাফাতে আমার হোস্টেলে ফিরে আসি। আর একদিন ভোরবেলা—কোনও এক সাপ্তাহিক ছুটির দিন—খবরের কাগজে এক ছাত্রীর মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পড়ে আমি তাকে দেখার জন্য তার কাছে ছুটে যাই। যত বার তার কাছে যাই, তত বার সে আমাকে ভদ্রভাবে ফিরিয়ে দেয়। আর তার ভদ্র ব্যবহার আমার আশা জিইয়ে রাখে। একদিন আমি তাকে একটা চিঠি লিখি। চিঠি দিয়ে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করি। তাতে কাজ হয়। সে আবার পড়তে রাজি হয়।

কিছু দিন পড়িয়ে আমি আবার পাগলামি শুরু করি। পোশাক-আশাক আর পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ দিই। দৃঢ়চেতা হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করি। আমি তাকে নতুনভাবে উত্ত্যক্ত করি। ইশারায় তাকে বলি, পৃথিবীতে নারীর অবস্থা খারাপ। ডাকাত আর প্রলুব্ধকারীর কাছে তারা অরক্ষিত। কিন্তু আমি তাকে রক্ষা করব। আমি বীর হব, দানব হব, যোদ্ধা হব, অস্ত্র চালনা শিখব। যে-সব দুর্বৃত্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আক্রমণ করার জন্য, বা যে-সব প্রতারক তাকে একবার ভোগ করে চলে যাবে, তারা কেউ তার কাছে আসতে পারবে না। অমরত্ব-সুধা গায়ে মেখে আমি তাকে আগুনের কুণ্ডলি থেকে উদ্ধার করব। আমি সাঁতার জানি। কাজেই পুকুর, নদী বা উপকূল অঞ্চলে তার ডুবে যাওয়ার ভয় নাই। "প্লিজ, লুনাভা মিনি, তুমি রাজি হও। শুধু আমার জন্যে নয়। তোমার জন্যেও বলছি। জীবনে এখন পর্যন্ত এক ফোঁটা আনন্দ করিনি, এমনকি এক বেলা খাবারও উপভোগ করিনি।"

এসব কথা বলে এসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। ঈশ্বরের নিকট করুণা চেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাঁদি। তার সামনে স্বাভাবিক আর তার পিছনে অসহায়, এই দুই সত্তার চাপে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। রাতের বেলা ধ্বংসাত্মক কিছু করব বলে মন চাঙ্গা করি; সকালবেলা মানুষের মুখ দেখে মিইয়ে যাই। নিজেকে জিজ্ঞেস করি, কেন আমি এত কষ্ট ভোগ করছি। এ সময় নারীহীন জীবনের কাছে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করি। যত আমি বিকল্পের কথা ভাবি, তত মনের মধ্যে সেকেন্ডের কাঁটা টিক টিক করে বলতে থাকে, জীবনের নারী জীবনে শুধু এক বার আসে। ভাব করি, আমার চেয়ে আমি লুনাভা মিনির কথা বেশি চিন্তা করছি। কেন সে বুঝতে পারছে না, আমি ছাড়া আর কেউ তাকে সুখী করতে পারবে না? কেন সে প্রেমহীন বাস্তবতা মেনে নিয়ে জীবন কাটাতে চায়? এ কথা আমি সহ্য করতে পারি না যে, ক্ষুদ্র কিছু কারণে—বিশ্বাসের পার্থক্য বা পানপাতা চিবানো—আমি তাকে পাচ্ছি না। ভাবি, যে ভাবেই হোক তার মন বদলাব, দরকার হলে তার পায়ে গড়াগড়ি খাব। উপদেষ্টারা আমার পায়ে শিকল বেঁধে আমার মানসম্মান বাঁচায়।

২৮

লুনাভা মিনি গান জানত। কিন্তু আমার সামনে এমনকি গুণগুণ করেও সে কিছু গাইত না। সে-দিন তার কাছে আমার যাওয়ার কথা ছিল না। তারপরও যাই। সে-সব দিনে এক পলক তাকে দেখার সুখ, এমনকি পিছন থেকে হলেও, আমার সারা জীবনের সুখের সমান ছিল। সে-দিন আমি যত সে-বাড়ির দিকে এগিয়ে যাই, তত বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ছাড়িয়ে তার গলা শুনতে পাই। এই দুর্যোগের সম্ভাবনা আগে কখনও মনে আসেনি। আমি জানতাম সে গান ছেড়ে দিয়েছে। অন্তত আমার প্রতি সদয় হয়ে সে তা করেছে। কারণ সে জানে, আমি তার গান শুনলে পাগল হয়ে যাব। শ্রোতারা আমাকে ক্ষমা করুন। সে-দিন তার গান শুনে কেমন বোধ করেছিলাম, তা বলার সাধ্য আমার নাই। শুধু এটুকু বলতে পারি, তার কণ্ঠের ধার আমার হৃৎপিণ্ড কেটে ফেলেছিল। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শত্রুরা পরিকল্পনা করেছিল, তারা আমাদের সব পুরুষকে খুন করবে, আর আমাদের সব নারীকে তাদের দেশে নিয়ে যাবে, যাতে তারা তাদের নষ্ট সন্তানগুলো আমাদের দেশে পাঠাতে পারে আমাদেরকে আরও নষ্ট করার জন্য। পাদ্রির প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশেও ছিল। কিন্তু আমাদের শত্রু রাষ্ট্রটি ছিল বেশ ব্যতিক্রম। ওটা ছিল পাদ্রিদের, পাদ্রিদের জন্য, এবং পাদ্রিদের দ্বারা পরিচালিত একটা পাদ্রিতন্ত্র। আমরা তাদের ঘুসি মেরে বা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা ঘাড় ধরে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করতাম। কিন্তু তাদের কৌশল ভিন্ন ছিল। তারা এক-একটি করে আমাদের নারীদের আটক করত, আর সে নারীর সব পুরুষ আত্মীয় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এই আশায় যে, তারা তাদের নারীকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তারা তাদের নারীদের রক্ষা করতে পারত না। শত্রুরা আমাদের পুরুষগুলোকে দেখিয়ে দেখিয়ে নারীটিকে নিয়ে আনন্দ করত, আর তাকে জাহাজে তোলার আগে তারা পুরুষগুলোকে খুন করত। এক জন নারী জাহাজ থেকে পালিয়ে যায়। যে ১২ জন অফিসার তার সম্মান নষ্ট করেছিল, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সে তাদের সবাইকে খুন করে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতার হাত থেকে বীরত্বের খেতাগ গ্রহণ করার সময় লিখিত বক্তৃতায় সে নারী বর্ণনা করে, তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ

সময়ে তার আর্তচিৎকার কীভাবে তার স্বামী, চার ভাই, আর পিতার হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল। ঈশ্বরের সুন্দর পৃথিবীতে, আমার স্বল্পকালীন জীবনের শেষ দিনগুলোতে, আমি যখন লুনাভা মিনিকে ভোলার শেষ চেষ্টা হিসাবে অনেক বইপত্র পড়ছিলাম, তখন ২৩৮ খণ্ডে সংকলিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের এক খণ্ডে সে নারীর বক্তৃতাটি আমি পড়েছিলাম। আর তখন আমি বুঝেছিলাম, লুনাভা মিনির গানের সুর সেই সন্ধ্যায় আমার হৃদয়কে কীভাবে দলিতমথিত করেছিল।

সেই সন্ধ্যায় আমি জ্বর-ওঠা রোগির মতো ঠকঠক করে কেঁপে উঠি। কী গান গাইছে সে? সে গান যদি মৃত্যুর, বা দাতব্যের, এমন কি প্রার্থনা সঙ্গীতও হয়, তা-ও আমি সহ্য করতে পারব না। আর যদি তা প্রেমের গান হয়, আমি মরে যাব। সে-সময়, তার গান শুনে ফেলার পর, আমার বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল, লুনাভা মিনির গলা চিপে ধরে তার থেকে আমার প্রেমের প্রতিদান আদায় করা। এ ছাড়া আর কোনও কিছুতে আমার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রেমের প্রতিদান পাওয়া যে ওই অবস্থায় সম্ভব নয়, তা যে কোনও পাগলও বুঝবে। আর লুনাভা মিনিকে ভালবেসে আমিতো কখনও পুরোপুরি পাগল হয়ে যাইনি। তাই ভয় হয় কী করে আমি যে রাতটা আসছে তা পার করব। কারণ, ওটা প্রেমেরই গান ছিল। লুনাভা মিনিতো নিশ্চিত করেছে, সে আমার হবে না। অথচ তার কণ্ঠে প্রেমের আবেদন। তবে কেন তা আমার থেকে নয়? আমি তার বাড়ির চারিদিকে ঘুরতে থাকি। কাছাকাছি আসি আর হাত দিয়ে কান চেপে ধরি। আবার দূরে চলে যাই। আবার কাছে আসি। সারাক্ষণ আঙ্গুল দিয়ে কানের ছিদ্র চেপে ধরি। তারপরও কিছু শুনে ফেলি। কোনও মেয়ে এমন করুণ করে গান গাইতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। যারা সঙ্গীত বেচেকিনে খায় আমি তাদের গালিগালাজ করি। ঈশ্বরতো ওই অস্ত্র দিয়েছে শুধু অবিচল নারীকে তার অবহেলিত প্রেমিকের হৃদয়কে নির্যাতন করার জন্য। কতবার যে দরজা পর্যন্ত যাই আর পিছিয়ে আসি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আমি কাঁদি। আমি সঠিক ছিলাম। তার হৃদয়ে প্রেম ছিল। সেই সব উপদেষ্টাদের গালি দিই, যারা বলত, আমার প্রেমিকার হৃদয় পাথর দিয়ে তৈরি। তারা কিছু জানত না। লুনাভা মিনি হৃদয় নিয়ে বসে আছে কাউকে দেয়ার জন্য। সে-দিন আমি অসহায়ের মতো উপদেষ্টাদের কাছে ফিরে যাই। তারা বলে, সে যখন গান গাইছিল, তখন আমার উচিত ছিল যে

কোনও মূল্যে তার সামনে উপস্থিত হওয়া। তাহলে গানের প্রেমিককে না কি সে আমার মধ্যে খুঁজে পেত।

"কী যে বোকামি তুমি কর।"

তারা আমার দুর্বলতার মাত্রা বুঝতে চাইত না। তারা চাইত, আমি তার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করি। তাকে বার বার আঘাত দিই।

সে-রাতে আমি নিশ্চিত হই, যে করেই হোক, লুনাভা মিনিকে আমার পেতে হবে। তাকে পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি, উপদেষ্টা, লেখক, শিল্পী, ডাকাত, যা কিছু হওয়ার দরকার আমি হব। গভীর রাত পর্যন্ত লাইব্রেরিতে বসে অনেক জীবনী ঘেঁটে দেখি, কীভাবে ছোট ছোট কাজ দিয়ে জীবন শুরু করে মানুষ রাষ্ট্রপতি হয়েছিল : পাবলিক বাসের কন্ডাক্টর, প্রিন্টিং প্রেসের ঝাড়ুদার, মুচি, পতিতালয়ের ম্যানেজার, নাইটক্লাবের গায়ক। এই উৎসাহ আমার বেশি সময় থাকে না যখন ভাবি, এক দিন হয়তো আমি রাষ্ট্রপতি হতে পারব, কিন্তু তত দিনে আমার আকাঙ্ক্ষা মরে যাবে, আর আমার প্রেমিকাও তত দিনে জরায় আক্রান্ত হবে। চামড়ায় ভাঁজ পড়বে। চুমু হবে টক। তখন পানিতে ধোয়া তার টাটকা ত্বকের ঘ্রাণ আর গ্রহণ করা হবে না। অথচ পৃথিবীতে কোনও বাসনা পরিত্যাগ করে বাঁচার জন্যতো আমি জন্মগ্রহণ করিনি।

অনেক আগেই ঈর্ষা আমাকে পেয়ে বসেছিল। এখন তা দানবে পরিণত হয়। আমি প্রশ্ন করি, কেন লুনাভা মিনি সময়ে-অসময়ে গান গাওয়া শুরু করেছে। সে নিশ্চয়ই কারও প্রেমে পড়েছে। আমাকে তার ভাল লাগে না, এ কথা আমি মানতে নারাজ। আমার তখন মনে হত, পৃথিবীতে লুনাভা মিনির চেয়ে আকর্ষণীয় কোনও মেয়ে নাই। তার চেয়েও বেশি মনে হত, পৃথিবীতে আমার চেয়ে আকর্ষণীয় কোনও ছেলে নাই। খবরের কাগজ, বইয়ের পাতা বা টেলিভিশন খুলে সিনেমার নায়ক, ফুটবলার, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ আর বড় বড় অফিসারদের দেখে মনে হত, তাদের কেউ গোসল করে না, কেউ দাঁত মাজে না, কেউ পরিষ্কার আন্ডারওয়্যার পরে না, কেউ পাগল, কেউ ছাগল। দুনিয়াতে আমি শুধু একমাত্র ত্রুটিহীন সুপরুষ। শুধু আমি লুনাভা মিনির যোগ্য। তারপরও লুনাভা মিনি আমাকে ভাল না বেসে অন্য একজনকে ভালবাসছে, আর তার উদ্দেশ্যে গান গাইছে। হতে পারে সে তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। লুনাভা মিনি ব্যর্থ প্রেমের কষ্ট পাচ্ছে। প্রত্যাখ্যানের কষ্ট আমার চেয়ে বেশি কে জানে? আমি মনে করি এটাই আমার সুযোগ। আমি তা

কাজে লাগাই। লুনাভা মিনির দুঃখের দিন চলছে। ততাই এখনই আমার তপ্ত লোহা পানিতে চুবান দরকার। ঝোপ বুঝে যদি কোপ না মারি তা হলে এই বাঘিনীকে আর কখনও কুপোকাত করতে পারব না। সে চিরদিনের মতো আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

২৯

এক দিন বিকালে কোপ মারার ভূত আমার উপর চেপে বসে। আমি লুনাভা মিনিকে বলে বসি, যদি সে এর মধ্যে কাউকে কথা দিয়েও থাকে, আমি তাকে সময় দিব যাতে সে দেয়া কথা ফিরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তাকে বলতে হবে, তারপর সে আমার হবে।

আমার কথা শুনে লুনাভা মিনির মুখ কালো হয়ে যায়। যদিও ওই কালো মুখ ভালবাসতে আমার কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ওই মুখের ক্রোধ আমি খুব ভয় পাই।

পরের দিন সে একটা ছবির অ্যালবাম নিয়ে আসে। অ্যালবামটা খুলে একটা ছবি আমার মুখের উপর মেলে ধরে আমার দিকে চোখ তুলে বলে,

"ঠিক আছে? আর কিছু বলার দরকার আছে?"

মনে হল আমি খাট থেকে আকাশে পড়ে গেছি। আকাশ খাটের নিচে। শুন্যে আমার বিছানা ছাড়া আর কিছু নাই। আমি এত দ্রুত পড়ছি। পড়তে পড়তে আমি শুন্যে মিলিয়ে যাব। কখনও মাটির নাগাল পাব না। অবশ্য আমার সম্বিত দ্রুত ফিরে আসে। তবে তখন আমার খুব মাথা ঘোরে। আর আমি বুঝতে পারি আমি দুঃস্বপ্নের জগতে চলে গিয়েছিলাম। যেমন দুঃস্বপ্ন শৈশবে দেখতাম, ঘুমের মধ্যে, বিশেষ করে যখন আমার জ্বর হত।

আমার চেতনা কেন লোপ পেয়েছিল তা আমি বলতে পারব না। তবে আজ দুই জগতের প্রজ্ঞা নিয়ে বলতে পারি ওই কয়েকটা মুহূর্ত আমার চেতনাহীন থাকার দরকার ছিল। না হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত।

চেতনা আসার পর আমি লুনাভা মিনির দিকে তাকাই। সে অ্যালবামটা

সরিয়ে নিয়েছে। কেন নিল জানি না। আমিতো ওটার উপর এমনকি প্রশ্রাবও করতাম না। আমি নিশ্বাস ফেলে একটু শান্ত হই। মনে হল লুনাভা মিনি কিছু বুঝতে পারেনি। সে অ্যালবাম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অবশ্য সে বুঝতে পারলেও আমাকে সে বুঝতে দিত না, এত চতুর ছিল সে। কিন্তু সে কাকে দেখাল।

আমি তার চেহারা ভাল করে দেখিনি। তবে দেখতে সে মোটেই আমার চেয়ে ভাল ছিল না। আর এ কারণে লুনাভা মিনির জন্য আমার মন কেমন করে উঠে। লুনাভা মিনির চোখে ব্যথার ছায়া। এই আঘাত একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। লুনাভা মিনি যে কারও সাথে প্রেম করছে, এটাকে আমি নিছক কল্পনা হিসাবে নিয়েছিলাম। সে-সময় তার চোখের তীর্যক দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এ রকম চরম সময়ে এ রকম ব্যথাতুর চাহনি প্রেমিকের দেহের মধ্যে তৈরি এসিড কী করে তার হৃৎপিণ্ডের দেয়ালের কয়েকটা স্তর পুড়ে ফেলে, তা আপনারা কেউ বুঝবেন না, কারণ আপনারাতো কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি, বা আমার মতো বেপরোয়াভাবে কখনও আপনারার ভালও বাসেননি। কী যে কষ্ট তখন আমার বুকে। আর কী যে শক্তিশালী সম্বিত চলে যাওয়ার আগেকার উত্থিত কামনার রেশ। যদি সেই মুহূর্তে কোনও এক জাদুবলে আমি লুনাভা মিনিকে বুকে নিয়ে পিষে ফেলতে পারতাম, তা হলে সে জীবনের সব পিপাসা আমার ওই এক মুহূর্তে মিটে যেত। সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা কাউকে যদি এক মুহূর্ত আলিঙ্গন করে মিটে যায়, সেই আলিঙ্গন কি করে ফেলা উচিত নয়? আর শত বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও লুনাভা মিনির কি উচিত ছিল না ওই সময়ে হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে তাকে আমাকে আলিঙ্গন করতে দেয়া? এতে কী এমন ক্ষতি হত তার? বড় জোর তার বুকের সলতে দুটোতে একটুখানি আগুনের ঝলসানি লাগত। তবে বিরক্তির কারণে তা-ও লাগত কিনা বলা মুশকিল। আর লাগলেই বা কী হত। এটাতো এমন কোনও বড় ক্ষতির বিষয় ছিল না। অথচ লুনাভা মিনি ওই সময় দারোগার ভূমিকায় অবতীর্ণ।

ফলে আমার অনুকূলে কিছুই ঘটে না। বরং আমার বুকে ঈর্ষার বিষ ছলাত-ছলাত বাড়ি মারে। নিজের পাতা ফাঁদে আমি নিজে ধরা পড়ে গেছি। সত্য কী, আমি জানি না। ওই সময় লুনাভা মিনির মুখের কথাই ছিল সব কিছু। আলিঙ্গন না হোক, অন্তত দু'একটি সুন্দর কথা বলেতো সে আমাকে বাঁচাতে পারত। অথচ সে সিদ্ধান্ত নেয়, আমাকে সে মেরে ফেলবে, শুধু মাত্র তাকে উত্ত্যক্ত

করার জন্য। এখন আপনারাই বলুন, শুধু মাত্র উত্ত্যক্ত করার জন্য কারও কি কাউকে মেরে ফেলা উচিত? জানি, আপনাদের কাছে আমার প্রশ্নের উত্তর নাই। তখন আমি যত ভাবি, ব্যাপারটা একটা ছেলেমানুষি, লুনাভা মিনি আর সেই ছেলে হয়তো দুই একটা কথা বলেছে, বা নাবালকের মতো এক জন আর এক জনকে কথা দিয়েছে, তত লুনাভা মিনির জন্য আমার প্রেম বেড়ে যায়। আমি তাকে বেশি করে ভালবাসি। কারণ লুনাভা মিনি আর একজনের প্রেমে পড়েছে, কারণ সে তার প্রতিজ্ঞা ধরে রেখেছে। আমি শুনেছিলাম, প্রেমিক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছুরি মারার জন্য অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে; অথচ ছবির ওই গোবেচারা ছেলেটার জন্য আমার ভিতর স্নেহ উথলে উঠে। কিন্তু তারপরও আমি লুনাভা মিনির উপর আমার দাবি ছেড়ে দিতে পারি না। ছেলেটার ব্যথা আমাকে আহত করে ঠিকই, তারপরও তার খপ্পর থেকে আমি লুনাভা মিনিকে উদ্ধার করতে চাই। আমি লুনাভা মিনির স্বঘোষিত রক্ষক, তাকে আমার রক্ষা করতে হবে আর সব পুরুষ ও নারী থেকে, এমন কি খোলা বা বদ্ধ জায়গা থেকেও। যত ভাবি, আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ছবির ছেলেটাকে সে ব্যবহার করছে, তত আমার কারণে তার দুর্ভোগের জন্য আমি কষ্ট পাই। পুরনো সেই প্রতিজ্ঞা আমি আবার করি, এবার অনেক জোরালোভাবে :

যেভাবে হোক তোমাকে আমি জয় করব। তোমার সাথে এমনকি একদিনের জন্য হলেও বাস করার জন্য যদি কাউকে ধ্বংস করতে হয়, আমি তা-ই করব। আমি যে কত বড় শয়তান হতে পারি, তোমার জানা নাই।

সে দিন আমি পাগলেম মতো তার ঘর থেকে বের হয়ে যাই। পথে আমি যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি, ছবিটি দেখিয়ে সে কী বুঝাতে চেয়েছে। তারা সবাই একই কথা বলে, "সে তোমাকে এড়িয়ে যেতে চায়।" তারা একমত, ছবির ছেলেটির সাথে তার কোনও সম্পর্ক নাই। আমার তাদের কথা বিশ্বাস হয় না।

তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। আমি বুঝতে পারি। আসলে এ ঘটনায় আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আমি বেদনার আগুনে পুড়তে থাকি। ছবির সে ছেলেটি ঘাড়ে চেপে ধরে আমাকে পাঁচ মহাসাগরের একটিতে ডুবাতে থাকে। এটা এমন এক কষ্টকর অনুভূতি যে, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের লোকজন যে সব শত্রুসৈন্যকে না মরা পর্যন্ত পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে রাখত, তাদের প্রতি আমার করুণা হয়। মনে হয়, ফাঁসির দড়িতে টান দিয়ে মারা

ভাল। ডুবিয়ে মারা নয়। কারণ ডুবে মরার চেয়ে কষ্টের মৃত্যু আর নাই। সেই কষ্ট নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া অনুভব করার কষ্ট। এমন কষ্ট প্রদান বড় নিষ্ঠুর কাজ।

হে আমার রঙীন পোশাকের শ্রোতারা, আপনাদের কেউ যদি সত্যিকার ঈর্ষার কষ্ট পেয়ে থাকেন, তিনি বুঝবেন, ওই জগতে এত পাপ করা সত্ত্বেও ঈশ্বর কেন এই জগতে আমাকে আগুনের শাস্তি থেকে রেহাই দিলেন। সেই জগতে এক রাতের ঈর্ষায় আমি যে কষ্ট পেয়েছি, সাতটি নরকের আগুন এক জায়গায় জড়ো করে কোন পাপীকে এক অনন্তকাল পোড়ালেও সে অত কষ্ট পাবে না। সে-রাতে সেই যুবকের পরিলেখা আমার চোখের সামনে আকাশে উঠে যায় : তাকে এক দুরন্ত রাজা মনে হয়, যার মাথায় আমার স্বপ্নের রানী রাজমুকুট পরিয়েছে। আমার চোখের উপর সে সিংহাসনে বসে থাকে। আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না, লুনাভা মিনিকে আমি আর কখনও কল্পনা করতে পারব না। আমি প্রতিদানহীন ভালবাসার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কারণ এ ছাড়া তখন আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আমি ঈর্ষার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ঈর্ষা আমার ভালবাসা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, অথচ তখন আমার হৃদয় ভালবাসায় এত পরিপূর্ণ যে, আর এক ফোঁটা বাড়লে তা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সেই হৃদয়-ফাটা কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তখন লুনাভা মিনিকে যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে ভাগাভাগি করতে রাজি। দরকার হলে সে খাটে ঘুমাবে, আমি নিচে। লুনাভা মিনি না ধুয়ে আমার পাশে নেমে আসুক, তাতেও আমার ক্ষতি নেই। শুধু তার একটুখানি গায়ের বাতাস পেলেই আমি বর্তে যাই।

সে-সন্ধ্যায় আমি আমার অভিশপ্ত নির্জন কক্ষে প্রবেশ করার সাহস পাই না। আমি বারান্দায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকি। শেষ পর্যন্ত তালা না খুলেই উপাসনালয়ে চলে যাই। উপাসনালয়ে গিয়ে আমি ঈশ্বরকে বলি, আমাকে ঈর্ষার কষ্ট না দিতে। আমি ঈশ্বরের সাথে একটা শেষ বোঝাপড়ায় আসতে চাই : প্রেমে আমি যে কোনও কষ্ট করতে রাজি, শুধু ঈর্ষার কষ্ট ছাড়া। আমি মনের ব্যথা সহ্য করতে পারি না। ফলে ধর্মগ্রন্থ অনুমোদন করে না, সে-রাতে আমি এমন একটা কাজ করে বসি : আমার মন থেকে ঈর্ষার কষ্ট কমানোর জন্য, আমি ঈশ্বরের কাছে আমার পরকালের পুরস্কারের কিছু অংশ ধার হিসাবে চাই। আমি ঈশ্বরকে বলি, এক সেকেন্ডের জন্য যদি তিনি আমাকে প্রেমের সুখ দেন, যদি এক মিনিটের জন্য তিনি আমাকে লুনাভা মিনিকে

আলিঙ্গন করার ব্যবস্থা করে দেন, পরবর্তী সেকেন্ডে তিনি আমাকে যে কোনও শাস্তি দিতে পারবেন। আর তাতে যদি আমার বড় কোনও বিমারি, বা এমনকি মৃত্যুও হয়, আমি রাজি। আমি বলি :

"এটা তোমার জন্য কত সহজ, প্রভু। তুমি কি দেখ না? এখানে-সেখানে, পার্কে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঘরের কোনায়, সামান্য সুযোগে, কত তরুণ, কত প্রেমিক, তাদের প্রেমিকাকে কয়েক মিনিট আলিঙ্গন করে ফেলে। আর আমি, বুকে এত প্রেম নিয়ে, তা শুধু এক সেকেন্ডের জন্য করতে পারব না? যেখানে এক সেকেন্ড তাকে আলিঙ্গন করার বিনিময়ে আমি তোমাকে আমার প্রাণটা দিয়ে দিতে চাই। ঈশ্বর! আমার প্রতি কি তোমার কোনও মায়া নাই?"

সে-সময় যদি লুনাভা মিনি আমার বুকের উপর দিয়ে হাঁটতে চাইত, আমি এক লাফে মাটিতে শুয়ে যেতাম, আর তা করতে গিয়ে কোনও সঙ্কোচ করতাম না; কামড়ে কামড়ে আমি তখন তার কাঁচা মাংস খেতে পারতাম, আর তা করতে গিয়ে এক বিন্দুও মাটিতে পড়তে দিতাম না। তার নীরবতা আমাকে তার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলতে চাইত, যা আমি এড়িয়ে যেতাম। ধর্মের বিষয়টি আমি কখনও আলোচনাই করতে পারিনি। এসব বিষয় এড়িয়ে চলতাম, কারণ এসব কথা বলে সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত। আমি আত্মপ্রতারণার পথে হেঁটেছি। উপদেষ্টারা বলত, "ধর্ম ও পরিবার নিঃসন্দেহে দু'টি বড় বাধা, তবে প্রেম-নিবেদনের কৌশল, শব্দচয়ন, সঠিকমুহূর্তে সঠিক বাক্যবাণে যুবতীর হৃদয়ে আঘাত হানার অক্ষমতা, দুর্ভাগ্য, ইত্যাদি কারণে তুমি লুনাভা মিনিকে কাছে টানতে পারছ না।"

আমি দুঃখ করি, কেন আমি ব্যতিক্রম কিছু বা নূতন কিছু বা ধ্রুপদী কিছু ভাবতে পারি না। সেই সময়ে আমি গতানুগতিক প্রেমিকদের চেয়ে ভিন্ন কিছু বলতে, ভিন্ন কিছু করতে উদগ্রীব ছিলাম, এবং করতে না পেরে হতাশায় বুক চাপড়াতাম। কয়েক বছর পর এক তরুণ জ্ঞানী আমাকে বলেছিল, সেই সময় আমার এমন ইতর হওয়ার দরকার ছিল না। আমি যখন একবার প্রেম নিবেদন করেছি, তখন দ্বিতীয় কোনও পুরুষের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আগে নিশ্চয়ই সে আমার কথা বিবেচনা করত। আমি তার হৃদয় জয় করার মতো অবস্থানে ছিলাম। কাজেই আমার উচিত ছিল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা। দীর্ঘ অপেক্ষা আমার সমস্যার সমাধান করতে পারত। শপথ করে বলছি, সেই সময় এ কথা আমার মনে আসেনি। আমি বার বার দাবি করি, আমাকে লুনাভা মিনির ভালবাসতে হবে।

উপদেষ্টারা আমাকে ভর্ৎসনা করেছে। তারা বলেছে, আমি তার আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছি। তাদের কথা শুনে, অনুশোচনায় আমি রাতের আঁধারে মুঠি মুঠি চুল ছিঁড়েছি। এক রাতে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে মাথা প্রায় খালি হয়ে যায়। সকাল বেলা নাপিতের কাছে গিয়ে আমাকে মাথা মুড়াতে হয়েছে। আর সে জন্য লুনাভা মিনির কাছে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়। আমি বলেছি, রাতে তার জন্য পাগল হয়ে রাস্তায় হাঁটছিলাম। তখন এক দল ডাকাতের হাতে পড়ি। ডাকাতরা আমার পকেটে টাকা না পেয়ে টেনে টেনে আমার মাথার অর্ধেক চুল তুলে ফেলে। বাকি অর্ধেক তোলানোর জন্য আমি নাপিতের কাছে যাই।

৩০

আলোচনা যে-কোনও সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ, এই কথা আমি যেন তখন নতুন শুনলাম। শুনলাম না বলে সত্য কথা বলা ভাল। সত্য কথা হল ওই কথা শোনার জন্য আমি বাতাসে কান পেতে ছিলাম, খবরের কাগজের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়েছি, বইয়ের দোকানে গিয়ে দরকষাকষির উপর বইপত্র ঘাটাঘাটি করেছি। আর তাতে যা পেয়েছি তা আমাকে উদ্দীপ্ত করে। আক্রমণ নয়, আলোচনা করুন। যুদ্ধ নয়, আলোচনা করুন। তালাকের পূর্বে আলোচনা করে সমস্যাসর সমাধান করুন। মাথা ফাটানোর আগে আলোচনা করে রক্তপাত এড়ানোর ব্যবস্থা নিন। গর্ভধারণের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন, সন্তান হয়ে যাওয়ার পর চুলাচুলি বা পরকিয়া করবেন না তো? আলোচনার কোনও বিকল্পন নাই। এতগুলি প্রবাদ মাথায় ঢুকে যাওয়ার ফলে, এর মধ্যে অনেক পাগলামি করা সত্ত্বেও, আমার মনে আশার উদয় হয়। আমি ভাবি আলোচনা করে আমি আমার সমস্যার সমাধান করতে পারব। তবে এই নিয়ে উপদেষ্টাদের সাথে আর আলাপ করি না। তারা সব কিছুতে বাধা দিত।

আমি ঠিক করি, লুনাভা মিনির সাথে আলোচনাটা ধীরে ধীরে, সতর্কভাবে, হিসাবনিকাশ করে শুরু করব; যখন আমার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে, তখন

আমি তাকে আমার বাগ্মিতা দিয়ে ঘায়েল করব। নিজেকে আমি একজন সক্ষম দ্বিধাহীন পুরুষ হিসাবে তুলে ধরতে চাই। এ যাবৎ সে আমাকে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ দেয়নি। আমি ভাবি, আমি চাইনি বলে সে দেয়নি। আর তার ছোট ঘরে বসে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব ছিল না, কারণ কান পেতে অন্যরা তা শুনে ফেলত। আমি তাকে বলি, বাইরে কোথাও গিয়ে সে যেন আমাকে তার সাথে কথা বলার সুযোগ দেয়। এই প্রস্তাব যে-দিন উত্থাপন করি, সে-দিন সে সবচেয়ে কঠোরভাবে 'না' বলে। সে বলে, তার আর কিছু জানার বা বলার নাই। তার পরও আমি আমার অনুরোধ চালিয়ে যাই। সে কোনও কথা শুনতে রাজি হয় না। আমার অনুনয় যত তীব্র হয়, তার প্রত্যাখ্যানও তত নিষ্ঠুর হয়। এক সময় সে হইচই বাঁধানোর হুমকি দেয়। আমি ভয়ে থেমে যাই।

আমাদের সম্পর্ক তখন সবচেয়ে খারাপ। অথচ তার সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি নষ্ট করতে আমি পারব না। ছলে-বলে-কৌশলে আমি তা জিইয়ে রাখি। শ্রোতারা জেনে রাখুন, আমার জীবন হারানো সুযোগে ভরপুর। যখন আমি তাকে অভিসারে যাওয়ার অনুরোধ করা বন্ধ করি, তখন একদিন ঈশ্বরের সাহায্যে সেই সুযোগ পাই।

সে-দিন বিকালে তাদের বাড়িতে আর কেউ ছিল না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ওই দুই বছর খুব বৃষ্টি হয়। আমার এই গল্প মূলত মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় আর ঢেউয়ের গল্প। ওই দু'টি বছর সব কিছু শত্রুর মতো আচরণ করেছে। প্রকৃতি এতটুকু দয়া করেনি। পর পর দু'টি বন্যায় দেশ ভেসে যায়। বহু মানুষ মারা যায়, আরও বহু মানুষ সর্বস্ব হারায়। মৃতদের প্রতি শোক জানানো হয়; জীবিতদের সান্ত্বনা দেয়া হয়। অথচ সেই দুর্যোগে যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেল, তার কথা কেউ জানল না। তখন ঝড়বৃষ্টি আমার অচল জীবনকে একেবারে থামিয়ে দেয়। প্রতিদিনের কাজের মধ্যে শুধু লুনাভা মিনির বাড়ি যাওয়া; আর সব চোখের জল কেড়ে নেয়। খারাপ আবহাওয়ায় মন এত খারাপ হত যে, আকাশে মেঘ করার সাথে সাথে আমি ঘরে ঢুকে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতাম। আকাশ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত শীতনিদ্রারত সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতাম। মাঝে মাঝে জানালা খুললেও আকাশে মেঘ দেখে তা আবার দড়াম করে বন্ধ করে দিতাম।

কিন্তু সেই বিকালটা ভিন্ন ছিল। আমার মনে বৃষ্টির ভয় ছিল না। বরং ঈশ্বরবিহিত বৃষ্টি বড় একটা সুযোগ করে দেয়। আমি লুনাভা মিনিকে একান্তে

পাই। কোনও এক গল্পে পড়েছিলাম, এক বড়লোক পিতা তার পুত্রের সাথে পুত্রের পছন্দের মেয়েটিকে এক গাড়িতে তুলে দিয়ে রাস্তায় আড়াআড়িভাবে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি রেখে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। ট্রাফিক জ্যামে আটকে থেকে কথা বলতে বলতে ছেলে-মেয়ে দু'টির মধ্যে প্রেম হয়ে যায়। সেখানে মানুষের সহায়তায় কাজ হয়। এখানে স্বয়ং ঈশ্বরের সহায়তায় আমার আর লুনাভা মিনির মধ্যে প্রেম হবে। অনুকূল আবহাওয়ায় আমরা একে অন্যের কাছে চলে এসেছি। যারা বাইরে ছিল তারা বৃষ্টি না থামলে ঘরে ফিরতে পারবে না। সে-দিন তার বাবা বিদেশে। তার মা আর বোনরা উপাসনালয়ে। আমি আসব বলে সে যায়নি।

আমার বুকে তখন অনেক আশা। আমি বিশ্বাস করতাম এ ভাবেইতো ভালবাসা হয়। দু'টি হৃদয় কাছাকাছি আসে। প্রেমিকের নীরবতা কথা বলে আর প্রেমিকা রাতের বেলা সুখের স্বপ্নে ভেসে যায়। ভোরবেলা সবার আগে ধীর পায়ে সে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে বা ভারি বৃষ্টিপাত হয়, বা পূব দিকে লাল সূর্য উঠে, বা আকাশে থাকে মেঘ আর চারিদিক হয় থমথমে। তরুণী ভাবে তার প্রেমিকের কথা। সুখের আবেশে সে হাজার বছর বাঁচতে চায়।

কল্পনা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমি সে-দিন লুনাভা মিনির কাছে প্রেমভিক্ষা চাই। আমার চাওয়া অনেক জোরালো ছিল। প্রেম দাও, প্রেম দাও, বলতে বলতে এক সময় আমি কেঁদে ফেলি। লুনাভা মিনি মূর্তির মতো বসে থাকে।

লুনাভা মিনি বুঝিয়ে দেয় চাইলে একটা মেয়ে কত শক্ত হতে পারে। তার এমন অবস্থা দেখে আমার মাথায় খুন চাপে। ঝড়ো আবহাওয়ায় আমি সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে চাই। ক্রোধে আমি কাঁপতে থাকি। মনে মনে বলি, আমি অনেক ধৈর্য ধরেছি। এবার আমি তোমার দাঁত-মুখের খিচুনি বন্ধ করব। আমার মন আর কোনও বাধা মানে না। সহসা নিচু হয়ে আমি তার হাত দুটি চেপে ধরি। সে তা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নেয়। এমন নিষ্ঠুরতা আমাকে আগে কখনও কেউ দেখায়নি। আমি যে তার প্রেমিক, আমি যে পাড়ার মাস্তান নই, তার ব্যবহারে সে-বিষয়ের কোনও প্রতিফলন নাই। ওই অবস্থায় জোর করা ছাড়া আমি কোনও উপায় খুঁজে পাই না। আমি কঠোর সিদ্ধান্ত নিই। সিদ্ধান্ত নিই এমন কিছু করার যা অব্যর্থ হবে। ঠিক করি, আমি তাকে জোর করে আলিঙ্গন করব। আলিঙ্গনের মধ্যে প্রথম সে লাফালাফি করবে, হাত-পা

ছুঁড়বে, কিল-ঘুষি মারবে। আমি তখন অনড় থাকব। তার কপালের ঘামে আমার শার্ট ভিজে যাবে। তবু আমি শুধু বাঁধন দৃঢ় করব। এক সময় সে ভূমিকম্পের শিকার হবে। যে ভূমিকম্পের শিকার আমি অনেক বার হয়েছি। দুর্বল নারী-দেহ নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপা ছাড়া সে আর কী করতে পারবে? আমি হাতের বাঁধন শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকব। এক সময় সে শিথিল হয়ে যাবে। আর ওই সুযোগে আমি লুনাভা মিনিকে ভোগ করব।

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আমি লুনাভা মিনির দিকে তাকাই। সে বিপদগ্রস্ত হরিণীর মতো অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি উড়ে গিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরি। সে যে কী ক্ষিপ্র প্রকৃতির মেয়ে সে-দিন আমার জানা হয়ে যায়। সে আমার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেয়। ধনুকের মতো শরীর বাঁকিয়ে সে তার বুকের সুরক্ষা করে। এক লাফে সে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। নিরুপায় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমি তার পায়ের উপর গিয়ে পড়ি। এবার সে আর জোর করে না। সে আমার দুরবস্থা বুঝতে পারে। বাইরে নুহের বৃষ্টি পড়ে। ঘরের ভিতর চোখের জলে আমি তার পা ভিজিয়ে চলি। আমি বুঝতে পারি, সে বিচলিত হয়েছে। সে বলে, "না। আমার 'না' না-ই।"

"দয়া করো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। অন্তত এখন হ্যাঁ বলো। কালকে বা পরশু না বোলো। শুধু আজকের দিনটা দয়া করো। এতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।"

লুনাভা মিনির হাঁটু চেপে ধরে আমি শিশুর মতো কাঁদি। সে আবার শক্ত হয়ে যায়। আর আমার নাটক শেষ হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

আমি নতুন পরিকল্পনা করি। আমি জানতাম এ-ই শেষ; আমার কোনও আশা নাই। এবার তাকে আর আমার বাহু থেকে ছুটে যেতে দিব না। আমি তাকে পুনরায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমার দেহে শক্তি আছে। সে উপভোগ করুক বা না করুক, আমি করব। বিপদ অবশ্যই আসবে। লোটাসের সাথে ধরা খাইনি বলে যে আর কখনও ধরা খাব না, সে-তো কোনও কথা হতে পারে না। তখন আমার ভাগ্য ভাল ছিল। এখন আমার ভাগ্য খারাপ। কাজেই ধরা পড়ব নিশ্চিত ছিলাম। লুনাভা মিনির মা আর বোনদের সামনে আমার লজ্জা করবে। তাতে কী? লুনাভা মিনির লজ্জাতো আমার চাইতে এক হাজার গুণ বেশি হবে। আমি দিব্য চোখে দেখি, লুনাভা মিনি হাত পা ছেড়ে শুয়ে আছে, আতঙ্ক না কাটাতে সে মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। লুনাভা

মিনির দুই পায়ের মাঝে গরম কাপড়ের পট্টি চেপে ধরে তার মা তার ব্যথা উপশমের চেষ্টা করছে। তার আগে তারা কিছু প্রতিবেশীসহ দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে আমাকে মাঝপথে আটক করেছে। পুলিশ এসেছে, আমাকে হাতকড়া পরান হয়েছে, আর লাঠি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। জেলে বাস করা কঠিন হবে। আমারতো সে অভ্যাস নাই। আমি ধরা পড়ার কথা আর ভাবি না; বরং যা করতে যাচ্ছি তা করার কথা ভাবি। ভাবি, কীভাবে সব কিছু সামলাব। আমাকে লুনাভা মিনির মুখে শক্ত করে কিছু একটা গুঁজে দিতে হবে। তার গলায় ওড়না ছিল। ওটা কাজে লাগানোর কথা ভাবি। তারপর আর একটা কঠিন কাজের কথা মনে আসে। লুনাভা মিনি ছিল কুমারী। আমি কীভাবে তার কৌমার্য মোকাবেলা করব? আমি জানি, এটা খুব কঠিন কাজ। রাহিব বলেছিল, এক কুমারীর সাথে সে-কাজ করার পর তার ধ্বজ ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, লোটাস কুমারী ছিল না। লোটাস কুমারী থাকলে অত সহজে তা করা যেত না।

এ সব ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যায়। লুনাভা মিনি পা নেড়ে আমার বাঁধন থেকে মুক্ত হতে চায়। আমি ভেবেছিলাম, সে আমার মাথায় বা ঘাড়ে হাত দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইবে। তা না করাতে আমি অপমান বোধ করি। আমি তার মুখের দিকে তাকাই। হায় ঈশ্বর। কবরের সব অন্ধকার তার মুখের উপর। আর কী দিয়ে আমি তাকে আক্রমণ করব? আমি যে অস্ত্রের উপর নির্ভর করে ছিলাম, সে কোঠরে ঢুকে গেছে। নখ আর আঙ্গুল দিয়ে ওই কাজ করা। অন্য কোন মেয়ের সাথে ঠিক আছে। লুনাভা মিনির সাথে? কখনওই না। আমি আশা ছেড়ে দিই। জোর করে হয়তো তাকে উলঙ্গ করা যাবে। ধস্তাধস্তিও করা যাবে। আর আমার যে-টা সবচেয়ে বড় শখ, তার বুকে হাত দেয়া, তা-ও করা যেতে পারে। কিন্তু তাতেতো তাকে পাওয়ার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তা করার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি জীবনে কখনও আশা ছাড়িনি। আমি লুনাভা মিনিকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াই। আমার গাল দুটি লজ্জার আগুনে জ্বলতে থাকে।

মুক্ত হয়ে লুনাভা মিনি এমন আচরণ করে, যেন কিছু হয়নি। রুমাল এনে দিয়ে সে আমাকে চোখ মুছতে বলে। লুনাভা মিনির রুমাল। সে জানে না, আমার কাছে তার রুমালের মূল্য। লুনাভা মিনির রুমাল দিয়ে চোখের পানি মোছার মতো সাধারণ কাজ করতে আমি অস্বীকার করি। বাইরে তখনও বৃষ্টি

পড়ছিল। আমি তার দিকে কঠোরভাবে তাকাই, আর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বলার চেষ্টা করি, আমি আর কখনও তার কাছে আসব না। তার মুখে মেঘ ফিরে আসে; গাল দু'টি আবার শক্ত হয়ে যায়। ওই সময় আমি তাকে এমন ভালবাসি, যেন আমি এর মধ্যে তাকে যথেষ্ট ভালবাসিনি।

লুনাভা মিনির মুখ থেকে অন্ধকার না সরতেই আমি তাকে ফেলে রেখে চলে আসি। আর শুধু এ কারণে আমার পরবর্তী জীবনের কষ্ট এত গভীর হয়। যদি তাকে হাসিমুখে—সে হাসি কোমল কিংবা পরিহাসের যা-ই হোক না কেন—রেখে আসতাম, তারপরও আমার কষ্ট হত, কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যে এত অনুশোচনা থাকত না।

হে আমার অসুখী শ্রোতা, মনে করুন যদি এই স্মৃতিকথা থেকে আপনি এখনও কোনও উপদেশ পাননি, তবে এই উপদেশটি গ্রহণ করুন : কখনও আপনি আপনার প্রেমিকাকে বিষণ্ন অবস্থায় ত্যাগ করবেন না, এমনকি প্রত্যাখ্যাত হলেও না। তাকে তখন ত্যাগ করবেন, যখন সে হাসিখুশি থাকবে। দরকার হলে আপনি আপনার প্রস্থানের সময় এগিয়ে আনুন বা পিছিয়ে দিন। যদি আপনি তাকে দুঃখিত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসেন, তবে বুঝবেন আপনি আপনার মৃত্যু কিনে নিয়েছেন। শ্রোতারা, আপনারা কি জানেন কেন আমি মারা গেছি? পরবর্তীতে অনেক নারী তাদের শরীর আর মন খুলে দিলেও কেন আমি জীবনে আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি? কারণ একটাই, আমি লুনাভা মিনিকে বিষণ্ন অবস্থায় ফেলে চলে এসেছিলাম।

৩১

সে-দিন অপরাহ্নে রাস্তায় নেমেই আমি অনুতাপের শিকার হই। যা ঘটে যায় তা অসম্ভব। আমি ষড়যন্ত্রকারী বৃষ্টিকে অভিশাপ দিই। অনুশোচনায় আমার হার্টফেল হয়ে যাবে বলে মনে হয়। আমি বাতাসে মাথা ছুঁড়ি। যদি খুন করতাম, এর চেয়ে ভাল ছিল। আমি জানি লুনাভা মিনি তখন কী করছে? সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাঁসছে। *এর জন্য এত কিছু? রাস্তায় এত*

বেশ্যা থাকতে আমার কাছে কেন? বেচারা। প্রতিদিন খেঁচেও ঠাণ্ডা হয় না।

আমাকে নিয়ে তামাশা। বিশ্বাস করুন, আমি যখন তাকে আলিঙ্গনের চেষ্টা করি, তখনও শ্লীলতাহানির চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। আমি জানতাম তাকে আলিঙ্গন করা মানে একটা নেকড়েকে আলিঙ্গন করা। আমি শুধু আলিঙ্গনের শক্তি দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলাম। আপনারা দেখেছেন, আমার সে ভাল-মানুষিকে সে কীভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আর যখন সম্ভোগের চিন্তা মাথায় আসে, তখনতো আমি উঠেই দাঁড়াতে পারিনি। আমি লুনাভা মিনির হাসি সহ্য করতে পারি না। সে হাসছে, কারণ সে আমার মনের অবস্থা জানে না। আর কোনও দিন জানবেও না। আমার এত প্রেম, এত ভালবাসা, সব বৃথা। আমি তো প্রতিদানে কিছু পেলাম না। এবার সত্যি অনুশোচনা হয়, কেন আমি সুযোগটা নষ্ট করলাম। এমন সুযোগ, যা জীবনে দ্বিতীয়টা আসে না। সুযোগটা নষ্ট করা আমার ঠিক হয়নি। রাস্তায় চলতে চলতে আমার মন বলছিল সুযোগটা তখনও আছে। তাই আমি ফিরে যেতে চাই। আমি তার বিদ্যুতের ঢিবি শরীরের কথা ভাবি।

আমি পেছনে ফিরি। আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এবার আমি তাকে ছাড়ব না। দরকার হলে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করব। চিবিয়ে রস। লোভে মুখে আমার পানি চলে আসে। তিরতির করে কাঁপা তার পাতলা ঠোঁট দু'টির কথা মনে আসে আর আমার মরা যৌবন দাঁড়িয়ে যায়। লুনাভা মিনির উদ্ধত স্তন দু'টির কথা ভাবতে ভাবতে আমি তার উদ্দেশে দৌড় শুরু করি। দৌড়তে দৌড়তে ভাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করব। ব্যথা দিব। যাতে তার সব বিষ ব্যথা হয়ে বের হয়। কাজ শেষ হয়ে গেলে খুন করে ফেলব। আগে প্রস্তাব দিব। প্রস্তাব মেনে নিলে ঠিক আছে। আমি তাকে নিয়ে পালিয়ে যাব। রানি করে রাখব। আর উল্টাপাল্টা কিছু করলে, খুন করে ফেলব। আমার জীবনতো শেষ হয়ে গেছে। শেষ যে হয়ে গেছে, তার প্রমাণ এই দৌড়ের মধ্যেই আছে। একটি মাত্র সম্ভোগ হবে এর ক্ষতিপূরণ, আমার জীবনের ক্ষতিপূরণ। শুধু আলিঙ্গনে আমি আর সন্তুষ্ট হব না। আলিঙ্গন আর সম্ভোগ, এ দুই হবে আমার সারা জীবনের পাওয়া। তারপর ফাঁসির দড়ি, কিংবা যাবজ্জীবন। যাবজ্জীবনের কোনও সম্ভাবনা নাই। শুধু নির্যাতনের শাস্তিইতো মৃত্যুদণ্ড। শ্লিলতাহানী আর খুন। দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে সাত দিনে বিচারকার্য সম্পন্ন। যে আইনে মৃত্যুদণ্ড হবে, সে আইনের বিরুদ্ধে আপিল চলে না। পনেরো দিনের মধ্যে সব শেষ।

পনেরো দিন এমন কী আর দীর্ঘ সময়। আমি ঠিক করি, না, দ্রুত নয়, আমি রয়ে সয়ে ভোগ করব। কার হাতে ধরা পড়েছি, সেটা বিবেচ্য নয়। যতক্ষণ না কেউ ঘরে ঢুকে, ততক্ষণ মন ভরে উপভোগ করব। গালে আঙ্গুল দিব। বগল কামড়ে ধরব। এমন কিছু নাই, যা লোটাস আমাকে শিখায়নি। লুনাবা মিনির স্তনবৃন্ত টেনে ধরার জন্য এক সেকেণ্ডের অপেক্ষ সহ্য হয় না। আমার দৌড়ের গতি এমন বাড়া বাড়ে, তিন হাত তফাতের পথচারী রাস্তায় উল্টে পড়ে। ভিখারিগুলি দৌড়ে কানাগলিতে ঢুকে যায়। আমি তাদের বিহ্বলতার সুযোগ নিই। আমি খুব দ্রুত লুনাভা মিনির বাড়ি পৌঁছে যাই।

লুনাভা মিনির বাড়ির দরজা বন্ধ। আশেপাশে কেউ নাই। আমি বন্ধ দরজায় আঘাত করি। টোকা না দিয়ে ঘুষি মারি। অনেকগুলি ঘুষি মারার পরও কেউ হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুলতে আসে না। আমি একের পর এক ঘুষি মেরে চলি। ঘুষির গতি বাড়ে। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দ পাই না। জানালা দিয়ে সে নিশ্চয়ই দেখেছে, আমি এসেছি। তারপরও সে চুপ মেরে আছে। লুনাভা মিনি কলকব্জা দিয়ে তৈরি। রক্তমাংস দিয়ে নয়। না হলে সে কী করে দরজার এই ধড়াম ধড়াম আওয়াজ সহ্য করছে। ডরভয় কি কিছুই নাই এই মেয়ের? সব ভয় কি শুধু আমার? আমি তখন নিজেকে বদলে ফেলি। আমি ভাবি, এই পাগলামি করার পর এর শেষ না দেখে আমার ফিরে যাওয়া কিছুতেই উচিত হবে না। ঝড় উঠুক। মাটিতে বক আছাড় খেয়ে পড়ুক। আমি কিছুর তোয়াক্কা করি না। আমি দরজায় লাথি মারি। একের পর এক লাথি মেরে চলি। পাড়াপড়শির আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কথা। কিন্তু লুনাভা মিনির কোনওই বিকার নাই। সে দরজা খুলতে আসে না। আমার জেদ বাড়ে। দশ ফুট পিছনে গিয়ে উল্কার মতো উড়ে এসে দরজার উপর পড়ি। দেখি তুই কত সহ্য করতে পারিস? আজ যদি সফল হই তোকে আমি ব্যাবিলনের বাজারে নিলামে তুলব। অথবা লুপানারে নিয়ে সরাসরি বিক্রি করব। পেরিক্লিস এর প্রাসাদের খাম্বার সাথে তোকে বেঁধে রেখে আমি আস্পেসিয়ার সাথে মিলিত হব। আর তা দেখে দেখে তুই জ্বলতে থাকবি, হয় ক্রোধে নয় রোষে। এ ছাড়া আর কী করবি তুই? এখনই আমি তোকে তোর ঘর থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করব। সেই উদ্দেশ্যে ক্রোধোন্মত্ত আমি একের পর এক বন্ধ দরজার উপর উল্কাপাত ঘটাই। কী কাঠের দরজা শুধু ঈশ্বর জানেন। কোনও আঘাতই দরজাটাকে নাড়াতে পারে না। ওটা বুঝি লুনাভা মিনির চেয়েও শক্ত। আমি

যত উল্কাপাত ঘটাই তত আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা কমতে থাকে। শুধু দরজাখানা ভাঙ্গার আকাঙ্ক্ষা ঘনিভূত হয়। একে একে আমি সব বাসনা ত্যাগ করি। শুধু দরজাটা ভাঙ্গার জন্য আমি নিজেকে ওটার উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি।

"কী করছেন আপনি, কী করছেন?"

এটা লুনাভা মিনির চিৎকার। কী জোর সে গলার। শুরুতে আমার শুধু এটুকু মনে হয়েছে যে লুনাভা মিনির চিৎকারে ভেজা কাপড় শুকিয়ে গেছে, এলাকাবাসির বাত-ব্যথা চলে গেছে। আমার জান হয়ে গেছে পানি। কিন্তু না। ওই চিৎকারের অভিঘাত সেখানে থেমে থাকেনি। চারিদিক থেকে সে চিৎকারের প্রতিধ্বনি ওঠে আর আমার কলিজা চেপে ধরে। সে প্রতিধ্বনি থামে না। "কী করছেন আপনি, কী করছেন?" কত শত দালান আছে এই শহরে ঈশ্বর জানেন। তার চিৎকার এক-একটা দালানে বাড়ি খায় আর ফিরে এসে আমার কানে আঘাত করে। আমার মাথা ঘুরতে থাকে। আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। ঘুরতে ঘুরতে উল্কা মাঝ আকাশে থেমে যায়। লুনাভা মিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে। আগে তার মুখে আর কীই বা এমন অন্ধকার দেখেছি। কবরের অন্ধকার? কবরতো এক হাত মাটির নিচে। এখন যে অন্ধকার তার মুখের উপর ঝুলে আছে, তা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উঠে এসেছে। সে বলে, "কেউ যদি পাশের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে, কী অবস্থা হবে? আপনি এত পাগলামি করেন কেন? অ্যাঁ।"

এবার আর কান ফাটানো চিৎকার নয়। এবার সে প্রয়োগ করে গলার ধার। লুনাভা মিনির গলা জোরালো, ধারালো ইত্যাদি আমার জানা ছিল, তাই বলে তা এত ধারালো। তার গলার এই ধার কান বন্ধ করে না, কান কেটে ফেলে। এই ধার ছুরির ফলার মতো, বুক কেটে তা দুই ভাগ করে দেয়। এই ধার যার গলায় আছে, তার আর কি কোনও প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে? এই লুনাভা মিনিকে রক্ষা করব বলে আমি কত কী ভেবেছি। আমি এই হব, ওই হব, ব্যায়াম করব, শক্তি সঞ্চয় করব, ডাকতাদের সাথে লড়াই করব, হেন করব, তেন করব। অথচ লুনাভা মিনি একাই একশ। এই ধার দিয়ে সে শুধু নিজেকে নয়, সারা পৃথিবী রক্ষা করতে সক্ষম। আহা, পরে আমার মনে হয়েছে, যখন সন্ত্রাসীরা সারা পৃথিবীতে বোমা মেরে যাচ্ছিল, নিজেরা মরছিল, অন্যদেরও মারছিল, আর পৃথিবীর রাষ্ট্রপতিগুলি তাদের ভয়ে দিশেহারা, তখন কেন রাষ্ট্রপতিগুলি সন্ত্রাসীদের পৃথিবী থেকে তাড়ানোর জন্য লুনাভা মিনির

সাহায্য নিচ্ছে না। লুনাভা মিনির গলার ধার দিয়ে দুই একটার গর্দান কেটে দিলে বাকিগুলিতো ভয়েই থেমে যেত। কিন্তু তারা কেউ সেই সুযোগ গ্রহণ করল না। কারণ তারা লুনাভা মিনিকে চিনেনি। শুধু আমি তাকে চিনেছিলাম।

সেই সন্ধ্যায় আমি কোনও উপদেষ্টার কাছে যাই না। কারণ আমিতো তাদের সাথে পরামর্শ করে সেখানে যাইনি। সারা রাত আমি বিছানায় কান্নাকাটি করি। দরজায় ঘুষি মারতে মারতে দুই হাতের ছাল তুলে ফেলেছি। ভাগ্য ভাল, আমার হাড্ডি শক্ত ছিল। নাজিফ রান্নাবান্না অনেক জানলেও, ফাঁকি দেয়ার জন্য শুধু মুরগি রান্না করত। শৈশবে মুরগির হাড্ডি, গরুর দুধ, পাকা কলা খেয়ে আর দূরদূরান্তে হেঁটে হাড্ডি শক্ত করেছিলাম। তা কাজে লাগল। ডান হাতে কী যে ব্যথা। কিন্তু তাতে কিছু মনে হয় না। আমি শুধু মনের ব্যথা সহ্য করতে পারি না। ভোরবেলায় বন্ধু ও উপদেষ্টা রলকে ডেকে তুলি।

"বন্ধু আমাকে সাহায্য করো। আমি কী করেছি আমি জানি না। কিন্তু সেখানে না গেলে আমি বাঁচব না। বন্ধু, আমার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।"

বন্ধুর সামনে আমি ডুকরে কাঁদি। সে আমাকে টেনে তার ঘরে ঢুকায়। আহা মানুষের মনে কত দয়া। শুধু লুনাভা মিনির মনে এক ফোঁটা দয়া নাই। ঘরে ঢুকে রল জানালা খুলে দেয়। বাইরে আবছা অন্ধকার আর বৃষ্টি। আমি গাছগুলির দিকে তাকাতে পারি না। আমি রলকে সব খুলে বলি। সে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে। তিরস্কার করে বলে, কেন আমি সন্ধ্যাবেলায় তার কাছে যাইনি।

"আহা কী কষ্ট তুমি পেয়েছ।"

রল আমাকে সান্ত্বনা দেয়। রল লুনাভা মিনির স্ব-ধর্মী। মূলত লুনাভা মিনির জন্যই আমি তখন তার সাথে বন্ধুত্ব করি। সে-সময় লুনাভা মিনির ধর্মের নারী-পুরুষ-শিশু সবাই আমার প্রাণের মানুষ। আর রল ছিল ভাল বন্ধু। সে বলে, যদি তার একটা বোন থাকত বা তার নাগালে কোনও মেয়ে থাকত, সে তাকে আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিত,আমার আহত হৃদয়কে সারিয়ে তোলার জন্য। "যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ সে তোমার সামনে বসে থাকত। তুমি হয়তো তাকে ভালবাসতে না, কিন্তু সে ধৈর্য ধরে তোমার কথা শুনত।"

রলের দয়া আমাকে স্পর্শ করে, কিন্তু সেই কল্পিত রমণী করে না। অন্য মেয়ের কথা শুনে লুনাভা মিনির মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। অন্য

মেয়ের সাহায্যে লুনাভা মিনিকে ভোলার চেয়ে লুনাভা মিনির কথা ভেবে কষ্ট পেয়ে মরে যাওয়া অনেক বেশি ভাল মনে হয়। বন্ধু আমাকে তার সারাদিন, একসাথে দুপুরের খানা, আর বিকালবেলা সিনেমা প্রতিজ্ঞা করে। রল এর দান আমার কাছে মূল্যহীন। কিন্তু আমি তাকে কিছু বলি না। আমার কান্নাও থামে না।

রল বলে, "তুমি আর কখনও ও-মুখো হবে না। আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য করব।"

রল আমাকে আর এক উপদেষ্টার কাছে নিয়ে যায়। এই উপদেষ্টাও ঘুম থেকে উঠে। এও রাগ করে না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রল তাকে সব খুলে বলে। এই উপদেষ্টা ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেয় না। "যাও, যাও," সে বলে। "আমরা যতই বলি যেওনা, তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না।"

উপদেষ্টার কথা সত্য হয়। সে-দিন বিকাল পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারিনি। দুপুর বেলাতেই আমি লুনাভা মিনির বাড়ি গিয়ে হাজির হই।

৩২

লুনাভা মিনির পিতা আমার জন্য দরজা খোলেন। আমি জানতাম লুনাভা মিনির পিতা বিদেশে। আমি তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম। এখন তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁর চোখ লাল। বুঝি ঘন্টা কয়েক আগে ফিরেছেন। সম্ভবত ঘুমাচ্ছিলেন। লুনাভা মিনির পিতাকে আমি কখনও পছন্দ করিনি। কিন্তু এই দুপুরে আমার তাঁকে ভাল লাগে। আমার দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেন, লুনাভা মিনি বাড়ি নাই। মাসির বাড়িতে বেড়াতে গেছে।

শ্রোতারা, আপনার কি কিছু বুঝতে পেরেছেন? আর কোনও খবর কি সেই দুপুরে আমাকে এর চেয়ে বেশি আঘাত দিতে পারত? লুনাভা মিনির পিতা আমাকে শান্তভাবে খবরটি দেন। তিনি যদি আমাকে গালি দিতেন বা আক্রমণ করতেন, বা আমার কাছে দশটা দরজার দাম চাইতেন, তাহলে আমার খারাপ লাগত না। কারণ, এটা ছিল আমার বিচারের দিন। অথচ তিনি বললেনটা কী? লুনাভা মিনি বাড়ি নাই, এটা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। কিছুতেই না।

আমার বুক থেকে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস বের হয়ে আসে। আহা, যদি শুধু সে বাড়ি থাকত। কী নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে সে বাড়ি ছেড়েছে। তারা ষড়যন্ত্র করে লুনাভা মিনিকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কোথাও কি এক ফোঁটা দয়ামায়া নাই? ঈশ্বরের দুনিয়াতে আমিই কি সবচেয়ে বড় অপরাধী? সবচেয়ে বড় নারী-নির্যাতনকারী? জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত বুকে নিয়ে আমি রাস্তার দিকে মুখ ফিরাই। এর মধ্যে আমি বুঝে গেছি, ভালবাসার দংশনে আমি বেশি দিন বেঁচে থাকব না।

কিন্তু আমি বেঁচে ছিলাম। পরে আমি বুঝতে পারি, মানুষের সহ্য ক্ষমতা অসীম। বরফের মধ্যে তাকে ফেলে দাও। তার হাত অবশ হয়ে যাবে। পা কেটে ফেলতে হবে। অণ্ডকোষ পাথর হয়ে যাবে। তবুও নিতম্ব থেকে মাথার তালু পর্যন্ত দিব্যি বেঁচে থাকবে। আগুনে ফেললে চামড়া পুড়বে, মাংস পুড়বে, তবু প্রাণপাখি যাবে না। ফেরার পথে আমি লুনাভা মিনির পিতার মুখের ভাষা বুঝতে চাই। এটা পরিষ্কার, সব কিছু জানাজানি হয়ে গেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিই, আত্মহত্যা করব।

এই বার আমার সিদ্ধান্ত আন্তরিক ছিল। চাইলেও আর আত্মহত্যার ভান করতে পারব না। আত্মহত্যাই করতে হবে। সহসাই তা করব।

রাস্তায় নামার পর আমার বুকের মধ্যে ভালবাসা পারমাণবিক বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়। আমি পাগলের মতো আমার হোস্টেলের দিকে শেষবারের মতো দৌড়াতে থাকি।

ইতিমধ্যে আমি অনেক মানুষের কাছে গেছি, তাদেরকে আমার দুঃখের কথা বলেছি। আশা করেছি, তারা আমার দুঃখ প্রশমনের চেষ্টা করবে। দু'একটি ভাল কথা শোনার জন্য আমি তখন ক্ষুধার্তের মতো তাদের চোখের দিকে চেয়ে থাকতাম। যারা আমাকে পছন্দ করত, তারা সান্ত্বনা দিত। অন্যরা নিষ্ঠুর আচরণ করত। তারা আমাকে নির্লজ্জ বলত; তারা বুঝতে পারত না, কী করে একটা ছেলে একটা মেয়ের কাছে দ্বিতীয়বার যায়। তাদের কেউ কেউ আমাকে পুরুষ বলেই স্বীকার করতে চাইত না। তারা আমাকে কানে দুল পরে ঘরে বসে থাকতে বলত। ওই সব ছেলে প্রতিদিন বিকালবেলা আমার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত। তাদের কেউ কেউ ঔদ্ধত্যের সাথে শল্য ব্যবস্থার কথা বলত। যাতে আমি যা তাতে রূপান্তরিত হতে পারি। তাদের কল্পনার সেই মানুষ আর যাই হোক, নারীর সম্মুখে কামনার শিকার হয় এমন পুরুষ ছিল না।

আমি দূর দিয়ে হেঁটে যেতাম, যাতে এই অপমানকর আলোচনা শুনতে না হয়। তাদের হাসিঠাট্টা আমার কানে আসত। কেউ কেউ রসিকতা করে বলত, শল্য ব্যবস্থার পর যদি আমি রূপান্তরিত হই, তাদের কে আমার শয্যাসঙ্গী হবে, তা নির্বাচন করার জন্য তারা লটারির ব্যবস্থা করবে। তারা বলত, আমার নারী আর পুরুষের মনের পার্থক্য বোঝা উচিত। পুরুষ নয়; শুধু নারীই ভালবাসা না পাওয়ার জন্য এমনভাবে কাঁদতে পারে। তারা আমাকে প্রভাবিত করত।

তাই এ-দিন আমার মনে হয়, আমার আর কারও কাছে উপদেশের জন্য যাওয়া উচিত নয়। লুনাভা মিনির কাছে যাওয়ার সব অজুহাত আমি হারিয়েছি। কিন্তু আমি কষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না। লুনাভা মিনির উপস্থিতি কেবল সেই কষ্ট দূর করতে পারত। আমি সত্যিই আর এক সেকেন্ডও কষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি কোনওমতে ঘরে ঢুকি। ঢুকে আমি দরজা বন্ধ করি। ততক্ষণে আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক রাত শুরু হয়ে যায়।

৩৩

সে-রাতে লুনাভা মিনি বাড়ি নাই, এ কথা ভাবতে আমার যে কষ্ট হয়, সে কষ্টের সাথে আমার জীবনের আর কোনও কষ্টের তুলনা চলে না। তবে সেই কষ্টের কথা আপনারা কখনও জানতে পারবেন না। এমন নয় যে সেই কষ্ট বর্ণনা করার মতো যোগ্য কোনও কবি পৃথিবীতে কখনও জন্মগ্রহণ করেনি। তারপরও আপনারা তা জানতে পারবেন না। কারণ ওটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। অবশ্য আমি যখন ইহকালে ছিলাম তখন আমি নিজেও ঈশ্বরের ইচ্ছেটা জানতাম না। জানলে আমি শ'খানেক বছর বেঁচে থাকতাম। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে পরকালে চলে আসতাম না। পরকালে এসে আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি সব জানতে পারি। এর সব কিছুই আপনাদের খুলে বলব। তখন আপনারা আরও বেশি বৃহৎ ও বেশি মহৎ কিছু জানবেন। ঈশ্বরের ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে সে রাতের ব্যাপারটা যতটা সংক্ষেপে বলা দরকার তার এক শব্দ বেশি বা কম আমি উচ্চারণ করব না।

সে রাতে কষ্ট আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আমি প্রাণপনে চাচ্ছিলাম কেউ আমার মাথা কেটে ফেলুক আর আমার হৃৎপিণ্ডটা বের করে নিক। কারণ আমি মাথার ভার আর হৃৎপিণ্ডের কম্পন সহ্য করতে পারছিলাম না। ওই দু'টি অঙ্গের উপর আমার যা কিছু নিয়ন্ত্রণ তখনও অবশিষ্ট ছিল, তা আমি সে-রাতে হারিয়ে ফেলি। জীবনে এত কষ্ট? আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি। কী এমন হয়ে যাবে, লুনাভা মিনি আমাকে ভালবাসলে? কী পরিবর্তন আসবে আমার জীবনে? লুনাভা মিনির কোন রসটা আর পাঁচটা মেয়ের কোন রসটার চেয়ে বেশি মিষ্টি বা বেশি কটা। লুনাভা মিনির কোন গন্ধটা তাকে জগতের অন্যান্য নারীর চেয়ে আলাদা করেছে? ভেবে দেখি, সে আমার পাশে বসে আছে, আর আমি কতটা সুখী হয়েছি। না। আমি খুব বেশি পার্থক্য দেখি না। বড় জোর তার নারীর পোশাক, বড় জোর সে পোশাক আমি আমার শরীরে জড়াতে চাই, অথবা তার পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে কিছুটা আনন্দ পাই, কিংবা তার বুকের ঢেউ দেখে পুলকিত হই। এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু না। আর একটু ভিতরে গেলেতো সেই একই গন্ধ, একই স্পর্শ, একই কদর্যতা। যার পার্থক্য পানি, খুশবু আর রঙের ব্যবহার না করে সৃষ্টি করা যায় না। এত বুদ্ধি খরচ করার পরও, আমি যে লুনাভা মিনিকে আর দেখব না, সেই ব্যথা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।

এক সময় আমি ঘরের মধ্যে লাফ দিতে শুরু করি। আস্তে আস্তে লাফ দিই, যাতে আশপাশের ছাত্রদের ঘুমাতে অসুবিধা না হয়। ছোট ছোট লাফ দিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া হৃদয়ের দেয়ালের টুকরোগুলোকে আমি জায়গামতো বসানোর চেষ্টা করি। আমি অন্ধকারে ছিলাম। এক বার আলো জ্বালাই। আলোতে একাকিত্বের ভয়ে মনে হয়, আমি মূর্ছা যাব। আমি মূর্ছা যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারি না। আমি আলো নিভিয়ে দিই। অন্ধকার অনেক ভাল। আমি আর আলো জ্বালানোর সাহস পাই না।

আহা যদি বাকি জীবনটা অন্ধকারে থাকা যেত! আলোর ভয়ে আমি কাঁপতে থাকি। আতঙ্ক হয়, রাত শেষে সকাল হবে, সূর্য উঠবে। সূর্য ওঠার পর আবার পুরনো পৃথিবী, আবার লুনাভা মিনির আধিপত্য। আমি চাই ভূমিকম্পে শহরটা ধ্বংস হয়ে যাক। শহরের সব নারী-পুরুষ মরে যাক। শুধু লুনাভা মিনি বেঁচে থাকুক। আমি দেখতে চাই, এই পৃথিবীতে একা হওয়ার পরও তার সেই দেমাগ থাকে কি না। দেখতে চাই, কার পায়ের নিচে লুনাভা মিনি তখন

গড়াগড়ি খায়। কিন্তু হায়, কোথাও সে ভূমিকম্প হয় না। যদি যুদ্ধ শুরু হত, তাতে যোগ দেয়া যেত। কোন মিছিল না, সমাবেশ না। দেশ অনেক আগেই স্বাধীন হয়ে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার এমন উপযুক্ত সময় আর কারও জীবনে কখনও আসেনি।

আমার তখন অনেক অনুশোচনা হয়। আহা। যদি শুধু প্রেমে না পড়তাম। যদি জানতাম, প্রেমে পড়ে আমার এ অবস্থা হবে, তবে কখনও প্রেমের নাম নিতাম না। রাজা ইডিপাস কি জেনেশুনে অজাচারে জড়িয়েছিল? ফাঁসির দড়ি গলায় পরার আগে খুনী কি ভাবে না, আহা যদি আমি খুন না করতাম। আমার ফ্রাংকেনস্টাইন ভালবাসা আমাকে ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মতো গিলে খায়; তাকে থামানোর কোনও শক্তি আমার নাই। যদি শুধু আমি প্রবৃত্তিকে টেনে ধরতাম, যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতাম! তখন আর কোনও সুযোগ অবশিষ্ট নাই। শুধু যদি জানতে পারতাম, তখন লুনাভা মিনি কোথায় আছে, কী করছে। অথচ আমার কিছুই জানা ছিল না।

আমি কান্নার হাতে আত্মসমর্পণ করি। প্রতিদানহীন প্রেম অশ্রুর ফোয়ারা হয়ে ছুটে বের হয়। তারপরও অনুশোচনা কমে না। তখন আমার সব শেষ। সেই উন্মাদ রাষ্ট্রপতির মতো, যে মনোযোগ দিয়ে তার দেশ গড়েছিল। চল্লিশ বছর ধরে সে সেনাবাহিনী তৈরী করে কোনও এক দিন পৃথিবী জয় করার আশায়। কিন্তু তার আর পৃথিবী জয় করা হয় না। সে পৃথিবীকে আক্রমণ করার আগে পৃথিবী তাকে আক্রমণ করে বসে। একযোগে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে তারা উন্মাদ রাষ্ট্রপতির সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী ধ্বংস করে, তারপর তারা তার দেশের সব মানুষ হত্যা করে; রাষ্ট্রপতির সকল পত্নী, উপপত্নী, সন্তান, নাতি-নাতনি, কেউ রেহাই পায় না। পৃথিবীর সৈন্যরা তাদের বাড়িঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলে। রাষ্ট্রপতির ভবনগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়; বাংকারগুলোকে মাটি দিয়ে ভরাট করে; গাছ কাটে; জঙ্গলে আগুন লাগায়; শিল্পকারখানা আর তেলক্ষেত্রগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়; পশুপাখিকে বিষ খাওয়ায়; বিষ ছেড়ে দেয় নদী, হ্রদ, আর সমুদ্র উপকূলে। সব কিছু ধ্বংস করে তারা সেই রাষ্ট্রপতিকে একা ফেলে রেখে চলে যায়। পরিত্যক্ত ভূমিতে উন্মাদ রাষ্ট্রপতি নিজের আঙ্গুলের ডগা থেকে রক্ত চুষে খায়। কারণ, তখন তার সব শেষ। সব শেষ তখন আমারও। এবার বিকাল বেলা খেলার মাঠের কোনায় দাঁড়িয়ে ফুটবল খেলা দেখ। হায়। জীবনে

কখনও আমি খেলার মাঠে মনোযোগ দিতে পারিনি। এক সময় খেলা দেখতে গিয়ে মাঠের কোনায় দাঁড়িয়ে লুনাভা মিনির কথা ভেবেছি। তখন আমার মনে এই কষ্ট ছিল না।

এখন শুধু ব্যথা। লজ্জা, আর হতাশা। এখন সব শেষ।

আমার দাঁতে দাঁত ঘষা লাগে। প্রাণ মুক্তি চায়। এক বার মেঝেতে বসি, একবার বিছানায় মাথা রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করি, তারপর মেঝেতে গড়াগড়ি খাই। কিছুতেই কাজ হয় না। শীতল মেঝে আমাকে আরাম দিতে পারে না। এক বার মাস্তানদের বোমার আগুনে ছয় জন মানুষকে পুড়ে মরতে দেখেছিলাম। শরীরে আগুন নিয়ে তারা আমার মতোই নেচেছে। তাদের সে কষ্ট এক সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার কষ্টের কোনও শেষ নাই। ভবিষ্যতের দিকে যত দূর চোখ যায়, তত দূর শুধু অন্ধকার দেখি। নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা বুঝি নিরবচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ না হয়ে অনুভব করা যায় না। লুনাভা মিনি কখনও ইঙ্গিতেও বলেনি, সে আমাকে ভালবাসে। প্রেমকৌতুক কিছুটা সে করেছে সত্যি, কিন্তু তা সে করেছে শুধু আমার পিড়াপীড়ির জন্য। ভদ্রতা করে আমাকে সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে দিয়েছে। আর তাতেই আমি তাকে ভালবাসার লোভ সামলাতে পারিনি।

আমার ব্যথা ছিল চূড়ান্ত এক ক্ষতির ব্যথা। ঈশ্বর পৃথিবীতে আমার জন্য যে নারীকে পাঠিয়েছে, সে নারী আমার কাছে আসার জন্য প্রস্তুত নয়। কারণ একটাই, জীবনে আমি শুধু তাকে চেয়েছিলাম। যদি আমি তাকে চাওয়ার পাশাপাশি অন্য কিছু চাইতাম—ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, চাকরিবাকরি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সামাজিক জীবন—আমি তাকে পেতাম। আমার কাছে আসতে সে তখন আর লজ্জা পেত না। আমার উচিত ছিল আর দশ জনের মতো হওয়া। যারা রাতের বিছানার কীর্তি সকাল বেলার আড্ডার বিষয় করে, তাদের মতো হলে কোনও না কোনও নারীকে আমি পেতাম। দুই জগতের সব বাসিন্দা আমাকে একটা কথাই বলেছে, অতি চাওয়াই ছিল ওই জগতে আমার নারী না পাওয়ার এক মাত্র কারণ। অথচ তারা জানতই না, আমার চাওয়া কত এক-কেন্দ্রিক ছিল।

৩৪

শৈশবে এক দিন আমি পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে বহুদূর চলে গিয়েছিলাম। এক কৃষক ঠেলাগাড়ি করে সবজি নিয়ে শহরে যাচ্ছিলেন। অনেক দূর থেকে তিনি এসেছেন। আরও বহু দূর তিনি যাবেন। কতগুলো ছেলে একটা একটা করে তার বেগুন, আলু, গাজর, মুলা, শালগম তুলে নিয়ে রাস্তার বাইরে ছুঁড়ে মারছিল। লোকটি কেঁদে কেঁদে ছেলেগুলোকে অনুরোধ করেন, তাঁর ক্ষতি না করার জন্য। কিন্তু বিচ্ছুগুলি তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না। বরং তিনি যত কাঁদেন ওরা তত হাসে। একটা বিচ্ছু বড় একটা ফুলকপি তুলে নিয়ে মাঠে ফেলে দেয়। কৃষকটি ছেলেগুলিকে তাঁর শরীরের ঘাম দেখান আর তাঁর উপর দয়া করতে বলেন। তাঁর আকুতি শুনে ছেলেগুলো আরও মজা পায়। দ্বিগুণ আনন্দে তারা তাঁর শাকসব্জির উপর আক্রমণ চালায়।

কৃষকটি এক সময় গাড়ি ঠেলা বন্ধ করেন। ছেলেগুলির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন,

"সাহেবদের সন্তানেরা, আপনারা আপনাদের আনন্দের জন্য আমাকে উলঙ্গ করুন, কিন্তু মেহেরবানি করে আমার জিনিস নষ্ট কোরবেন না।"

আমার কাছে কৃষকটির লাল চোখে অশ্রুকে রক্ত মনে হয়। কিন্তু ছেলেগুলোর তাতে কোনও করুণা হয় না। সবজি হারানো কৃষকটির জন্য কেয়ামতের মুখোমুখী হওয়ার চেয়ে ভয়ানক। সবজি বিক্রির টাকা থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করে তিনি তাঁর বড় মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছিলেন। তাঁর কথা শুনে আমার লোটাসের কথা মনে আসে। কত কষ্ট করে আমাদের দেশের পিতারা তাঁদের বড় মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় করতেন।

সে দিন কৃষকটিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমি ছেলেগুলোর সাথে লড়াই করি। আমি অনেক কিলঘুসি খাই, অনেক অপমানিত হই, কিন্তু অবশিষ্ট সবজিগুলো রক্ষা পায়। বিচ্ছুর দল চলে গেলে আমি আর সেই কৃষক রাস্তার দুই পাশ থেকে কুড়িয়ে ফেলে দেয়া সবজিগুলি আবার ঠেলাগাড়িতে তুলি। শহরের দিকে রওয়ানা দেয়ার আগে কৃষকটি ঈশ্বরের দিকে দুই হাত তুলে আমার জন্য প্রার্থনা করেন। ওই প্রার্থনার সময় আমার মনে হয়েছিল,

আমি ঈশ্বরের কাছে এক দিন যা চাইব, আমার ভাল কাজের জন্য ঈশ্বর আমাকে তা-ই দিবেন। আমি কৃষকটির সাথে দুই হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে লুনাভা মিনিকে চাই : ভবিষ্যতে, যথা সময়ে, স্থায়ীভাবে; তত দিনে যেন আমি আরও অনেক ভাল কাজ করতে পারি।

লুনাভা মিনির কথা ভেবে কত কী করেছি, ভাল কাজ, ভাল চিন্তা, কত প্রার্থনা, শুধু একটি বার তার কণ্ঠমণিতে জিবের পরশ পাওয়ার জন্য। সে ছিল আমার সব ভাল কাজের ফল। আমি তাকে পেয়েও আপন করতে পারিনি। অধৈর্যের কশা দিয়ে আমি তাকে আঘাত করেছি। আমার ভয়ে তাই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে মাসির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। সে রাতে আমি নিজেকে কিছুতেই বুঝ মানাতে পারছিলাম না।

শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি নামে। আমি রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিই। স্ট্রিটলাইটের আলো ভেদ করে গাছগুলোর উপর ঝাঁঝাঁ শব্দে বৃষ্টি পড়ে। আমি কোথাও কাউকে দেখি না। মানুষজন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। মানবহীন পৃথিবীতে সব কিছু ভিন্ন মনে হয়। আমার ভালবাসার অনুভূতি নির্জন আবহ পায়। সেই অনুভূতি—যা সব অনুভূতির রাজা, রানী, আর পতিতা—আমার ভিতর আর বাহিরের সব কিছু নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। শ্রোতারা, মনে রাখবেন, শেষ রাতের বৃষ্টির মতো আর কিছু প্রতিদানহীন ভালবাসার এমন কষ্ট দিতে পারে না।

বৃষ্টির কষ্টটা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার মনে হয়, ওই কষ্টের চেয়ে মৃত্যু ভাল। মৃত্যুর পর এমন আর কী হবে? কবরের মধ্যে অন্ধ আর বধির দেবদূত আসবে। বাড়ি দিয়ে ডানের হাড্ডি বামে আর বামের হাড্ডি ডানে নিবে। কবরের বাম পাশ খুলে যাবে। দাউ দাউ করে নরকের আগুন কবরে ঢুকবে। এ আর এমন কী খারাপ অবস্থা। তা ছাড়া আমার কখনও মনে হয়নি ঈশ্বর আমাকে সে শাস্তি দিবেন। আসলে মৃত্যুই তখন আমার জীবনের সমস্যার একমাত্র সুরাহা ছিল। কিন্তু মৃত্যু ঘটানোর জন্য আমার মনে কোনও শক্তি ছিল না। লুনাভা মিনির গুম হয়ে যাওয়া আমার সেই শক্তি কেড়ে নিয়েছে। আমি ভোরের জন্য অপেক্ষা করি।

৩৫

সহপাঠী কাফ্রি একদিন এক জিননিয়ন্ত্রকের কথা বলেছিল। কাফ্রি বলেছিল সে ব্যক্তির জিন কাফ্রির বোনের ভ্রষ্ট স্বামীকে ঘাড়ে করে ধরে এনে তার স্ত্রীর সামনে আছাড় মেরে ফেলেছিল। কাফ্রির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সে-দিন মাথা ঘামাইনি। ফলে ওই জিননিয়ন্ত্রক সম্পর্কে আমার কাছে তেমন কোনও তথ্য ছিল না। ওই ভোরে আমার অজ্ঞতা আমার চোখের ভিতর তিন ইঞ্চি পরিমাণ আঙ্গুল ঢুকিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দেয় আমার জীবনে লুনাভা মিনি ছাড়া আর কোনও কিছু নিয়ে মাথা না ঘামানো কতটা বেঠিক ছিল। যে করেই হোক আমি সেই জিননিয়ন্ত্রকের সাথে দেখা করতে চাই। আমি জানি না কোথায় তার দপ্তর; শুধু এটুকু মনে আছে, জিননিয়ন্ত্রকের আস্তানা শহরের পুরনো অংশে। সূর্য তখনও উঠেনি। আমি অন্ধকারে আলমারিতে হাত ঢুকাই। যা পাই তা গায়ে দিয়ে উষার অন্ধকার ঠেলে কাফ্রির বাড়ির দিকে রওয়ানা হই। আমি সরাসরি সেই এলাকায় যাই। রুটি সামনে নিয়ে বসে পড়া মুদিদের জিজ্ঞেস করে কাফ্রির বাড়ি খুঁজে বের করি। কাফ্রির মা দরজা খোলেন। তিনি বলেন কাফ্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে বের হয়ে গেছে। অনেক দয়ালু মহিলা। আমি এমন ভাব করি যেন আমার দশটা মা আছে। যেন আমার মা আমাকে আমার দুই বছর বয়সে উঠানে ফেলে রেখে কবরে ঢুকেনি। আমার তখন এমনও সন্দেহ হয়েছিল যে আমার প্রেয়োবাদী পিতা দিওনিশ শেকাব মায়ের দেহের সুখ নিয়ে তাকে অন্ধকারে গলা টিপে মেরে জ্বরের গল্পটা ফেঁদেছিল। দিওনিশ শেকাব যে গল্পই বানাক না কেন, এলকায় তার চেলারা তা প্রতিষ্ঠিতি করতোই। তবে দিওনিশ শেকাব নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মন তখন আমার ছিল না। আর আমি কাফ্রির মার দিকে ফিরেও তাকাই না। আমার একরোখা মস্তিষ্ক আমাকে উল্টা দিকে ঘোরায়।

আমি সে দিকে হাঁটা শুরু করি। পুরান শহরে ঢুকে প্রথম দোকানদারের কাছে জিননিয়ন্ত্রকের কথা জিজ্ঞেস করি। দোকানি তাঁর হাতে ধরে রাখা খোলা মধুর বৈয়ামের উপর থেকে চোখ তোলেন না, আমার কথা ভাল করে শুনেছেন কি না আমি তাও বুঝতে পারি না। মধুর দিকে তার দৃষ্টি যেন কাঁঠালের আঠা

দিয়ে জোড়া লাগানো আছে। আমি বার বার বলি জিননিয়ন্ত্রক, জিননিয়ন্ত্রক। শেষে বিরক্ত হয়ে দোকানি তাঁর গলাটা লম্বা করে মাথাটা উপরের দিকে বাঁকা করেন, আর তাঁর লাল গলা থেকে দু'টো কর্কশ শব্দ বের হয়, সামনে যান।

আমি সময় নষ্ট না করে সামনের দিকে যেতে থাকি। একে একে দোকানদারদের জিজ্ঞেস করি। কেউ বলেন সামনে যেতে, কেউ পিছনে, কেউ ডানে, কেউ বাঁয়ে যেতে বলেন। আমি সব দিকেই যাই। কোথাও জিননিয়ন্ত্রককে পাই না। এক সময় এক পথচারী সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, জিননিয়ন্ত্রক কি না তিনি জানেন না, তবে সামনের গলির শেষ মাথায় এক সাধক বাস করেন যিনি মৃত মানুষকে জীবিত করা ছাড়া আর সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, এমনকি নারীকে পুরুষ আর পুরুষকেও নারীতে রূপান্তরিত করতে পারেন।

আমি দেখি সামনের গলির দিকে অনেক লোকের চলাচল। আমি দ্রুত গলিটার ভিতরে ঢুকি। নতুন একটা বাড়ির দোতলায় সাধককে পাই। জায়গাটি সাহায্যপ্রার্থীতে ভরা। সিঁড়িতেই আমাকে থেমে যেতে হয়। সিঁড়ির উপর দু'টি লাইনে নারী-পুরুষ বসা। শিশুদের নিয়ে অভিভাবকরা এসেছেন। আমি চারিদিকে তাকিয়ে, জুতা খুলে, একটি লাইনে বসে পড়ি। লাল ঘোমটা পরা এক নারী আমার দিকে তাকান। আমি মাথা নিচু করি। সমস্যাসঙ্কুল মানুষের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ মনে হয়। সাধক নিশ্চয়ই আমার সমস্যা সমাধান করবেন।

প্রশস্ত সিঁড়িতে বাইরের দিকে মুখ করে আমরা দু'টি লাইনে বসে আছি, মাঝখানে হাঁটার জায়গা। প্রতি লাইন থেকে একজন করে উঠে গিয়ে সাধকের সহকারীর নিকট ফি জমা দেন। এ এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। কিন্তু আমি ধৈর্য হারাই না।

আমি অবাক হই। কারণ ধৈর্য জিনিসটা আমার চরিত্রে ছিল না। এক দিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় এক খানাপিনার আয়োজন ছিল। বন্ধু ও উপদেষ্টা রল আর আমি লাইনে দাঁড়িয়েছি খাবার ঘরে ঢোকার জন্য। কিছু ছেলেমেয়ে লাইন ভেঙ্গে আগে চলে যায়। যারা পিছনে পড়ে, তারা রাগ করে। কেউ কেউ প্রতিবাদ করে। রল প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু আমি করি। এক সময় লাইন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আমি রলকে ফেলে রেখে সামনের দিকে লাফ দিই। খাবার টেবিলে আমি সবার অপরিচিত। অন্যরা একে অপরের পরিচিত। সেখানে আমি রলকে মিস করি।

চোখে পানি এসে যায় যখন ভাবি আমি লুনাভা মিনিকে মিস করেছি। ভেবে দেখি আমি আমার বিগত জীবনে সব কিছুই মিস করেছি। কারণ লুনাভা মিনি ছাড়া আমার আর অন্য কোনও চাওয়া ছিল না। হে আমার অধৈর্য শ্রোতা, যদি আপনি প্রেমিক হন, আর আপনার কম্পালসন রোগ থাকে, আপনি সব কিছু মিস করবেন। আমার দিকে চেয়ে দেখেন। আমি মোটামুটি একটা রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলাম। আমাদের দেশে জন্মের পর এর চেয়ে ভাল চামচ মুখে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে কি আমি আর কয়টা বছর অপেক্ষা করে আর দশ জন নারীপুরুষ যে ভাবে জোড়ায় জোড়ায় পাদ্রিদের উপস্থিতিতে সামাজিক বিধিতে একে অপরকে প্রেম, দেহ, আর সঙ্গ দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে সুখের রাস্তা তৈরী করে, সেই রাস্তায় যেতে পারতাম না? খুবই পারতাম। যদি আমি নারীর কথা এত বেশি না ভাবতাম, বা তাদেরকে না চিনতাম, তা হলে যাকে পেতাম তাকেই মধু মনে হত। সেভাবে কি এখনও আপনাদের জগতের শত শত নারীপুরুষ সুখী হচ্ছে না? নিশ্চয়ই হচ্ছে। তা হলে কে আমাকে সে পথে যেতে বাধা দিল? ওই কম্পালসন। যা আপনার রক্তে বিষক্রিয়া চালায়, আর আপনাকে দুর্ভাগা করে। যদি আপনার কম্পালসন থাকে, কেউ আপনাকে করুণা করবে না। কবরের মধ্যে পিঁপড়া আপনার মাংস খুঁটে খাবে, পান্নস সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আপনার বুকের উপর বসবে। আপনি অভিশপ্ত। শেষ বিচারের দিন শাস্তির দেবদূতরা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটাতে পিটাতে আপনাকে নরকের দরজায় নিয়ে যাবে, আর তখনও কম্পালসন আপনাকে ছাড়বে না। দেবদূতদের ঠেলে দিতে হবে না। তাঁদের পিছনে ফেলে আপনি নিজেই নরকে ঝাঁপ দিবেন। কম্পালসনের কারণে ইহকাল আর পরকাল দু'-ই আপনি হারিয়েছেন। অথচ জীবনে সেই প্রথম, সাধক পুরুষের সিঁড়িতে, কম্পালসন আমাকে পরাজিত করতে পারে না।

এক ঘন্টা পর আমার ডাক আসে। সাধক আমাকে কিছু প্রশ্ন করেন। আহত প্রেমিকের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। আমার প্রেমিকা বিধর্মী, এ কথা শুনে তাঁর হেঁচকি উঠে। তিনি নড়েচড়ে বসেন।

আমি তাঁর ওই প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। অসংখ্য উপদেষ্টার সাথে কারবার করে আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আমি তাঁকে বলি, আমাকে বিধর্মী একটি মেয়ে পেতে সাহায্য করার জন্য পুনরুত্থানের দিন ঈশ্বর তাঁকে দায়ী করবেন না।

"সেই দায় আমার একার," আমি গলা নামিয়ে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করি।

সাধক চিন্তা করেন। তাঁর মুখ কালো হয়ে যায়। তিনি বলেন, "মেয়েটা তোমাকে চায় না। যদি চাইত কোনও কথা ছিল না। নেগেটিভ পজিটিভ মিলে জ্বলে উঠত। তুমি ফিরে আস। এটাই তোমার জন্য ভাল ব্যবস্থা।"

"অলৌকিক মানব," আমি বলি। "ফিরে আসতে পারলে আমিই সব চেয়ে বেশি সুখী হতাম। আমি চেষ্টা করেছি। দিনের পর দিন সাধনা করেছি। কিন্তু ফিরে আসতে পারিনি। তাই আপনার কাছে এসেছি সাহায্যের জন্য। দয়া করে আমার জন্য কিছু করুন। না হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

আমার কথা শুনে সাধক জ্বলে উঠেন। চিৎকার করে বলেন, "আত্মহত্যাকারীকে আমি চিকিৎসা করি না। এটা পশ্চিমের ব্যাপার। পূর্ব দিকের দেশগুলোতে আত্মহত্যার অনুমোদন নাই। ধর্মে তার নিষেধ আছে।"

আমার বিষয়টা যে একটু গোপনে আলাপ করা দরকার, দরকার একটু নিচু স্বরে কথা বলা, আমি যে তরুণ, আমি যে লজ্জা পেতে পারি, এ ব্যাপারটা সাধক আমলেই নেন না। তিনি এমন ব্যবহার করেন, যেন আমি এক গরু চোর। আমি কাতর হয়ে তাঁর দিকে চাই। তিনি বলেন, "যুবক, আমি তোমাকে সাহায্য করতে বাধ্য নই। কারণ তুমি চাও নিষিদ্ধ জিনিস। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে এই পাগলামি থেকে রক্ষা করেন।"

তাঁর কথা আমার সহ্য হয় না। তাঁকে আমার একটা শয়তান মনে হয়। আমি সপ্রতিভ আর কঠোর হই। আমার ভাব দেখে তিনি গলা নরম করেন। "পুত্র, আত্মহত্যা কোরো না।"

নীল আলখাল্লা পরা সুন্দর চেহারার এক যুবক সাধকের কাছে আসে। সাধক তাঁকে পকেট থেকে বের করে এক হাজার রোনা দেন। সাধক বলেন, প্রতিদিন সকালে এ ভাবে তিনি চৌদ্দ হাজার রোনা খরচ করেন। তিন স্ত্রীর গর্ভ থেকে তাঁর চৌদ্দ ছেলের জন্ম হয়েছে। বড়টার বয়স চব্বিশ, ছোটটার ষোলো। নিজের সন্তানকে দেখিয়ে সাধক বলেন :

"প্রতি দিন সকালে আমি একজন মেজিস্ট্রেটের এক মাসের বেতনের সমান টাকা আমার ছেলেদের পিছনে ঢালি। তুমি আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছ। ধর্মের উপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে আমাকে রোজগারে নামতে হয়েছে। তুমি একটা মেয়ের পিছনে ঘুরে জীবনটা নষ্ট করছ।"

সাধকের কথায় আমার হুঁশ আসে। সেটা বোধ হয় সাধকও বুঝতে পারেন। তিনি বলে যান :

"সময় থাকতে তৈরী হও। চোখে দেখো না, দেশটা ডুবে যাচ্ছে। যদি না দেখো, প্রতিদিন সকালে আমার সামনে এসে বসো। সময় থাকতে প্রস্তুত না হলে এক দিন তোমাকে লোহার রডে মাথা কুটতে হবে।"

আমার রাগ উঠে। সাধক থামেন না।

"লজ্জা করে না?" সাধক চেঁচিয়ে বলেন, "এই বয়সে তাবিজ নিতে এসেছ।"

আমি কাঁচুমাচু করে মাথা নামাই। আবার তাঁর দয়া হয়। এবার তিনি আন্তরিকভাবে বলেন, "তুমি খুব পেরেশানি করছ, পুত্র। পেরেশানি মর্দামি শক্তি নষ্ট করে। আর মর্দামি না থাকলে তাকে আটকাবে কী দিয়ে? জীবনে অনেক মেয়ে পাবে। হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করবে। প্রতি সকালে ঘি আর মধু খাবে। আমাকে দেখো। এই বয়সেও তিন স্ত্রীকে তাসের মতো শেফল করছি।"

আমি সাধকের দিকে চোখ কটমট করে তাকাই। তিনি ভাবেন, এক দিন আমি দলবল নিয়ে এসে তাঁর দপ্তর ভাঙচুর করব। ফিরে আসার সময় তিনি তাঁর সহকারীকে বলে, আমার ফি-টা ফেরত দিতে।

সকাল থেকে যে আশা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তা আমার নষ্ট হয়ে যায়। আর ব্যথা দ্বিগুণ হয়।

৩৬

এই লোক জিননিয়ন্ত্রক ছিলেন না। তাঁর আস্তানা থেকে বের হয়ে আমি জিননিয়ন্ত্রককে খুঁজতে থাকি। আমার মাথায় ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে। তাতে কিছু সুবিধা হয়। মেঘ-বৃষ্টিতে চেনা শহর অচেনা লাগে। জিননিয়ন্ত্রককে খোঁজার জন্য এটা ছিল একটা উপযুক্ত আবহাওয়া।

জিননিয়ন্ত্রককে খুঁজে পাওয়ার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা আমার সঙ্কল্প দ্বিগুণ করে।

জিননিয়ন্ত্রককে আমি কবর থেকে টেনে তুলতে চাই। আমি আমার প্রেমের ধর্ম বুঝে গেছি। প্রামাণিক গ্রন্থগুলো প্রেম সম্বন্ধে যা বলে, আমার প্রেম তার উল্টা পথে চলে। এর কারণ, আমি প্রেমের জন্য খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তরুণরা যখন পড়াশুনা আর চাকরিবাকরির পরিকল্পনা করে, আমি তখন প্রেমের পরিকল্পনা করেছিলাম। পৃথিবীতে আমার জীবনের পরবর্তী দিনগুলিতে আমার দুরবস্থা দেখে আমার শ্রোতারা প্রেম থেকে বিমুখ হবেন না বলেই আমি আশা করি। কারণ প্রেম না পেলেও আমি ঈশ্বরের ফুঁকে দেয়া জ্ঞান পেয়েছি। আর তা দিয়ে আমার প্রাণ এখন উন্নততর জীবন যাপন করছে। যদিও তা পরকালে। আর পরকালের মুক্তিইতো আসল মুক্তি। কারণ তা অনন্ত।

জিননিয়ন্ত্রককে খুঁজতে খুঁজতে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ি। পতিত জায়গাটায় দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করি। এক কলস প্রশ্রাব। কী আর বলব। এটা প্রেমরোগের সুবিধা। প্রেমরোগে ধরলে আর কোনও রোগে ধরে না, খুন করলেও পাপ অনুভূত হয় না, জীবাণুরা দূরে থাকে, তলপেটে এক গ্যালন প্রশ্রাব জড়ো হলেও এক বিন্দু চাপ অনুভূত হয় না।

শরীর হালকা হওয়াতে আমি আরাম করে হাঁটি। পথে যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেক করি, "ভাই, জিননিয়ন্ত্রক কোথায় থাকে জানেন কি? আমার তাঁকে খুব দরকার। আমাকে একটু সাহায্য করুন।"

অনেকে বলেন, তাঁরা জিননিয়ন্ত্রকের কথা শুনেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে জিননিয়ন্ত্রকের ক্ষমতার কথাও তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁদের সমস্যা অর্থনৈতিক, আবেগবিষয়ক নয়, তাই তাঁরা তাঁর কাছে যান না। তাঁরা সবাই একনায়ক রাষ্ট্রপতির পতনের জন্য অপেক্ষা করছেন। আশা করছেন, তখন সুদিন আসবে আর অনেক চাকরি পাওয়া যাবে।

তাঁদের কথায় আমি বুঝি, যাঁরা ক্ষুধার যাতনায় কাতর, ঈশ্বর তাঁদের প্রতি অনেক বেশি সদয়। তাঁরা ধৈর্য ধরতে পারেন। আমি তা পারি না। প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যায় জর্জরিত মানুষের থেকে আমি আলাদা। দিন যত গড়ায়, আমার প্রেমের ক্ষুধা তত বাড়ে। যখন আর পা চালাতে পারি না, তখন এক দয়ার্দ্র লোক আমাকে জিননিয়ন্ত্রকের সন্ধান দেন। তিনি বলেন, তাঁর বড় ভাই নিপীড়ক স্ত্রীর মৃত্যু ঘটানোর জন্য জিননিয়ন্ত্রকের সাহায্য নিয়েছিলেন। মানুষটার সাথে ঘন্টা দু'য়েক হাঁটলে আমি তাঁর বড় ভাই'র সাথে মিলিত হতে পারব। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বলেন, তাঁর মোটোরসাইকেলটা নষ্ট।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বলি যেটুকু তথ্য তিনি আমাকে দিয়েছেন তাতেই আমার চলবে। একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া গেছে। তার উপর ভিত্তি করে আমি লোকজনকে জিননিয়ন্ত্রকের সঠিক দপ্তরের সন্ধান চাই। শেষ পর্যন্ত এক লোক পথ বাতলে দেন। আমি শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাড়ে গিয়ে লঞ্চে চড়ি। নদীর উপর বৃষ্টি পড়ে। পৃথিবীটাকে আরও অচেনা লাগে। আহা কী শান্তি। লঞ্চের ছাদে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, আমি আমার পরিত্রাতার দিকে এগিয়ে যাই।

জিননিয়ন্ত্রকের আস্তানায় গিয়ে মনে হয়, একটা কিছু সমাধান আসন্ন। তাঁর চেলা গোল একটা আয়নার ভিতর তাকিয়ে জিন থেকে সমস্যার সমাধান জেনে নিচ্ছিলেন। তাঁদের দু'জনকে ঘিরে আছে সমস্যাসঙ্কুল মানুষের জটলা। জিননিয়ন্ত্রক পাশে বসে চেলার সাহায্যে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। আরও অনেক লোক পাশের একটা ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। আমি লাইন রক্ষা করার দায়িত্বে থাকা একজনকে ঘুস দিয়ে লাইনে ঢুকেছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি জিননিয়ন্ত্রকের সাক্ষাৎ পাই। আমার সমস্যার কথা শুনে জিননিয়ন্ত্রক বলেন, এর সমাধান কঠিন। চেলার মাধ্যমে জিন আমাকে গালি দেয় :

"পোঁদের ফুটো, সে তোমাকে চায় না। তারপরও তুমি তাকে জ্বালাতন কর।"

চেলা আর জিন উভয়ের নিয়ন্ত্রক হিসাবে জিনসাধক বলে, তিনি আমার জন্য কিছু করতে পারবেন না, কারণ জিন আমার সমস্যা সমাধানের কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না। এরপরও যদি আমি ব্যবস্থা চাই, আমি যেন দুই গ্রাম সোনার সমপরিমাণ রোনা নিয়ে মঙ্গলবার রাতে জিননিয়ন্ত্রকের দপ্তরে হাজির হই। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাকে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে, বিধর্মী মেয়ের প্রেম পেতে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থানের দিনে কোনও প্রশ্ন করবেন না।

"আর একটা কথা," তিনি বলেন, "আমার ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।"

শহরের বাইরে অবস্থিত জিনসাধকের ভাঙ্গাচোরা ইটের কার্যালয়। সেখানে অসংখ্য লোক, যাদের সমস্যার শেষ নাই। এক বিধবা এসেছেন সাধককে একটা ছাগল দিতে। সাধক তাঁর হারানো ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এক তরুণী তার ভাইকে নিয়ে এসেছে। তরুণী এক তরুণের প্রেম চায়। আমার

তাকে বলতে ইচ্ছে হয়, "প্রিয় কুমারী, তোমার গোঁফ রয়েছে তো কী হয়েছে? তুমি আমাকে ভালবাসো। আমি তোমাকে।" একশজন ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর এক মাঝবয়সী লোক এসেছেন সর্দিকাশির চিকিৎসা করাতে। আর একজন এসেছেন অপূর্ণকালিক রেতপাতের ব্যবস্থা নিতে। ঘোমটা পরা এক মহিলা মাস্তানদের অত্যাচারের দুঃস্বপ্ন থেকে রেহাই চান। অঙ্গহারা, মামলাহারা, ব্যবসাহারা, প্রেমপ্রীতিহারা শত শত মানুষ প্রতিদিন জিনসাধকের কাছে আসেন। জিনসাধক সবার জন্য কিছু না কিছু করেন।

অলৌকিক সমাধানের জন্য পথে বের হয়ে সে-দিন আমি জীবন ধরে রেখেছিলাম। পিতার কাছে টেলিগ্রাম পাঠাই, একটা গাড়ির চাকার নিচে পড়ে আমার বাম পা ভেঙ্গে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে হাসপাতাল আমার বাকিতে চিকিৎসা করেছে। হাসপাতালের বিল এক লাখ রোনা। পিতা যেন তাড়াতাড়ি রোনা পাঠান। আমি জানতাম পিতা আসবেন না। গ্রাম থেকে, এমনকি ঘর থেকে, বের হওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। কেন পছন্দ করতেন না, তা অনেক পরে জেনেছি। তিনি আসলে খ্যাপাবুড়ির আচল ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না। যখন তা বুঝেছি, তখন মনে মনে হেসেছি। মনে পড়ে, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে এসে পিতা কীভাবে ছটফট করছিলেন। আমাকে কোনও রকম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তাটা চিনিয়ে দিয়ে তিনি বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তবে আমি যখন যত রোনা চাইতাম, তিনি পাঠাতেন। এবার আমি চেয়েছি এক লাখ রোনা। তিনি পাঠিয়েছেন দেড় লাখ। তিনি আসবেন না জানার পরও, আমি চিঠির শেষে লিখি, আমি এখন ভাল আছি, আপনার দেখতে আসার দরকার নাই।

এক মঙ্গলবার রাতে পঞ্চাশ হাজার রোনা নিয়ে আমি জিনসাধকের কাছে যাই। সে সময় দু'টি ভাল কথা শুনলেই আমি সুখ পেতাম। জিনসাধক আমার জন্য কিছুই করতে পারলেন না। তারপর তিনি ধর্মগ্রন্থে নিষেধ আছে এমন এক সমাধান দিতে চান। আমি সে ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করি। কারণ জিনসাধক সাবধান করে দেন, এর ফলে আমার প্রেমিকার মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

শেষ বিকাল থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত এক মাস জিনসাধকের আস্তানায় কাটাই। জিনসাধকের আস্তানা থেকে ফিরে এক দিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে জ্যোতিষী ধ্রোনের উপর আমার চোখ পড়ে। পরের দিন সকালে আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি কখন নয়টা বাজে। দশটা বাজার আগে আমি